অগ্নিযুগের ফেরারী

*　　*　　*

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২



প্রকাশক
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক
আমপুলা পাড়া, নবদ্বীপ।

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৭

মূল্য : টা: ৭·০০ (সাত টাকা) মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস
২৫এ/বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

পরাধীন ভারতে—

আহত মরণাপন্ন বিপ্লবীকে পুলিশ-অফিসার বললেন,—

তোমার নামটা শুধু বল। আমাদের কাছে তোমার নাম লেখা থাকলে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সে নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে।

মুমূর্ষু বিপ্লবী অবিচল কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—

Don't bother me ; let me die peacefully

স্বাধীন ভারতে—

নাম ও নেতৃত্বের কাঙ্গাল জনকোলাহল-মুখরিত বিশ্বরাজের রাজপথে দাঁড়িয়ে আজ সেই অগ্নিযুগের অনামী অগ্নিহোত্রীদের স্মরণে নিঃসঙ্গ পথচারীর একবিন্দু অশ্রু এই—

অগ্নিযুগের ফেরারী

নিবেদন

এই বইখানা 'অগ্নিযুগের পথচারী'র পরবর্তী কাহিনী। অগ্নিযুগের পথচারী বের হওয়ার পর বহু পাঠক-পাঠিকা এই বইএর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে পত্র দিয়েছেন। কেউ কেউ মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় বইখানা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছেন। আমি গরিব, পুঁটিমাছের তেল দিয়ে পুঁটিমাছ ভাজা করা ছাড়া উপায় নেই। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বের করার জন্য ১৯৩৩ হতে ১৯৩৬ পর্যন্ত বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঐ সব পত্র-পত্রিকার সম্পাদক-গোষ্ঠীর মধ্যে আমার কোনো কুটুম্ব না থাকায় সে চেষ্টা সফল হচ্ছে না। এখনও চেষ্টায় আছি, যদি সফল হই তবে আরও লেখা আছে, বের করতে চেষ্টা করব।

এই বই সম্পর্কে যা কিছু বলার তা অগ্নিযুগের পথচারীর 'পরিচয়'-এ বলা হয়েছে। সব ঘটনাই সত্য, সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তি এখনও বেঁচে আছেন। এই বইতেও কয়েকটা নাম প্রকাশ করা গেল না, কারণ ঘটনায়ই সুস্পষ্ট। বৃন্দাবন বাড়বানল কুণ্ডের 'সেনমশাই' ও 'বাঁড়ুজ্যেমশাই' তাঁদের আসল নাম উপাধি-খ্যাতির মধ্যে এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁদের মৃত্যুর পর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন যেয়ে ও দু'টো আর উদ্ধার করতে পারি নি।

এই বই ছাপানোর জন্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডি. লিট্., সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), ও বহু পাঠক-পাঠিকা বিশেষ উৎসাহ দিয়ে পত্র লিখেছেন। তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি—

বিনীত—

'পথচারী'

'অগ্নিযুগের পথচারী' ও 'উপনিষদ পরিচয়'-শ্রুতিসংগ্রহ

বই দুইখানি সম্পর্কে

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি. লিট্. মহাশয়ের মন্তব্য :

Sri Kshitish Chandra Moulik
Ampuliapara (Nabadwip)

Dear Sri Moulik,

I have to apologise for this letter dictated in English, but I am forced to do it as I have very little time in hand. I have given a thorough reading to your 'Agniyuger Pathachari' and your 'Upanishad Parichaya'. I have been very much impressed by the first book. It is one of the most sincere and powerful works I have read in recent years. I have been reading these fine books which make me feel I see a ray of hope in the midst of surrounding darkness, that honesty and fellow-feeling are not yet dead.

Your book 'Agniyuger Pathachari' is autobiographical and a wonderful record of a life which may not be looked upon as successful by our ordinary run of people, but which has been one of dedication to some great ideals. The most marvellous thing is that in spite of continued suffering and tribulation the idealism which you have placed before you as a guiding star has not faded away but it has remained and has been sublimated into a faith in the Ultimate Reality which is Bhakti in the true sense of the term, sustained also by Jnana, which I find in your 'Upanishad Parichaya'.

It seems that your point of view and that of your fellow-detenue Kalisankar Brahmachari, as well as that of Sadananda Avadhut—characters which you have made very living—agree fundamentally with mine. I have been very deeply moved by reading many parts of the book and I fully agree with what

you say in the last two pages of your book by way of peroration. I am exceedingly happy to find that without propaganda your book has been appreciated by the right type of persons and I am sure the second instalment of your autobiography is being awaited by many persons including myself with very great eagerness. In your writing there is a wonderful combination of seriousness with the light touch of a person who can appreciate the humorous side of life. This I think is due to your personality and character being free from all malice.

I would consider your book to have enriched Bengali literature and it was exceedingly kind of you to think of me and meet me and enable me to read your works. I hope there will be future occasion of our meeting each other and comparing notes on matters of our common interest.

Your 'Upanishad Parichaya' is also a very fine book although not unique in its line, but you have sought to explain Vedanta from the point of view of the Gaudiya School of Achintya Bhedabheda. The view of the Vaishnava scholar which you read to me—the opinion of Srikrishna Chaitanyadas Babaji about the diversity of schools in the exposition of Vedanta impressed me very much as a very profound observation which was marked by a rare note of universal appreciation. Of course, your selections from the Upanishadas with your commentary should be very inspiring reading particularly for those who have the leisure and the inclination. Unfortunately for me although I would love to read the book I have no leisure. But your book is one to keep by one's side to dip into whenever there is a propitious occasion.

I thank you very much once again for your kind visit and the books which you presented me with. I trust this will find you in good health and spirit. You are doing good work, by giving an exposition of the Upanishadas and other sacred texts and I am sure you are bringing faith and hope and good resolution to most of your audience.

Yours very sincerely,

Sd.—Suniti Kumar Chatterji

দুশ্চিন্তা।

নয়ন-মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সুষমা ও পবিত্র দৈবী পরিবেশ হিন্দু তীর্থস্থানগুলির বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সভ্যতার অভিসম্পাতে বহু তীর্থ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। যে ক'টি এখনও যন্ত্রদানবের স্কন্ধারূঢ় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চোখ ঝলসানো জাঁক-জমক এড়িয়ে চলছে, তার একটি হিমালয়ের কোলে স্বর্গদ্বার লছমন-ঝোলা।

স্বর্গদ্বারে প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গলে কানে আসে গঙ্গার ভাবগম্ভীর কলধ্বনি। তার সাথে স্বর্গীয় ঝঙ্কার তোলে গুরুকুল ও ঋষিকুলের সমবেতকণ্ঠে সামগান। কুটির হ'তে বেরুলে চোখে পড়ে পাহাড়ের চূড়ায় প্রভাত রবির সোনালী কিরণের ঝিলিমিলি, আর মেঘের গায়ে সাতরঙা রামধনুর লুকোচরি খেলা।

সারাটা দিন কাটে ছোট ছোট রঙিন পাখির নাচানাচি দেখে, আর কিচির-মিচির শুনে। বড় পাখির ডাক শোনায় পাহাড়ী প্রতিধ্বনি। মানুষ—যারা চোখে পড়ে, তারা সরল পাহাড়িয়া আর নির্বিকার সাধুসন্ত।

সন্ধ্যার অন্ধকার মনে জাগায় স্বর্গের গোপনপুরীর রহস্য গুঞ্জন। রাতের নিস্তব্ধতা নিশ্চিন্ত নিদ্রায় সৃষ্টি করে স্বপ্নের মায়াপুরী।

এমন যে শান্তির নীড় স্বর্গদ্বার, সেও আমার শেষের ক'দিন তার সমস্ত সম্পদ লুকিয়ে ফেলল। সে ক'দিন কিছুই দেখি নি, কিছুই শুনি নি। যা দেখেছি, যা শুনেছি, তার সব রূপ, সব রস, সব তাৎপর্য, পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

মানুষের সুখ দুঃখ কেবলমাত্র বিষয় বস্তুর গুণাগুণের ওপরেই নির্ভর করে না, ওর বেশীর ভাগই নির্ভর করে ভোক্তার মানসিক প্রস্তুতির ওপরে। এক শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা উত্তর-পশ্চিমে কয়েকটি তীর্থ ভ্রমণ ক'রে এসে, আমাকে বলেছিলেন—মশাই, আপনি প্রায়ই বৃন্দাবনের সৌন্দর্য-মহিমা কীর্তন করেন। নরোত্তম দাস ঠাকুরও

লিখেছেন 'বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম, রতন মন্দির মনোহর।' কিন্তু যা দেখে এলাম, তাতে 'মনোহর রম্যস্থান' তো দূরের কথা, বৃন্দাবনের মত নোংরা বিপজ্জনক বিরক্তিকর তীর্থ আর নেই। বৃন্দাবনে না আছে ভাল হোটেল, না আছে ভাল রেস্টুরেন্ট। টাকা দিয়েও ভাল ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না। পথে বেরুলে ধুলোয় নাক বন্ধ হয়ে আসে। মন্দিরে নোংরা যাত্রীর ভিড়। একটু অসতর্ক হলেই বানরে সবকিছু নিয়ে যায়। কাছিমের ভয়ে যমুনায় নামা যায় না। মশা-মাছি-ইঁদুরের জ্বালায় দু'দিনেই প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল। দু'দিন পরে পালিয়ে বাঁচি।

তাঁর অভিজ্ঞতা শুনে মহাভারতের একটা কাহিনী শুনিয়েছিলাম।— 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূর্বদিনে ভীষ্মদেব, যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনকে ডেকে এনে বললেন—তোমরা দু'জনে উভয়পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের একবার দেখে, পরিচয় নিয়ে আমার নিকটে এস।

ভীষ্মদেবের উপদেশ মত যুধিষ্ঠির দেখে শুনে ফিরে এলে ভীষ্ম জিজ্ঞাসা করলেন—উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের দেখে ও পরিচয় নিয়ে তোমার মনে কি ভাব উদয় হয়েছে?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—পিতামহ, আমি যোদ্ধাদের দেখে ও পরিচয় নিয়ে বিস্মিত হয়েছি। এঁরা সকলেই মহাবীর ও ধার্মিক। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, যুদ্ধের আহ্বান এলে—সে আহ্বানের মর্যাদা রক্ষা করা। আমরা উভয়পক্ষ হতেই সকলকে যুদ্ধের নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলাম। তার জন্য তাঁরা নিজেদের মধ্যে দুই দল গঠন ক'রে, একদল আমার পক্ষে, একদল দুর্যোধনের পক্ষে, যোগ দিয়ে ক্ষাত্রধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। এর ফলে পিতা দাঁড়িয়েছন একপক্ষে, পুত্র দাঁড়িয়েছেন অপর পক্ষে; এক ভাই একপক্ষে, অন্য ভাই অপর পক্ষে। অপূর্ব এঁদের স্বার্থত্যাগ! অপূর্ব এঁদের ধর্মজ্ঞান!!

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বিদায় দিয়ে দুর্যোধনকে ডেকে ঐ প্রশ্নই করলেন। দুর্যোধন উত্তর দিলেন—পিতামহ, আমি যোদ্ধাদের দেখে

ও তাঁদের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। এ সংসারে কেবল আমরাই রাজ্যলোভে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করছি, এমন নয়। আমরা তো পরস্পর প্রকাশ্যে শত্রুতা করছি। কিন্তু এই সমস্ত রাজা, রাজ-পুত্রেরা আমাদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত গোপন শত্রুতা সাধন করতে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন।'

এই কাহিনী শোনানোর পর এ যাবৎ ঐ ভদ্রমহিলা আর কোনোদিন আমার সম্মুখে আসেন নি।

এই যে একই বস্তু উপলক্ষ্য ক'রে বিভিন্ন উপলব্ধি, এর কারণ বিভিন্ন মানসিক প্রস্তুতি। এই মানসিক প্রস্তুতি গড়ে ওঠে আমাদের পারিপার্শিক ঘটনা অবলম্বনে।

ইংরেজী ১৯২৬-এর আগস্ট মাসের প্রথমে এক সন্ধ্যায় রাশিয়া-যাত্রী ফেরারী বন্ধুকে বিদায় দিয়ে ফিরে গেলাম স্বর্গদ্বারের আশ্রমকুটিরে। বাবা কালীকমলীর সত্র হতে রাতের খাবার এল। খেতে বসলাম, কিন্তু খেতে পারলাম না। হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম।

সে রাত্রে লছমনঝোলায় স্বর্গদ্বার-আশ্রমকুটিরে শুয়ে যে সব চিন্তা মনে জেগেছিল, তা নিয়ে পরে অনেক কিছু লিখেছিলাম। সে সব লেখা এখন আর বিশেষ কিছু নেই। তবুও এই সুদীর্ঘ-কাল পরে এই বই লিখতে ব'সে অনেক কথাই মনে পড়ছে।

আমার মনের অবচেতন দিকে যে কি প্রস্তুতি ছিল, তা কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার সরকারী সাক্ষী সরানোর জন্য পার্টি হতে খোঁজ না পড়া পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। তখন সেই বিপজ্জনক কাজে ডাক পড়ায় অবচেতন মনের ভাব-প্রস্তুতি ওপরে ভেসে উঠে বেশ একটু ঘাবড়িয়ে দিয়েছিল।

অবচেতন মনে ধারণা ছিল—যে হেতু আমি বিবাহিত এক বংশের এক ছেলে, সে হেতু দলের নিয়মানুযায়ী আমাকে কোনো জীবন-মরণ সমস্যায় জড়ানো হবে না। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে লোহার ডাণ্ডা পাঠানোর জন্য যাঁরা আমার সাহায্য নিয়েছিলেন, তাঁরা কেউই

জানতেন না, লোহার ডাণ্ডা কি কাজে লাগবে। জানলে বোধ হয় ঐ কাজের ভার আমাকে দিতেন না।

কিন্তু এবার তো আর তা বলা চলে না। এবার পার্টির নেতারা সব জেনে শুনে ভেবে চিন্তে আমাকে খোঁজ করেছেন। পার্টির নির্দেশ মত লক্ষ্ণৌ যেয়ে কোর্টে মামলার সময় যদি বিশ্বাসঘাতক দুটোর সাক্ষাৎ পাই, তবে আমার হাতের মশার রাইফেল কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে না, এটা নিশ্চয়। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায় কি হবে?

ধরাপড়ে ফাঁসিকাঠে ঝোলার ভয় বিশেষ করি নে, ভয় করি—ধরে যদি আবার কলকাতার এলিসিয়াম রো-এর 'ধোবীখানায় কচুয়া ধোলাই'-তে পাঠায়!

আর যদি ধরা না পড়ি, তবে সারাজীবন তো ফেরারী হয়েই কাটাতে হবে। সেই ফেরার হয়ে ঘোরাই কি আমার পক্ষে বেশীদিন সম্ভব হবে? রাশিয়া-যাত্রী ফেরারীবন্ধু ছদ্মবেশের যে নমুনা দেখিয়ে গেলেন, তাতে সারাজীবন চেষ্টা করেও ও বিদ্যে আয়ত্ত করতে পারব কিনা সন্দেহ। এখন যে ফেরারী হয়ে ঘুরছি, এতে মনে একটা জোর আছে—পুলিশ-কমিশনার রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জী খুনের ব্যাপারে আমি নির্দোষ। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে যা করতে হবে, তাতে তো আর মনকে নির্দোষ বলে বুঝানো যাবে না।

তারপর আমার মা, পিসীমা, বউ, ছেলে—একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় নবদ্বীপে ভাড়াটে বাসায় আছে। এগারো বছর বয়সে অভিভাবকহীন হয়ে, এই সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে তাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। সদানন্দ অবধূত অবশ্য কথা দিয়েছেন—আমার যদি কোনো বিপদ ঘটে, তবে তিনি আমার পরিবার প্রতিপালন করবেন। সে প্রতিশ্রুতি যে রক্ষিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ তিনি গুরুগিরি ব্যবসা করার জন্য সাধুসন্ন্যাসী হন নি। কিন্তু অবধূত বৃদ্ধ হয়েছেন, তারপর তাঁর হাই ব্লাডপ্রেসার আছে, অল্পদিনের মধ্যেই যদি মৃত্যু হয়, তবে কি উপায় হবে?

এই সব চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। এমন সময় কানে এল সুমধুরকণ্ঠে গান হচ্ছে—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
পতিত পাবন সীতা-রাম।

গাচ্ছেন সেই ডাকাত রামভকত। গাইতে গাইতে আমার কুটিরের পথেই আসছেন। বাঘের ভয়ে এর পূর্বে রাত্রে কুটিরের বাইরে যেতাম না। সে রাত্রে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। রামভকতের পিছনে পিছনে লছমনঝোলা পর্যন্ত গেলাম। ঝোলা পার হয়ে রামভকত চলে গেলেন তাঁর আস্তানায়, আমি ফিরলাম কুটিরে।

বিছানায় শুয়ে আবার চিন্তায় ডুবে গেলাম। এবার কিন্তু চিন্তার ধারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। বিছনায় শুয়ে প্রথমেই মনে জাগল—আমি নিজের চেষ্টায় পরিবারবর্গের অভাব দূর করে সুখী করতে পারি কি? এজন্য আমার দিক হতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়েছে বলে তো মনে হয় না। গত সাত বছরের মধ্যে অনেক কিছুই তো করলাম, সুযোগও পেয়েছি, কিন্তু কিছুই তো করতে পারলাম না।

চা-বাগানে চাকরি করতে যেয়ে চা পাতা মাপার ফাঁকিবাজী নিয়ে আমার মাথা ব্যথা হল কেন? ও ব্যাপার তো সর্বত্রই চলছে! অপরকে ঠকানোর সুযোগ পেলে, যে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, সে তো আমাদের সভ্যসমাজে নিতান্ত নির্বোধ অবজ্ঞার পাত্র। ব্যবসাদার ধার্মিক সাধু-সন্ন্যাসী বাবাদের মঠ-আশ্রম হ'তে আরম্ভ ক'রে মাছের বাজার পর্যন্ত সব জায়গায়ই তো দেখি আইন সম্মত 'গ্যাড়াকল'। একপক্ষ সে গ্যাড়াকল পেতে বেশ দু'পয়সা কামাই ক'রে সমাজে গণ্যমান্য হচ্ছেন। আর একপক্ষ সে কলে প'ড়ে খাবি খাচ্ছেন। যাঁরা খাবি খাচ্ছেন তাঁরা এর প্রতিকারের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় ট্রামে, বাসে, লোকাল ট্রেনে, অথবা রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে বসে গরম গরম সমালোচনার বেশী তো কিছু করেন না! আমি কেন চা-বাগানের সাহেব-ম্যানেজারের মাথা ফাটালাম?

কংগ্রেসী জমিদার মনিবের চাকরি—তা সে জলার নায়েবীই হোক, অথবা কংগ্রেসের নেতাগিরির শিক্ষানবিশীই হোক, ওর যে কোনো একটা ধরে থাকলে দু'চার বছরের মধ্যে আমিও তো একটা ভাল রকম কেউ কেটা হতে পারতাম। তা থাকলাম না কেন ?

এ ছাড়াও তো আরও সুযোগ পেয়েছিলাম। পদ্মানদীর জেলেদের হাতিয়ে সাধুবাবা বড়লোক হয়ে গেলেন। সেই জেলেরাই আমার ডাণ্ডাব্রহ্মের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে বেশ ভাল রকম সাহায্যই করতে চেয়েছিল। সে সাহায্য নিলাম না কেন ?

নিলাম না কেন—তার মূলে আমার মনে আছে অদ্ভুত রকমের একটা ভয়। যদিও সে ভয়ের বাস্তবিক কোনো তাৎপর্য নেই। তথাপি পাড়াগাঁয়ে মেঠো বটগাছে ভূতের ভয়ের মত কার্যকালে ও ভয়টা কিছুতেই কাটিয়ে উঠিতে পারিনে। যখনই বেশ একটা দাঁওমারার সুযোগ আসে, তখনই মনের মধ্যে ভয়ের কাঁপুনি আরম্ভ হয়—ও দাঁও মারলে সর্বনাশ হবে, শেষে চোখের জলে নাকের জলে এক হতে হবে।

তারপর দাঁওটা হাতছাড়া হয়ে গেলে বাস্তব বুদ্ধি ফিরে আসে। তখন বেশ বুঝি, এ ভয়ের কোনো মানেই নেই। যদি সত্যিই কিছু থাকত, তবে আমাদের দেশে যাঁরা গণ্য-মান্য-বরেণ্য হয়ে পরমসুখে সমাজের মাথায় চড়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের কতজনের এ উন্নতি সম্ভব হত ! এক পরলোকের ভয় ? তা সত্যিই যদি পরলোক বলে কিছু থেকে থাকে, তবে হরিজন উন্নয়ন ফণ্ড-টণ্ড রকমের একটা সৎপ্রতিষ্ঠানে এককালীন কিছু দান করে বছর বছর কিছু চাঁদা দিলে এত পুণ্যি হত যে, ইহলোকে দুর্নীতি নিবারক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, পরলোকে যমঠাকুরকেও অষ্টরম্ভা দেখানো মোটেই অসম্ভব হত না।

কিন্তু এত বুঝেও এ পর্যন্ত কিছু করতে পারলাম না। এর মূলে আছে আমার প্রথম জীবনের একটা কুসংস্কার। সংস্কারটা এতই বদ্ধমূল যে, কিছুতেই ওটাকে দূর করতে পারিনে। কি ক'রে এই সংস্কারটা আমার মনে শিকড় গাড়ল তা লিখছি।—

আমাদের গ্রামে গ্রাম সম্পর্কে এক দাদা ছিলেন। বিয়েটা তাঁর আমার জন্মের পূর্বে হয়েছিল কি পরে হয়েছিল, তা বলতে পারব না। তবে জ্ঞান হয়েই বউদিকে দেখেছি। এই বউদিকে দেখা মানে তাঁর পোষা হুলো বিড়ালটাকে দেখা। তাঁদের বাড়ীতে আমার সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ঐ মোটাসোটা নিরীহ অহিংস বিড়ালটা।

বউদির কোনো সন্তান ছিল না। দাদা বরেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। এ অবস্থায় আর একটা বিয়ে ক'রে বংশরক্ষা করাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দাদা তা করলেন না। কেউ বিয়ের কথা বললে উত্তর দিতেন—আর একটা বিয়ে ক'রে খেতে-পরতে দেব কোথা থেকে ?

দাদার এই কৈফিয়তের জবাবে বড় পিসীমা একদিন বললেন—আর একটা বউ এলে পরতে কি দিবি তা জানিনে, কিন্তু ঐ হুলো বিড়ালটা তাড়িয়ে দিলে আর একটা বউয়ের খাওয়ার যে অভাব হবে না, তা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

পিসীমার মন্তব্যে দাদা কি ভাবলেন তা তিনিই জানেন, আমি কিন্তু তখন ভয় পেয়েছিলাম। অমন *সুন্দর* নাদুশ্-নুদুশ হুলোটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার একটা গোমরামুখী বউদি আসবে ! সর্বনাশ !!

সর্বনাশটা অবশ্য তারপর আরো আট-নয় বছরের মধ্যে ঘটল না। যখন ঘটল তখন আমার বয়স চোদ্দ বছর। কার্তিক মাসের এক প্রভাতে শুনলাম বউদিদি কলেরায় মারা গেছেন। মরার সময় তাঁর হুলোটাকে দাদার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছেন।

সংবাদটা শুনে চিন্তিত হলাম। কিছুদিন পূর্বে এক কথক পণ্ডিতের মুখে শুনেছিলাম, যাঁরা কৃষ্ণ সেবা করেন, তাঁরা মৃত্যুর পর গোলোকে যেয়ে গোয়ালা বা গয়লানী হন। যাঁরা নারায়ণ ঠাকুরের ভক্ত, তাঁরা মরে লক্ষ্মীনারায়ণের রূপ ধরে বৈকুণ্ঠে যান। যাঁরা দেবতা পূজা করেন, তাঁরা স্বর্গলোকে যেয়ে দেব-দেবী হন। তাই যদি হয়, তবে বউদি মরে নিশ্চয়ই বিড়াললোকে গিয়েছেন। কি-ন্-তু সেখানে যেয়ে বউদি হুলো হলেন, না মেনী হলেন ? পুষেছিলেন তো হুলো !

সংশয় দূর করার জন্য বড় পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করে খেলাম এক পিলে চম্‌কানো ধমক। তারপর থেকে এই বই লেখার সময় পর্যন্তও ঐ সমস্যাটার কোনো সুমীমাংসা করে উঠতে পারিনি। সমস্যাটা বড়ই জটিল।

বউদি মরে বিড়াল লোকে যেয়ে হুলো হলেন, কি মেনী হলেন—সে সমস্যার ধর্মশাস্ত্র সম্মত মীমাংসা না হলেও তাঁর মৃত্যুতে কুলীন দাদার বংশরক্ষার সমস্যা অল্পদিনের মধ্যেই মিটে গেল। অগ্রাণ মাসের এক সন্ধ্যায় দাদার বাড়ীতে বৌভাতের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ খেয়ে এলাম।

ডিসেম্বর মাসের প্রথমে—অর্থাৎ অগ্রাণ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে স্কুলের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে। সে দিন স্কুলে হাজিরা দিয়ে এসেই দাদার বাড়ীর পিছনের এঁদোপুকুরে বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতে বসেছি। একটা ছোট সিঙ্গি মাছ গেঁথে উঠল। মাছটা ছাড়াতে যেয়ে আঙ্গুলে মারল কাঁটা।

'ইস্, মাছটা কাঁটা মেরে দিল! রক্ত পড়ছে যে! উঠে এস, আমি কুইনিন লাগিয়ে সেঁকে দেব।'

ফিরে দেখলাম দাদার নতুন বউ। সাথে গেলাম। কুইনিন লাগিয়ে আগুনে সেঁকে যন্ত্রণা কমলে আমার নাম-পরিচয় জেনে নিয়ে বললেন,—ভাই তুমিও ট্যারা, আমিও ট্যারা। আজ থেকে তুমি আমার ভাই, আমি তোমার নিরুদি হলাম। কেমন?

এর দু'মাস পরে দাদা এসে মাকে বললেন,—তাঁর বাড়ী পাহারা দিত যে বুড়ী, সে চলে গিয়েছে। দাদা দু'মাইল দূরে রেজেষ্ট্রি অফিসে দলিল লিখতে যান বেলা দশটায়, আর ফেরেন রাত দশটায়। সন্ধ্যার পর নিরুদি একা থাকতে ভয় পান। আমি যদি সন্ধ্যার সময় যেয়ে তাঁর ঘরে বসে লেখাপড়া করি, তবে ভাল হয়।

মা সম্মত হলেন। বাড়ীতে পড়াটা বোধ হয় এই সময়েই ছেড়ে দিলাম। লেখাটা লিখতে হত, কারণ তা না হলে স্কুলে যেয়ে বেত খেতে হত। সন্ধ্যার পর নিরুদির ওখানে যেয়ে তাঁর সাথে কড়ি দিয়ে

দশ-পঁচিশ, অথবা তাস দিয়ে গোলাম-চোর খেলতাম। আর যদি গল্পের বই যোগাড় হত, তবে তাই পড়তাম। লেখাটা সকালে লিখতাম।

এমনি করে তিন বছর কেটে গেলে দাদা হঠাৎ পেয়ে গেলেন এক বড় জমিদারের জল-কর মহলে নায়েবী চাকরি। চাকরি পেয়ে ফরিদপুর টাউনে বাসা করে নিরুদিকে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে আমিও কলকাতা যেয়ে কলেজে ভর্তি হলাম।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যেয়ে নিরুদির পত্র পেলাম—তিনি আমার সাথে দেখা করতে চান। গেলাম একদিন ফরিদপুরে দাদার বাসায়।

দাদা বাসায় ছিলেন না, কর্মস্থলে ছিলেন। নিরুদি নিজেই বাইরের দরজা খুলে আমাকে বৈঠকখানায় বসালেন। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলাম আমার সেই হাসিখুসি সরল নিরুদি আর নেই, সুন্দর মুখে পড়েছে একটা অসাধারণ কালো ছায়া।

বড় বাসায় দুটো ঝি, রাঁধুনে ঠাকুর, চাকর, মূল্যবান আসবাবপত্র, নিরুদির গায়ে প্রায় বিশ-বাইশ ভরি সোনার আটপৌরে গয়না। সব দেখে মনে হল, ঐ যে একটা কথা আছে 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ'—দাদার অবস্থাটা তাই হয়েছে।

রাত্রে নিরুদি তাঁর শোবার ঘরেই আমার শোবার ব্যবস্থা করলেন। সন্ধ্যাবেলা এসেছি, সে পর্যন্ত বিশেষ কোনো কথা হয় নি। আমিও বড়লোকের বউ নিরুদির সাথে গায়পড়ে কথা বলি নি। রাত্রে নিরুদি তাঁর বিছানায় এসে বসে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন,—

ভাই, তুমি বোধ হয় ভেবেছ, তোমার নিরুদি এখন টাকার মানুষ হয়ে খুব সুখী হয়েছে। তা যদি ভাব, তবে কিন্তু দারুণ ভুল হবে। তুমি বিশ্বাস করতে পার—তোমার সেই ছিপে ধরা পুঁটিমাছের ঝোল, আর দু'মুঠো আউশের চালের ভাতের জন্যই আমার মন কাঁদছে। এই যা দেখছ, এসব আমার কাছে বিষ। তোমার দাদা জেলেদের রক্ত জোঁকের মত চুষে এনে এ সব করছেন। যে দিন আমি তাঁর মুখে শুনলাম,

চাকরির প্রথম এগারোদিনেই আঠার শ' টাকা পেয়েছেন, সেই দিন হতেই একটা দারুণ ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে। দেখতেও পাচ্ছি আমার এই ভয় নিরর্থক নয়। তোমার দাদা দেবচরিত্র মানুষ ছিলেন, এখন মদ ধরেছেন। শুনতে পাচ্ছি কুস্থানেও যাতায়াত করছেন।

আমি বললাম—তা হলে দিদি, তুমি কেন তাঁকে সংযত কর না ?

সে চেষ্টা আমি যথেষ্ট করেছি। কোনো ফল হয় নি, হতে পারেও না। অসদুপায়ে টাকা রোজগার করার নেশা, বোধ হয় সব নেশার চাইতে বড় নেশা। ও নেশায় যাকে একবার পেয়ে বসে, সে স্ত্রী পুত্র—এমন কি মদও ছাড়তে পারে, কিন্তু ঐ টাকার নেশা ছাড়তে পারে না।

তাতে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

ভাই, আমার ভয় পাওয়ার হেতু ঠিক তুমি বুঝতে পারবে কিনা, তা বলতে পারি নে। তোমার দাদার অধঃপতনের কথা তো শুনলে। ঐ তিন বছরের কোলের ছেলেটা আগে বেশ ভাল ছিল, এখন ভয়ানক হয়ে উঠেছে। বাড়ীর বিড়ালটার একটা বাচ্চা হয়েছিল। ছেলেটা প্রথমে বাচ্চাটার চোখ দুটো লোহার কাঁটা দিয়ে নষ্ট করে দেয়। তারপর একদিন মাছকোটা বঁটি দিয়ে বাচ্চাটিকে কেটে ফেলেছে। আজ ক'দিন হল পাশের বাড়ীর একটা মুরগীর বাচ্চা ধরে এনে, তার পাখনা ছিঁড়ে মজা দেখেছে। এ সবের মূলে আছে তোমার দাদার অসৎভাবে উপার্জিত অর্থ। এই জন্য আজ তোমাকে যা কিছু খেতে দিলাম, ও সব আমার নিজের টাকা দিয়ে আজই এনেছি। তোমার দাদার সংসারের কিছু আমি তোমাকে খাওয়াব না।

তা হলে তো দিদি, এটা তোমার সাংঘাতিক মানসিক অবস্থা !

হাঁ ভাই, আমার মনে কোনো শান্তি নেই। এই দুঃসহ অবস্থা হতে আমি মুক্তি চাই। আমার আপন বলতে কেউ নেই। ছেলেবেলা মা-বাপ হারিয়ে খুড়োর সংসারে মানুষ হয়েছিলাম। এখন সেখানে যেয়ে দু'চার দিন থাকা যায়, স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না। অনেক

ভেবে কোনো পথ না দেখে তোমাকে পত্র লিখেছি। কিছুদিন হল জানতে পেরেছি, তুমি একজন বিপ্লবীদলের সভ্য। আমাকে তোমাদের দলে ভর্তি করে নাও। তোমরা যা বলবে, আমি তাই করব। আমাকে দিয়ে যদি দেশের কোনো কাজ হয়, তবে তার জন্য আমি জেল, ফাঁস, কোনো কিছুরই ভয় করিনে।

দিদি, তুমি আমার সম্পর্কে ভুল শুনেছ। বিপ্লবীদলের সাথে আমার কিছু পরিচয় আছে বটে, কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি নে। বিয়ে হয়েছে বলে তাঁরা আমাকে দলে দীক্ষা দেন নি। তোমাকেও তাঁরা দলে নেবেন না। তোমার মত বিবাহিতা ছেলেকোলে কোনো মেয়েকে দলে নেওয়া হয় না।

আমার কথা শুনে দিদি খুব দমে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—তা হলে তুমি আমাকে কাশী রেখে এস। শুনেছি কাশীতে এমন সব আশ্রম আছে, যেখানে অনাথা মেয়েরা স্থান পায়।

তা কি করে হবে! তোমাব মত সুন্দরী মেয়ের পক্ষে কোনো আশ্রম নিরাপদ স্থান নয়। সংবাদপত্রে প্রায়ই ঐ জাতীয় আশ্রম সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়।

বেশ, আশ্রমে না হয় না গেলাম। কোথাও বাসাভাড়া ক'রে থেকে একটা কাজ খুঁজে নেব। আমি মাইনর পাশ করেছি, কাজের অভাব হবে না বলেই মনে করি।

তোমার ছেলের গতি কি হবে ?

ওটা মানবাকৃতি দানব। ও কোনো কালেই মানুষ হবে না। ওকে আমি সাথে নেব না।

তুমি দিদি, অদ্ভুত মা। নিজের পেটের ছেলে সম্পর্কে এই রকম মনোভাব আর কোনো মা-এর হয়েছে বলে শুনি নি। আমার মনে হয় তোমার মাথা একটু খারাপ হয়েছে। ভাল কবিরাজী তেল মাখো।

তা হলে তুমিও আমার অবস্থাটা বুঝলে না! মেয়েদের অবস্থাটা এই রকমই বটে। তারা যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ অধঃপাতের সম্মুখীন হয়,

তবে সে বিপদ কাটাতে কেউ সাহায্য করে না, বরং অধঃপাতের পথে গড়িয়ে দেবার লোক বহু পাওয়া যায়। বেশ, তুমি এখন ঘুমাও। ভোর পাঁচটায় গাড়ী ছাড়ে, সময় মত তোমাকে তুলে দেব।

ঘুম আমার সে রাত্রে হয় নি। নিরুদির কথাগুলো আমাকে বিস্মিত করে ফেলেছিল। দাদা এমন কি অন্যায় কাজ করছেন, যার জন্য দিদি এত অস্থির হয়ে উঠেছেন!!

এই ঘটনার পর এই বই লেখা পর্যন্ত আমার চলার পথে বহু কৃতী দাদার বৌদিদির মুখে সগৌরব উক্তি শুনেছি—'আমার কর্তার মাইনে মাসে পাঁচশ' টাকা। কিন্তু ভাই, দেড়হাজার-দু'হাজারের কমে কোনো রকমেই সংসার চালাতে পারি নে'।

সে রাত্রে নিরুদির কথায় বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু নিরুদি নিজেই যে কত বড় একটা বিস্ময়ের বস্তু, তা তখন বুঝতে পারি নি। সেটা বুঝলাম ছ'বছর পরে।

নিরুদির কাছে বিদায় নিয়ে আসার পর ছ'বছরের মধ্যে আর কোনো খোঁজ করি নি। বোধ হয় তাঁদের কথা মনেও ছিল না। ফরিদপুর হতে ফেরার কিছুদিন পরেই আমার জীবনপথে যে ঝড় উঠল, সে ঝড়ের দাপটে আমার মত দুর্বল মানুষের পক্ষে পিছনে ফেলে আসা কোনো কিছু আর ফিরে যেয়ে খোঁজ করা সম্ভব হয় নি। যদি পিছনের কিছু সম্মুখে এসে দাঁড়াত, তবেই আবার জানাশোনা হত। ছ'বছর পরে নিরুদি আবার একদিনের জন্য আমায় সম্মুখে পরম বিস্ময়রূপে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৯২৫ এর জুন মাসে বক্‌সা ডিটেন্‌সন্ ক্যাম্প হতে মুক্তি পেয়ে নবদ্বীপ বাসায় এসে শুনলাম, কিছুদিন পূর্বে ফরিদপুর হতে দাদা এসেছিলেন আমার খোঁজে। মা গোয়ালন্দের ওদিকে পদ্মা নদীর ধারে শিষ্যবাড়ী যেতে বলায় মনে ভাবলাম—ওদিকে যখন যাচ্ছি, তখন একদিন ফরিদপুর যেয়ে নিরুদিকে দেখে আসব। কিন্তু তা আর দু'মাসের মধ্যে সম্ভব হল না। ওদিকে যেয়েই জড়িয়ে পড়লাম জলকরের জমিদার ও প্রজা-জেলেদের বিবাদের মধ্যে।

বিবাদের মীমাংসা করার জন্য যখন জেলেদের পক্ষ হ'তে জমিদার পক্ষের ওপরে 'শ্রীশ্রীডাণ্ডাব্রহ্ম' প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করি, তখন একবার লোকমুখে দাদার খোঁজ নিলাম। কারণ, দাদাও তো জমিদার পক্ষে জলকরের নায়েব। শেষে ডাণ্ডাব্রহ্ম নিরুদির হাতের শাঁখাও ভেঙ্গে দিতে পারে।

খোঁজ নিয়ে শুনলাম—দেড় বছর পূর্বে দাদা মোটা হাতে জমিদারের তবিল মেরে, বছরখানেক পুলিশের কাছে নিরুদ্দেশ হন। শেষে জমিদারকে অল্প কিছু নেশার খরচ দিয়ে, মামলা আপোষ করে ফেলেছেন। চাকরি আর এখন তাঁর নেই। শুনে নিশ্চিন্ত হ'লাম।

তারপর ডাণ্ডাব্রহ্মের মহিমায় বিবাদ মীমাংসা হয়ে গেলে, জেলেদের সেই হিতৈষী সাধুবাবার চেলাচামুণ্ডাবা যখন জেলেদেব আরও হিতসাধনের জন্য ঘোরাফেরা আরম্ভ করলেন, তখন ঐগুলো তাড়ানোর জন্য আরও একমাস জেলেদের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। সেই সময় গেলাম ফরিদপুর দাদার বাড়ীতে।

পূর্বে দাদা যে বাসায় ভাড়াটে ছিলেন, সেইটাই কিনে নিয়ে দোতলা করেছেন। বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার ধারে একটা ঘরে ব'সে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের একটি যুবক পড়াশুনা করছিল। জানা থাকা সত্ত্বেও তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—

এ বাড়ী কি অমুক বাবুর ?

না।

তাঁর বাড়ী এখানে কোথায় ?

জানি নে।

এ বাড়ী কার ?

নিরুপমা দেবীর বাড়ী।

আমি তাঁর সাথেই দেখা করতে এসেছি।

তাঁর সাথে দেখা হবে না। তিনি বাইরের কারও সাথে দেখা করেন না।

এমন সময় পিছনের দরজা খুলে গেল। নিরুদি আমাকে ডাকলেন,—

আমি ওপর হতে তোমাকে দেখেছি। ভিতরে এস।

দিদির পিছনে পিছনে উপরতলায় তাঁর শোবার ঘরে যেয়ে বসলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, দিদির চেহারায় অসাধারণ পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বাপেক্ষা তিনি সুন্দরী হয়েছেন, কি কুৎসিতা হয়েছেন, তা বলা শক্ত। তবে আমার মনে হল, তাঁর সৌন্দর্য্য যেন কৃত্রিম উপায়ে বেড়েছে, আর কুৎসিৎ স্বাভাবিক।

মন অস্বস্তিতে ভরে উঠল। আমি আর প্রথম কথা আরম্ভ করতে পারলাম না। নিরুদিই আমার বাসার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে কথা আরম্ভ করলেন।

তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হলে, আমি প্রশ্ন ক'রে শুনলাম, পাঁচ বছর হল তাঁর সেই দানব ছেলেটি জামায় আগুন লেগে পুড়ে মরেছে। দাদা ফরিদপুরেই কোনো হোটেলে আছেন। কোন হোটেলে আছেন তা দিদি জানেন না।

সকালের দিকে বেলা ন'টায় নিরুদির বাড়ী পৌঁছেছিলাম। দুপুরে খেয়ে বেলা তিনটে বাজলে বেরুলাম দাদার খোঁজে। কয়েকটা হোটেলে খোঁজ করতেই দাদার সন্ধান পেলাম, কিন্তু দাদাকে পেলাম না। তিনি কোথাও গিয়েছেন। সন্ধ্যা পাঁচটায় দাদার সাথে দেখা হল। তাঁর মুখে যা শুনলাম, তাতে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

নিরুদির বাড়ীতে যে ছেলেটি থাকে, সেটি দাদার এক দূরসম্পর্কীয় ভাইয়ের ছেলে, চার বছর হল দেশ হতে এসে তাঁর বাসায় থেকে কলেজে পড়ছে। জমিদারের সাথে হিসাবপত্র নিয়ে গোলোযোগ হওয়ায় দাদা ভয়ে কিছুদিন নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। পূর্বেও মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন বাসায় থাকতেন না, কর্মস্থলে নৌকায় থাকতে হত। তারপর মামলামোকদ্দমা মিটিয়ে চাকরি হারিয়ে যখন বাড়ীতে স্থির হয়ে বসলেন, তখন লক্ষ্য করে দেখলেন—নিরুদির সাথে ঐ ছেলেটার যে সম্বন্ধ, সেটা মোটেই খুড়ী—ভাশুরপুত সম্বন্ধ নয়।

ব্যাপার বুঝে দাদা আপত্তি করতেই নিরুদি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে শান্তি ভঙ্গের মামলা ক'রে, পুলিশের সাহায্যে দাদাকে বাড়ী হতে বের ক'রে দিয়েছেন। বাড়ী, ব্যাঙ্কের টাকা, সব নিরুদির নামে। দাদা এখন পথের ভিখারী। এরই কোনো প্রতিকার হয় কিনা, তার জন্য নবদ্বীপে আমার খোঁজে গিয়েছিলেন।

দাদার কথা শুনে আমার গায়ের রক্ত হিম হলেও তখনও জমে বরফ হয় নি। জমিয়ে বরফ করলেন নিরুদি নিজে।

আর এক মুহূর্তও এদের মধ্যে থাকব না স্থির করে, আমার ব্যাগটা নেওয়ার জন্য গেলাম নিরুদির বাড়ী। ব্যাগটা ছিল শোবার ঘরে। সেটা হাতে নিয়ে ঘর হতে বেরুব, এমন সময় দিদি এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। লক্ষ্য করে দেখলাম চোখে তাঁর আগুন জ্বলছে।

'এমন করে ঘৃণায় নাক সিঁটকিয়ে তুমি আমার সম্মুখ হতে যেতে পারবে না, দাঁড়াও। আমার অধঃপতনে তুমিও দায়ী।'

শুনেছি হিংস্র বাঘিনী শিকারীর গুলিতে আহত হয়ে, তার আশ্রয় গুহায় যেয়ে, আক্রোশে নাকি একপ্রকার অদ্ভুত গর্জন করতে থাকে। আমাকে দাঁড়াতে হুকুম করে, নিরুদি প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট ধরে যে প্রকার শব্দ করেছিলেন, সেও বোধ হয় সেই রকমই হবে। তাঁর নাক ফুলে ফুলে উঠছিল, শরীর কেঁপে কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তুমি কেবল তোমার দাদার কথা শুনেই যেতে পাবে না, আমার কথাও শুনতে হবে। আমার অধঃপতনের কাহিনী, আমার দুর্ভাগ্যের কথা, আমার সর্বনাশের হেতু শুনে তারপর তুমি যেও। তার আগে যেতে চাইলে আমি তোমাকে খুন করব।

যাওয়া তো দূরের কথা, সে সময় বোধ হয় আমার চোখের পলক ফেলার শক্তিও ছিল না।

নিরুদি বলতে আরম্ভ করলেন—

ছ'বছর পূর্বে তুমি যখন এসেছিলে, তখন তোমাকে যে কথাগুলো বলেছিলাম, তা একবার মনে করে দেখ। তখন আমি ছিলাম টাটকা ফোটা ফুলের মত নির্দোষ। আমার পনরো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে পাংসার বাড়ীতে যেয়েই তোমার সাথে পরিচয় হয়। তারপর তিন চার বছর প্রতিদিন সন্ধ্যা হতে রাত দশটা পর্যন্ত তুমি আর আমি একঘরে থেকেছি। কত রাত তুমি আর আমি এক বিছানায় ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। তবুও আমার মনে কখনো কু-ভাব জাগেনি।—

ফরিদপুর এসে তোমার দাদার মুখে যখন শুনলাম, তিনি গরিব জেলেদের ওপরে অন্যায় জুলুম চালিয়ে হাজারে হাজারে টাকা আনতে আরম্ভ করেছেন, তখন ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। নিরুপায় আমি, অনেক ভেবেচিন্তে তোমাকে পত্র দিয়েছিলাম। তুমি এলে, সব শুনলে, কিন্তু কোনো সাহায্যই করলে না। বরং তুমি তোমার দাদার পক্ষই সমর্থন করে গেলে।—

তুমি যাওয়ার ক'মাস পরে ছেলেটা পুড়ে মরল। ছেলেটা মরার পর তোমার দাদা সাংঘাতিক হয়ে উঠলেন। টাকা রোজগারের নেশা তাঁর এত বেড়ে গেল যে, জমিদার পর্যন্ত টান ধরল। তখন দেখা দিল তাঁর জমিদার ঠাণ্ডা রাখার প্রয়োজন।

ভগবান দিয়েছেন আমাকে কিছু রূপযৌবন, আর নিটোল স্বাস্থ্য। তোমার দাদা আমার এই রূপযৌবন লম্পট জমিদারকে দিয়ে, তাঁর টাকা রোজগারের পথ খোলা রাখার ব্যবস্থা করলেন।—

তোমার দাদা জমিদারকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করে এনে আমার ঘরে বসিয়ে রেখে, নিজ হাতে বার হতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সরে গেছেন। এরপর আর কি শুনতে চাও ?—

এতেও হয় তো আমি আত্মরক্ষা করতে পারতাম। না পারলেও মরতে পারতাম। কিন্তু তাতে যে মনের জোর প্রয়োজন, সে জোর ঐ জেলেদের রক্তমাখা টাকায় কেনা ভাত খেয়ে, আর ভাল ভাল কাপড়-গয়না প'রে, আমি হারিয়ে ফেলেছি।—

তোমার দাদার মুখে ঐ ছেলেটার কথা যা শুনেছ, তাও ঠিক। ও ছেলেটাও আমার সাথে নরকযাত্রী হয়েছে। ওর এই অধঃপতনের হেতুও এই সংসারের বিষাক্ত ভাত। কর্তা জাল জুয়াচুরি পরের সর্বনাশ করে টাকা এনে ছেলে-মেয়ে-বউকে পুলি-পোলাও খাওয়াবেন, ভাল ভাল পোষাক-গয়না পবাবেন, আব তাঁর ছেলে মেয়ে বউ এক একজন রামচন্দর সতীসাবিত্রী হবেন—এ কখনও হয় না।—

তুমিও আমার এই অধঃপতনের জন্য দায়ী। সে দিন যদি তুমি আমাকে একটু সাহায্য করতে, তবে আজ আমার এ দশা হত না। ইচ্ছা হচ্ছে তোমাকেও আমার সাথে নরকে টেনে নিয়ে যাই। কিন্তু নাঃ, তুমি একটা নির্বোধ। পালাও, এখনই পালাও। আমার বলা শেষ হয়েছে। পালাও, পালাও—।

নিরুদি দরজা খুলে দিলেন। মোহাচ্ছন্নের মত ঘর হতে বেরিয়ে সোজা স্টেশনে গেলাম। ট্রেন ছাড়তে প্রায় দু'ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। সে দু'ঘণ্টার মধ্যেও আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এল না। টিকিট করার সময় মনে পড়ল—ব্যাগটা তো আনি নি।

ব্যাগ আনতে আর ফিরে গেলাম না। ব্যাগে তিনখানা ধুতি আর একখানা এণ্ডি কি মট্‌কার চাদর ছিল, আর ছিল তেত্রিশটি টাকা। ও সমস্তের আশা ত্যাগ করলাম।

পকেটে ক' আনার পয়সা ছিল। তা দিয়ে রাজবাড়ী পযন্ত টিকিট হল, বেলগাছী পর্যন্ত হল না। অবশিষ্টটুকু বিনা টিকিটে এসে, রাত্রিটা বেলগাছি স্টেশনে মশার ভোজ দিয়ে, প্রভাতে গন্তব্য স্থলে পৌঁছলাম।

তারপর আরও দশ-বারো দিন জেলেদের মধ্যে থেকে, গেলাম নবদ্বীপ বাসায়। বাসায় পৌঁছে পেলাম একখানা খামে পত্র। পত্রখানা সাত-আটদিন এসে আছে। পেন্‌সিল দিয়ে লেখা। ঠিকানার লেখা দেখেই বুঝলাম নিরুদির পত্র।

পত্রখানা বহুদিন রেখেছিলাম। নবদ্বীপে প্রথম বন্যায় রাত্রে দু'ঘণ্টার মধ্যে ঘরের ভিতরে চার ফুট জল হওয়ায় বহু জিনিসের সাথে

চিঠিপত্রের ফাইলটাও নষ্ট হয়েছে। তবু এখনও দিদির পত্রের প্রতিটি অক্ষর আমার মনে আছে।

ভাই, তুমি আমার কথা শুনিয়া মুখ কালো করিয়া চলিয়া গেলে। লক্ষ্য করিয়াছিলাম তোমার চোখের জল। সেই জলে আমার বুকে আগুন জ্বলিয়াছে। দুইদিন কিছুই খাই নাই। ঘুমাই নাই। আজ সব ফেলিয়া যাইতেছি। হাতের শাঁখা খারু সব। তোমার ব্যাগ খুলিয়া প্রয়োজনীয় সব পাইয়াছি। তোমার ধুতি পরিয়াছি। তোমার চাদর গায় জড়াইয়াছি। তোমার টাকা কয়টি সম্বল করিয়া তোমার ব্যাগ হাতে, পথে বাহির হইলাম। রাজবাড়ী স্টেশনে আসিয়া কিছু খাইয়া এই পত্র লিখিতেছি। চাটগাঁ মেলে উঠিব। এদেশ ছাড়িয়া যাইব। এমন দেশে যাইব, যেখানে কেউ আমাকে না চেনে। আমার মত হতভাগিনী এ সংসারে বহু আছে। আমি তো আজ পথে বাহির হইতে পারিলাম, তাহাদের সে উপায়ও নাই। তাহারা ঘরে পড়িয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সৎভাবে সুখে থাক। ইতি—

তোমার নিরুদি।

তারপর এ পর্যন্ত নিরুদির আর কোনো সন্ধান পাই নি। এখনও মাঝে মাঝে নিরুদিকে স্বপ্নে দেখি।

একটি হতাশ আত্মা তার নারীজীবনের সর্বাপেক্ষা বড় বিপদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে চেয়েছিল আমার সাহায্য। সে সাহায্য আমি করি নি। এর জন্য যে মানসিক গ্লানি, তার থেকে মুক্ত হওয়ার মত কোনো অজুহাত আমার নেই।

সেদিন সেই শেষ দেখার শেষ মুহূর্তে আমার দুফোঁটা চোখের জল নিরুদিকে করেছে ঘর-ছাড়া। 'কর্তা জাল জুয়াচুরি, পরের সর্বনাশ করে টাকা এনে ছেলে মেয়ে বউকে পুলিপোলাও খাওয়াবেন, ভাল ভাল পোষাক গয়না পরাবেন, আর তাঁর ছেলে হবে রামচন্দর, মেয়ে-বউ হবে সতীসাবিত্রী—এ কখনও হয় না।'—নিরুদির এই কথা আমার মনকে করেছে এমন দুর্বল যে, জীবনে একটা দাঁও-ও মারতে পারলাম না।

কত করে মনকে বুঝাই, কত 'মহাজনের' দৃষ্টান্ত স্মরণ করি, কিন্তু কিছুতেই মন ঐ কুসংস্কার কাটিয়ে বুঝতে চায় না—এ জগতে একমাত্র টাকাই প্রকৃত পরমার্থ, 'যেন তেন প্রকারেণ টাকা সংগ্রহ গরীয়সী'।

হৃষিকেশ লছমন ঝোলায় শেষ দিন

সে দিন রাত্রে স্বর্গদ্বার আশ্রমকুটিরে নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় রাত প্রভাত হল। সম্মুখে দেখা দিয়েছে আবার অজ্ঞাত অনিশ্চিত পথের হাতছানি। সে হাতছানিতে সাড়া দিয়ে আবার পথে বেরুতে হবে। পথ যত দুর্গমই হোক না কেন, ও পথে চলতেই হবে। এ যে কেবল দলের আহ্বানেই সাড়া দেওয়া—তা নয়। আমার ভিতরের প্রবৃত্তিই পথে চলতে বাধ্য করছে।

অপরাহ্ন তিনটে বাজতেই গেলাম সদানন্দ অবধূত মহাশয়ের বাংলোয়। শুনলাম, ফেরারী প্রভাতে চলে গিয়েছেন বদরীনারায়ণের পথে। আমার বাড়ীতে পাঠানোর জন্য দেড়-শ' টাকা অবধূতের হাতে দিয়ে গিয়েছেন। সে টাকা কলকাতা হয়ে মা-এর হাতে পৌঁছাবে।

চা খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম অবধূত যেন বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাকে আজ চিন্তান্বিত দেখছি কেন! কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছেন কি?

ভাই, আমার ব্যক্তিগত দুঃসংবাদ বা সুসংবাদ পাওয়ার মত কিছু আর এ জগতে নেই। ফেরারীর মুখে তোমাদের পার্টির অবস্থা যা শুনলাম, তাতে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। নিরাপদে স্বাধীনতা লাভের আশায় অনেকে নাকি দলত্যাগ করে কংগ্রেসে ঢুকতে আরম্ভ করেছে।

তাতে দোষ কি? যদি তাঁদের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে দল ও কর্মপদ্ধতির বিভিন্নতায় বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে বলে তো মনে হয় না।

আপাতত ঐ রকমই মনে হয় বটে, কিন্তু কার্যকালে দেখা যাবে তা হবে না। সব ধর্মেরই উদ্দেশ্য—এ জগতে সকল মানুষ যাতে মিলে মিশে সুখে স্বচ্ছন্দে থেকে ভগবদারাধনা করে, ভগবানকে পায়। অথচ এই ধর্মের দোহাই দিয়ে পৃথিবীতে এযাবৎ যত নরহত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার ঘটেছে, তা আর কিছু উপলক্ষ্য করে ঘটেনি। তারমধ্যে আবার ধর্মান্তরিতরাই হয় আরও ভয়ঙ্কর। কালাপাহাড় অতি অল্পকালের মধ্যে যত হিন্দুদেবমন্দির ভেঙ্গে হিন্দুজাতির ওপরে অত্যাচার চালিয়েছিল, দিল্লীর সম্রাট আওরংজেব তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালেও ততটা করতে পারেন নি।

এতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন?

আমি বুঝাতে চাচ্ছি—যারা বিপ্লবীদল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে, তারা মনে-প্রাণে কংগ্রেসের বর্তমান অহিংস নীতি মেনে নিয়ে কাজ করতে পারবে না। কংগ্রেসের অহিংস ঝুনো নেতারাও এদের মানিয়ে নিতে পারবেন না। ফলে দেখা দেবে একটা বিশৃঙ্খলা। সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে, দেশের ধনী পুঁজিপতিরা ইংরেজের সহায়তায় শাসন ক্ষমতা হস্তগত করবে। গড়ে উঠবে বহু রাজনৈতিক উপদল। সে সব দলের নেতারা হবে কর্মবিমুখ বাক্যবাগীশ। প্রকৃত স্বাধীনতা—যাতে দেশের জনসাধারণের হিত হয়, তা পেতে বহু বিলম্ব হবে। কারণ, ঐ সমস্ত বাক্যবাগীশদের চিৎকারের ফলে প্রকৃত নিঃস্বার্থ দুঃসাহসী কর্মী পাওয়া দুর্ঘট হবে।

কংগ্রেস কেন বিপ্লবীদের মানিয়ে নিতে পারবে না, আর বিপ্লবীরাই বা কেন কংগ্রেসের নীতি মেনে চলতে পারবে না, তা একটু বুঝিয়ে বলুন?

এটা বুঝতে হলে অনেক কিছু বুঝতে হবে। সাধারণ জনসমাজ

নিছক রাজনীতি বোঝে না। সে জন্য সব দেশেই রাজনীতির সাথে ধর্মের ভেজাল চালানো হয়। ভারতেও এইজন্য প্রাচীনকালে রাজা-জমিদারদের দেবতা বলা হত। এই সুযোগে রাজা-জমিদার ছিলেন দেশের ও জনসমাজের নেতা। এই রাজা ও জমিদারদের যত দোষই থাকুক না কেন, এঁরা ছিলেন উগ্র স্বাধীনতা প্রিয় আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন। তাঁদের স্বভাবগত স্বাধীনতা-প্রীতি ও সম্মান-বোধ ১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।—

দূরদর্শী ইংরেজ কূটনীতিবিদেরা সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে বুঝেছিলেন, ভারতে জনসাধারণের নেতৃত্ব রাজা-জমিদারদের হাতে থাকলে, সেটা বৃটিশ শাসনের পক্ষে নিরাপদ হবে না। সেজন্য প্রাচীন রাজবংশের রাজা ও রাজকুমারদের সুকৌশলে ইযোরোপে পাঠিযে লণ্ডন, প্যারিস, মঁতেকার্লো, প্রভৃতি বিখ্যাত সহরের উৎকট বিলাস স্রোতে ভাসিযে দেওযার ব্যবস্থা হল। জমিদারদের দেওয়া আরম্ভ হল খেতাব। সেই সাথে এ দেশের সংবাদপত্রে ও সাহিত্য-উপন্যাসে প্রচার হতে লাগল. রাজা-জমিদারদেব অত্যাচার ও বিলাস-বৈভবের বর্ণনা। ফলে কিছুকালের মধ্যেই জনসাধারণের মনে রাজা ও জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠল। খসে গেল প্রাচীন যুগ যুগান্ত ব্যাপী নেতৃত্ব তাঁদের হাত হতে।—

এর পর স্বাভাবিক ভাবেই দেশের নেতৃত্ব এসে গেল উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে। এই শ্রেণীর হিন্দুনেতাদের মধ্যে তখন চলছিল ধর্মবিপ্লব। তাঁরা রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে কোনো প্রকার ধর্মের ভেজাল দিলেন না। অপর দিকে ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা, তাঁদের হারাণো সাম্রাজ্য ও কর্ত্তৃত্বের অবাস্তব নেশায় বিভোর হয়ে, দেশের রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। এর ফলে ভারতে উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নেতাদের ধর্মভেজাল শূন্য অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন দেশের জনসাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে নি। কোনো

কালে কোনো দেশে ধর্মভেজাল বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ শূন্য আন্দোলন সাধারণ জনমনে সাড়া দিতে পারে না। তারা বোঝে ধর্ম, ব্যক্তিগত স্বার্থ, আর কিছুটা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ।—

উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুনেতাদের রাজনৈতিক আন্দোলন জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাতে ব্যর্থ হলেও, তাঁদেরই ঘরের তরুণ মনে হল তীব্র ক্রিয়াশীল। দেশে গড়ে উঠল সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য ছোট ছোট দল।—

এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, টড্ সাহেবের 'রাজস্থান', ডি, এল, রায় ও রবি ঠাকুরের গান, বিবেকানন্দের বক্তৃতা, মুকুন্দ দাসের যাত্রা, প্রভৃতি ঘটালো বিপ্লবীদের কার্যকলাপের সাথে নির্দোষ ধর্মের ভেজাল। বিপ্লবীরা পেলেন জনমনে শ্রদ্ধার আসন।—

এই বিপ্লবী দলগুলির কার্যকলাপ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' উপলক্ষ্য ক'রে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করল, তাতে বৃটিশ সরকার চমকে উঠলেন। তাঁরা বুঝলেন ভারতের পূব আকাশে যে ঝড়ো মেঘ দেখা দিয়েছে, তার ঝড় সারা ভারতে বইবে। সে ঝড়ের মুখে শুকনো বাঁশপাতার মত উড়ে যাবে বৃটিশ সাম্রাজ্য আরব সাগর পার হয়ে।—

সুচতুর ইংরেজ কূটনীতিবিদগণ লক্ষ্য করে দেখলেন, এই আন্দোলন সম্পর্কে ভারতে একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায় উদাসীন। তাঁরা এই সুযোগে কয়েকজন মুসলমান নেতাকে হাত ক'রে, দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্মুখে ধরলেন ধর্মীয় পৃথক স্বার্থবাদের লোভনীয় টোপ। ভারতের বুকে আলীগড়ে স্থাপিত হল প্রথম ধর্মীয় পৃথক স্বার্থবাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি।—

বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় চলল ধর্মীয় পৃথক স্বার্থবাদের প্রচার। সে প্রচার কার্য জনসাধারণের মধ্যে কিরকম দ্রুত কার্যকর হয়েছে, তা প্রমাণ হল ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিং জেলায় বেগুনবাড়ীতে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অশোকাষ্টমীর মেলায় বিভৎস সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায়। সে হাঙ্গামার রূপ দেখে ইংরেজ বুঝে নিলেন—আর চিন্তা নেই, হিন্দুর হাতে বিপন্ন (?)

ইসলামেব জন্য জেগে উঠেছে ভাবতেব সাতকোটি মুসলমান (১৯১১) প্রযোজন হলেই এদেব কাজে লাগানো যাবে। বোমাক বিপ্লবীদেব ধবে কিছু ফাঁসি কাঠে ঝুলিযে, অবশিষ্টগুলোকে আন্দামানে পাঠালেই চলবে।—

বেগুনবাড়ীব হাঙ্গামা ভাবিযে তুলল দেশেব হিন্দু নেতাদেব। তাঁবা চেষ্টা আবম্ভ কবলেন মুসলমানদেব হাত কবতে। কিন্তু কি দিযে হাত কববেন? ইংবেজ তাদেব দিচ্ছেন সাম্প্রদাযিক হাব অপেক্ষাও বেশী বড বড চাকবি, জাযগিব, খেতাব, কতকিছু—একেবাবে হাতে হাতে নগদ বিদায। আব হিন্দু নেতাবা কেবল শোনান, ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভাবতেব অসাম্প্রদাযিক সোনাব স্বপ্ন। কাজেই 'ভবী ভুলল না'।—

তখন হিন্দু নেতাবা যে কোনো শিক্ষিত মুসলমানকে দলে ভিডোতে পাবলেই, তাকে মাথায তুলে এমন নাচন স্থুরু কবলেন যে, যাঁকে মুসলমান সম্প্রদায পূবে মোটেই চিনত না, তিনি হিন্দু নেতাদেব মাথা হতে এক লাফে মুসলমান সম্প্রদাযেব কাঁধে চ'ডে—হযে গেলেন বড নেতা।—

এই অবস্থা চলল ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধেব পবিসমাপ্তি পর্যন্ত।—

যুদ্ধেব বিপাকে প'ডে ইংবেজ সবকাব দিযেছিলেন ভাবতেব কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা—'হোমরুল'-এব প্রতিশ্রুতি। যুদ্ধেব বিপদ কেটে গেলে তাঁবা সে প্রতিশ্রুতি বক্ষায টালবাহানা আবম্ভ কবলেন। ফলে ১৯১৭—১৮ খৃষ্টাব্দে দেশে এমন অবস্থা দেখা দিল যে, মাবমুখী জনতার সম্মুখে ইংবেজ সবকাবেব ভাবতীয সৈন্য বিভাগে, অন্তত হিন্দু ও শিখ সৈন্যের আনুগত্য রক্ষিত হত কিনা সন্দেহ। এই বিপদে আলীগডেব দাওযাইও কাজে লাগল না। কাবণ ভাবতীয মুসলমানগণ প্রতি শুক্রবাবে জুম্মাব নামাজের সাথে তাঁদেব ইসলামরক্ষক খালিফা তুবস্কের স্থলতানের জন্য 'খোদবা' পড়েন, সেই খালিফা ইংবেজেব চক্রান্তে পদচ্যুত হওযায মুসলমান সমাজ ইংবেজ বিদ্বেষী হযে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনির সাথে 'বন্দে মাতরম্'-ও বলতে আরম্ভ করল।—

এই পরিস্থিতিতে ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতা হয়ে আবির্ভূত হলেন গান্ধীজী। তাঁর এক হাতে গীতা, কোরাণ, বাইবেল ; আর হাতে সেকেলে চরকা, পরণে বৈরাগীর বেশ ; মুখে বৌদ্ধ ও খৃষ্টানের অহিংসা-সহনশীলতার বাণী। ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে ধর্মভেজালের যে অভাব ছিল, সেটা দূর হল।—

থেমে গেল স্বাধীনতার জন্য জনসাধারণের হিংস্র উন্মত্ততা। তারা কান পেতে শুনছে, অহিংস-অসহযোগের বাণী, আর বিদেশীর মুখের বাহবা। কিনছে চরকা। পরছে মিলের খদ্দর। অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য করে লাখে লাখে নিরাপদে জেলে যাচ্ছে। বড় বড় ধনী ব্যবসাদারেরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস ফাণ্ডে অকাতরে অর্থ জোগান দিচ্ছেন। কেউ কেউ ভবিষ্যতে নেতা হওয়ার আশায় আইন অমান্য ক'রে জেলে যেয়ে 'এ' ক্লাস বন্দী হচ্ছেন। 'এ' ক্লাস বন্দীদের সুখ সুবিধার জন্য বোম্বাইয়ের 'আগা খাঁ প্যালেসের' মত বড় বড় বাড়ী ইংরেজ সরকার দখলে নিচ্ছেন। দেশে ধর্মভেজালহীন অপর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি উবে যাচ্ছে। পুরনো নেতাদের কতকগুলি গান্ধীপন্থী হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব মাত্র বজায় রেখেছেন। যাঁরা তা করছেন না, তাঁরা জনসমাজে আর পাত্তাই পাচ্ছেন না। লক্ষ্য করে দেখ, এখন (১৯২৬) আসমুদ্র হিমাচল 'গান্ধীজী কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাবে, এই আন্দোলনে অতিষ্ঠ হয়ে ইংরেজ ভারত-শাসন কর্তৃত্ব ভারতীয়দের হাতে দিয়ে সরে দাঁড়াবে।

আমি উৎসাহ ভরে বললাম,—তা হলেই তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এতে আমাদের দল ভেঙ্গে গেলে ক্ষতি কি ?

হ্যাঁ, ক্ষতি হবে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।' প্রবাদটা কঠোর সত্য। এখন স্বাধীনতা লাভের জন্য একটা অপূর্ব উন্মাদনা নিয়ে বিভিন্ন স্বার্থের মানুষ কংগ্রেস পতাকা তলে একত্রিত হয়েছে বটে, কিন্তু ধনতন্ত্রী ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর

করবে এদেশের ধনী ব্যবসাদারদের হাতে। এই ব্যবসাদার গোষ্ঠী যদি অতিলোভের বশবর্তী হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তবে দেশ চলে যাবে সাম্যবাদী ডাণ্ডাবাজদের হাতে। এই সাম্যবাদী ডাণ্ডাবাজীর অপর নাম 'একনায়ক তন্ত্র'। সেই একনায়কের শাসনে একটি মাত্র ধর্ম ও সম্প্রদায় টিকে থাকবে, অপর সব ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্মূল হবে। অথবা সব ধর্মই লোপ হয়ে দেশ নিরীশ্বরবাদী হয়ে যাবে। স্বাধীন ভারতের সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা প্রতিরোধের জন্য ভগবদ্‌বিশ্বাসী নির্ভীক দুঃসাহসী নিঃস্বার্থ কর্মী একমাত্র তোমরাই গড়ে তুলতে পার। সেই জন্য আজ তোমাদের দলে ভাঙ্গন ধরেছে শুনে একটু চিন্তিত হয়েছি।

আপনি যে একনায়ক তন্ত্র ও সাম্যবাদের কথা বললেন ওটা কি রাশিয়ান কমিউনিজিম্ ?

হাঁ, তাই বটে। তবে কোনো ইজিমের জন্যই তোমাদের বিদেশীর দ্বারস্থ হতে হবে না। একটু খোঁজ করলেই দেখতে পাবে, সবরকম 'ইজিম্' বা 'তন্ত্র' আমাদের ঘরেই আছে। রাশিয়ান কমিউনিজিম্ নিরীশ্বরবাদী। ওরকম ইজিম্ তো আছেই, তা ছাড়া সেশ্বর সাম্যবাদও আছে।

সে টা কি রকম ?

সে টা বহু শাস্ত্রেই বলেছেন। তোমাকে আমি বেদের 'ঈশ উপনিষৎ' হতে একটা শ্রুতি শোনাচ্ছি,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১ ॥

যেমন যৌথ পরিবারে একজন সর্বময় কর্তা থাকেন, সেই রকম এই জগতের সর্বময় কর্তা পরমেশ্বর। তোমরা সকলেই সেই পরমেশ্বরের জগৎ-সংসারের এক একটি পোষ্য বা মেম্বর। সে জন্য তোমার কৃতিত্বে অর্জিত ধনসম্পদ সব সেই কর্তা ঈশ্বরকে সমর্পণ ক'রে, অপর সকলের সাথে সমানভাবে ভোগ কর। তোমার অর্জিত ধনসম্পদে অপর সকলের যে অধিকার আছে, তা হতে তাদের বঞ্চিত ক'র না।'

এই শ্রুতি যে সাম্যবাদের কথা বলছেন, সেটা সেশ্বর সাম্যবাদ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে নিরীশ্বর সাম্যবাদের কথা আছে।—

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহীনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥ ৭।১৪।৮॥

পেট ভরতে যা দরকার, সেই টুকুর ওপরেই তোমার অধিকার আছে। তার চাইতে যে বেশী চাইবে—অর্থাৎ অপরকে বঞ্চিত করে সঞ্চয় করবে, সে চোরের মতই দণ্ডনীয়।'—

এটি নিরীশ্বর সাম্যবাদ। এ রকমের বহু কথা আমাদের বেদ ও পুরাণে আছে।

আমি প্রশ্ন করলাম—সেই জন্যই বোধ হয় কংগ্রেসী নেতারা রোজ ছ'পয়সা মূল্যের খাদ্য খান, আর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করেন?

অবধূত হেসে বললেন,—তোমার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। একবার আমি বীরভূম জেলায় তারাপীঠে যেয়ে দেখি হৈ হৈ, রৈ রৈ ব্যাপার। বহুলোক সমাগম চলছে। এক সাধু এসেছেন, তিনি একদম 'অনাহারী বাবা।' ভক্ত ও ভক্তিমতীরা যে সমস্ত খাদ্য এনে অনাহারী বাবার সম্মুখে ধরেন, তা হতে বেলপাতার আগা দিয়ে একটু তুলে শুঁখে প্রসাদ করে দেন, বদন বিবরের ভিতর দিয়ে উদরগহ্বরে কিছু পাঠান না।

অনাহারী বাবার তেলকুচকুচে নেওয়াপাতি ভুঁড়ি দেখে মনে সন্দেহ হল। রাত্রে আর ঘুমোলাম না, লক্ষ্য রাখলাম সাধুবাবার আস্তানার ওপরে। শেষরাত্রে অনাহারী বাবা কুটিরের দরজা খুলে বেরিয়ে চললেন মাঠের দিকে। হাতে তাঁর জলপাত্র। আমিও অলক্ষ্যে তাঁর পিছু নিলাম।

মাঠে যেয়ে এক জায়গায় বসে অনাহারী বাবা তাঁর কাজ সমাধা করে উঠে গেলেম। এগিয়ে যেয়ে দেখলাম—আমরা সাধারণ মানুষে দু'বেলা ভাত রুটি ডাল তরকারি—অনেক কিছু গিলে যা নামাই, অনাহারী বাবা তার চাইতে বেশী নামিয়েছেন।—

রাজনৈতিক নেতা হতে হলে চাই অসাধারণ শারীরিক শক্তি, গলার

জোর আর ঠাণ্ডা মাথা। ছ' পয়সার খাদ্য কখনো তা যোগাতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন ছ' পয়সার ভাত, রুটি, ডাল তরকারির আড়ালে দু'তিন সের খাঁটি দুধ, আর দু'তিন গ্লাস কমলা, বেদানা, আঙ্গুরের টাট্‌কা রস।—

রেলগাড়ীতে থার্ডক্লাসে ভ্রমণটাও 'ছত্রিশ জন বসিবেক'-এর গাড়ীতে ছাপ্পান্ন জনের গাদাগাদির মধ্যে নয়। তা হলে আর গাড়ী হতে নেমেই সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা সম্ভব হতে পারে না। ওটা 'ছত্রিশ জন বসিবেক'-এর গাড়ী ছয় জনের জন্য রিজার্ভ করা। ওতে যে টাকা খরচ হয়, তা দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করেও টাকা বাঁচানো যায়।—

তা হলেও ঐ ছ'পয়সার খাদ্য খাওয়া আর থার্ডক্লাসে ভ্রমণের একটা বিশেষ রাজনৈতিক মূল্য আছে। মনে রাখতে হবে, ভারত সাধুভক্তের দেশ। এ দেশে মুসলমান বিজয়ের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, হিন্দু রাজাদের সাথে যুদ্ধে মুসলমান সেনাপতি পরাজিত হয়ে ফিরে যাওয়ার পর, কোনো আউলিয়া বা দরবেশ এসে, দু'একটা কেরামতি দেখিয়ে, সেই রাজা ও তাঁর রাজ্যের বহু প্রজাকে মুসলমান করেছেন।

আচ্ছা, আমাদের হিন্দু সাধুদের কি কোনো কেরামতি দেখানোর ক্ষমতা নেই ?

যথেষ্ট আছে। ওগুলোকে হিন্দু শাস্ত্রে যোগ বিভূতি বলে। ব্যবসাদার হিন্দু সাধুরা দু'চারটে বিভূতি আয়ত্ত করে বেশ ব্যবসা করে। প্রকৃত সাধু যাঁরা, তাঁরা ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষপ্রাপ্তির বাধক বলে ঐ সমস্ত বিভূতি ঘৃণার চোখে দেখেন। এখানেই খয়ের বনে কেশবানন্দজী নামে এক সাধু আছেন। তিনি মাঝে মাঝে দু'একটা বিভূতি প্রকাশ করেন বলে, স্বর্গদ্বারের মহাত্মারা তাঁর সঙ্গ করেন না। বৃন্দাবনে হরানন্দ পরিব্রাজক আছেন। তাঁর বহু বিভূতি আমি দেখেছি। তিনি ইচ্ছা মাত্রে অপরের রোগ নিজ শরীরে টেনে নিয়ে, তাকে রোগ মুক্ত করতে

পারেন। এক হাঁড়ি খিচুড়ি রেঁধে যত ইচ্ছা লোক খাওয়াতে পারেন। যদি কাউকে বলেন—'তুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাক'—তবে তাকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, নিজের ইচ্ছায় হাত নামাতে পারবে না। *

আচ্ছা, এখন আমাদের 'ঘরের সাম্যবাদ' সম্পর্কে কিছু বলুন ?

সেশ্বর সাম্যবাদ রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে কোথাও কোনোকালে চালু হয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ ইতিহাস বা পুরাণে দেখি নি। ধর্মাচরণ ব্যাপারে একমাত্র হিন্দুদের মধ্যে অনাদিকাল হতে ওটা প্রচলিত আছে। কঠোপনিষৎ বলেন,—

"যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥ ১।১।১৪

সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। মেঘ দুর্গম পর্বতে বৃষ্টি বর্ষণ করে। বৃষ্টিধারা বিভিন্ন নদ নদী হয়ে একমাত্র মহাসমুদ্রের দিকেই প্রবাহিত হয়। সেই প্রকারেই এ জগতে বিভিন্ন ধর্ম এক পরমেশ্বর হতে উৎপন্ন ও মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে প্রচারিত হয়ে একমাত্র পরমেশ্বর তত্ত্বে পৌঁছানোর পথ রূপে গণ্য হয়েছে।"

এ প্রকার বাণী কি অন্য কোনো ধর্মে নেই ?

আছে বলে তো মনে হয় না। যদি থাকত তবে ধর্ম্মান্তরিত করা কি করে সম্ভব হবে ? 'যত মত তত পথ', 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম,' এসব সিদ্ধান্ত হিন্দুদের মধ্যেই চলে। অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে এ প্রকার কথা বলেন বলে আমি এপর্যন্ত কোথাও শুনি নি। বরং কেউ বললে তেড়ে আসার দু'চারটে ঘটনা জানি। আকবর বাদশা এই 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' মতাবলম্বী হয়ে উঠেছিলেন। সে জন্য মুসলমান সমাজে আওরংজেবের তুলনায় তিনি হীন বলে গণ্য হন।

---

* এই হরানন্দ পরিব্রাজক নবদ্বীপ এসে মণিপুরের পূর্বে গঙ্গার ধারে আশ্রমে তিনবছর বাস করে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর ঐ সমস্ত বিভূতি আমি নিজেও দেখেছি। নবদ্বীপে—বিশেষ করে তেঘড়ি পাড়ার বহুলোকেও দেখেছেন।

তা হলে সমাজ হতে সব ধর্ম ঝেঁটিয়ে বিদায় করাই তো ভাল ?

না তাও হয় না। পুরাণে দেখা যায় সম্রাট বেণ সেই চেষ্টা করে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। কেউ তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করেনি।

আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, প্রকৃত ধর্ম নিয়ে খুব কম লোকেই মাথা ঘামায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতলব হাসিল করার জন্য উপায়টার ওপরে একটু ধর্মের রং ধরানো হয় মাত্র। বর্তমানে বিজ্ঞানবলে অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। পৃথিবীতে যদি এমন একটা দিন আসে, যখন মানব বিজ্ঞানের সাহায্যে তাদের সব অভাব মিটিয়ে নিতে পারবে, তখন বোধ হয় এই মারামারি হানাহানি থাকবে না। মানুষ তখন কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই ধর্মালোচনা করবে।

অবধূত আমার কথায় হেসে বললেন,—সে চেষ্টাও একবার হয়েছিল। ভাগবতে দেখা যায়, সম্রাট হিরণ্যকশিপু বিজ্ঞান বলে তাঁর প্রজাদের সব রকম সুখ-সুবিধে করে দিয়েছিলেন। ক্ষেতে অনায়াসে শস্য জন্মাত। সব ফল সব গাছে বারোমাস ফলত। আকাশে কৃত্রিম চাঁদ সারারাত আলো দিত। সমুদ্রগর্ভের মণিমুক্তা নদীর জোয়ারে ভেসে মানুষের হাতে আসত। প্রকৃতি মানুষের আয়ত্বে প্রায় এসে গিয়েছিল। আধিব্যাধি দৈবদুর্যোগ ছিল না। হিরণ্যকশিপুর রাজত্বে প্রজাদের সুখ সুবিধের কাছে কোথায় লাগে 'রাম-রাজত্ব'।—

এত করেও সম্রাট হিরণ্যকশিপু প্রজাদের সুখী করতে পারলেন না। প্রজাদের মধ্যে ফৌজদারী মামলা অসম্ভব বেড়ে গেল। অভাব অভিযোগ, কাজ কর্ম যখন কিছু নেই, তখন 'দে খুড়োর নামে এক নম্বর মামলা ঠুকে'—চলল।—

দেখে শুনে সম্রাট গেলেন চটে। তিনি সব প্রজাপতি—অর্থাৎ গ্রামের মাতব্বরদের ডেকে এনে সন্তান উৎপাদন নিষেধ করে বললেন,—'এই স্রষ্টা ব্রহ্মা ঠিকমত সৃষ্টি করতে পারেন নি। এই ব্রহ্মার সৃষ্টিতে

এমন দোষ আছে, যে দোষ দূর করে মানুষকে সুখী ও সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। তোমরা কেউ আর সন্তান উৎপাদন ক'র না। যা জন্মিয়েছ তারই ঠেলা সামলানো যাচ্ছে না। আমি তপস্যা করে ব্রহ্মা হয়ে দোষ শূন্য মানুষ সৃষ্টি করব'।—এই বলে সম্রাট বনে গেলেন তপস্যা করতে।—

তোমরা যে মনে ভাবছ, ইংরেজ তাড়িয়ে ভারত স্বাধীন হলে সব দুর্ভোগ দূর হয়ে একেবারে স্বর্গসুখ নেমে আসবে, সেটা ভুল। ভারত স্বাধীন হলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠবে।

কেন জটিল হবে ?

অন্য সব সমস্যা ছেড়ে দিয়ে, এই ধর্ম সমস্যাটা নিয়েই চিন্তা করতে পার। হিন্দু—ধর্মে সাম্যবাদী। সে কোনো ধর্মকেই অধর্ম মনে করে না। স্বাধীনতা লাভের পর যদি এদেশে ধর্মীয় পৃথক স্বার্থবাদী কোনো সম্প্রদায় দেখা দেয়, তবে হিন্দুদের এই পরধর্ম সহিষ্ণুতা গুণ থাকবে না। যদি ভারতে হিন্দু সমাজের এই মহৎগুণ বিনষ্ট হয়, তবে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হবে।

এর কি কোনো প্রতিকার নেই ?

হাঁ আছে। বর্তমানে পৃথিবীতে সভ্যসমাজে যে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা চলেছে, তাতে সব সভ্যদেশের মনীষীরাই হিন্দুশাস্ত্রের এই পর ধর্ম সহিষ্ণু মতবাদ মেনে নিয়েছেন। তবে এ মতবাদ এখনও হিন্দুমনীষী ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী মনীষী নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করছেন না। যদি করেন, তবে ভারতে ঐ ভয়ঙ্কর বিপদ এড়ানো যাবে, নচেৎ এড়ানো যাবে না। নেতারা যদি কেবল হিন্দু সমাজের ওপরেই তাঁদের উপদেশামৃত বর্ষণ করতে থাকেন, তবে বিপদ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে।

এইবার একটু রাজনৈতিক 'ইজিম্' বা 'তন্ত্র' গুলি সম্পর্কে বলুন ?

রাজনীতির ক্ষেত্রে একমাত্র ডাণ্ডা-তন্ত্র বা ইজিম্ ছাড়া আর কোনো তন্ত্র বা ইজিম্ নেই। অপরগুলি ঐ ডাণ্ডাতন্ত্রের মুখোসের নাম মাত্র।

চিরকালই এই চলে আসছে, ভবিষ্যতেও এই চলবে। ডাণ্ডাটা যদি নিরঙ্কুশ ভাবে রাজা, প্রেসিডেণ্ট বা প্রধানমন্ত্রীর আয়ত্তে থাকে, তবে 'একনায়কতন্ত্র' বলা হয়। জনসাধারণের হাতে থাকলে 'গণতন্ত্র' বলে। দল বিশেষের হাতে থাকলে 'ফ্যাসিজিম্' বলা যায়। আর পুঁজিপতিদের হাতে থাকলে তাকে 'ধনতন্ত্র' বা 'ক্যাপিটেলিজিম' বলে।

তবে এই জনসাধারণের ভোটাভুটির তাৎপর্য কি ?

ভোটাভুটির তাৎপর্য বুঝতে হবে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাথার ওপরে কারা ডাণ্ডা ঘুরোচ্ছে, তাই দেখে।—

এই জন্যই তোমাদের দলটা টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন। স্বাধীনতা লাভের পর ডাণ্ডাটা যাতে জনসাধারণের হাতে এসে, সেটার উপযুক্ত ব্যবহার হয়, সেই ব্যবস্থা করার জন্য তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে।—

এখন এ সব কথা থাক। তোমার বর্তমান কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলি। এই একমাস পরিচয়ের মধ্যে তুমি যে আভাসেও প্রকৃত পরিচয় জানতে দাও নি, তার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। যাই হোক এখন তুমি বৃন্দাবনে যাও। সহর বৃন্দাবনে থেক না। গোবর্ধন পর্বতে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের নিকটে শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজ আছেন। তাঁর নিকটে তোমার নিরাপদ আশ্রয় মিলবে। বাবাজী মহারাজের নিকটে অকপটে সকল কথা বলবে। তিনি পরম বৈষ্ণব আর মহা-পণ্ডিত ব্যক্তি। সত্যিকারের বৈষ্ণব মাত্রেই স্বদেশ-প্রেমিক। তাঁরা তাঁদের শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাভূমি ম্লেচ্ছ পদানত দেখে অন্তরে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করেন। যারা ভারতের এই গ্লানি দূর ক'রতে চেষ্টা করে, তাদের বৈষ্ণবেরা স্নেহ করেন। হয়তো তোমাদের মত ও পথ অনেক বৈষ্ণবমহাতমা অনুমোদন করেন না, তাই বলে তোমাদের বিপদে সাধ্য মত সাহায্য ক'রতে কোনও প্রকৃত বৈষ্ণবই কুণ্ঠিত হবেন না। আশ্চর্যের বিষয় ইংরেজের গুপ্তচর বিভাগ এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে অত্যন্ত নিরাপদ মনে করে।

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে তিনি আবার বললেন,—তুমি আমার কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছ, নাঃ? তোমাদের নবদ্বীপেও কয়েকজন বৈষ্ণব আছেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ ভাবসিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁর সাথে তুমি আলাপ করতে পারবে না। পোড়া-ঘাটের দক্ষিণে একটা টোঙের মধ্যে আছেন শ্রীল হরিবোল বাবাজী, আর সমাজবাড়ীতে আছেন শ্রীললিতা সখীজী। সুযোগ পেলে এই দু'জনের সাথে আলাপ ক'রে দেখো। দুজনেই অতি উচ্চস্তরের সাধক। তা সত্বেও দেখতে পাবে, তাঁরা দেশের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য কত উৎকণ্ঠিত।

আমি বললাম,—যা হোক আজ আপনার মুখে বৈষ্ণব প্রশংসা শুনে ধন্য হলাম।

অবধূত গম্ভীর হয়ে ধীরে ধীরে বললেন,—আমি কারও প্রশংসাও করি নে, নিন্দাও করি নে। কারও মুখে কিছু শুনেই কোনো একটা ধারণা ক'রে নেওয়াও আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। আমি আমার সাধ্যমত যেখানে যত সাধু সন্নাসী পেয়েছি, তাদের সাথে মিশে বুঝতে চেষ্টা ক'রেছি, তাঁদের মতবাদ ও আচার ব্যবহার। যাঁরা সত্যিকারের সাধন-নিষ্ঠ সাধু, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি, তা তিনি যে কোনো সম্প্রদায়ের সাধু হন না কেন। হরিদ্বারের নিকটে চণ্ডী পাহাড়ে এক 'অঘোরী বাবা' আছেন। তিনি শব মাংস ভোজী। তাঁকেও আমি শ্রদ্ধা করি। বৈষ্ণবদের প্রতি যদি আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব থেকে থাকে, তবে তার কারণ আছে। এক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া, ভারতে আর সমস্ত সাধক সম্প্রদায়, সাধু সন্ন্যাসী, বিদ্বান পণ্ডিত এ জগৎটাকে মিথ্যা মায়া বলেন। এ জগতের ভালমন্দ নিয়ে তাঁরা বিশেষ কোনো চিন্তা করেন না। অন্তত তাঁরা যে মতাবলম্বী, তাতে তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থ ও দর্শনশাস্ত্র জগৎটাকে মিথ্যা-মায়া ব'লে প্রতিপন্ন ক'রে, এ নিয়ে মাথাঘামানোর বিরোধী। তাঁরা এই মিথ্যা মায়ার সংসারজাল ছিন্ন ক'রে নিজের মোক্ষ নিয়েই ব্যস্ত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যপণ্ডিতগণ তা নন। একমাত্র তাঁরাই এ জগৎটাকে বলেন বাস্তব সত্য। এই বাস্তব-সত্য জগতে নিত্য-সত্য ভগবান আসেন, তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট লীলারস আস্বাদন করতে। যে পৃথিবীর বুকে আনন্দ-ব্রহ্ম ভগবান নেমে আসেন, আনন্দ রস উপভোগ ক'রে আর সমস্ত ভক্তবৃন্দকে আনন্দিত করতে, সেই পৃথিবীকে স্বাধীন সুন্দর মধুময় করে তোলার জন্য, একমাত্র এই বৈষ্ণবদেরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। আমি সেই জন্যই তাঁদের পক্ষপাতী।

সারা দিনটা আমার মনের মধ্যে যে অশান্তির কালো মেঘ জমাট বেঁধে ছিল, অবধূতের এই কথাগুলির দম্‌কা হাওয়ায় সেটা কেটে যেয়ে, বেশ একটা আনন্দের রেশে মন ভরে গেল। মন বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য সাগ্রহে প্রস্তুত হল। এর আগে আমার বৈষ্ণবদের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ছিল, অবধূতের কথায় সে ভাবটাও অনেকটা দূর হল।

অবধূত মহাশয়কে জানালাম—আগামীকাল হৃষীকেশে কালীকমলির গদীতে যেয়ে, ম্যানেজারের সাথে এ বিষয়ে একটু পরামর্শ করতে হবে। তিনি আমার অকৃত্রিম বন্ধু। বিকালে এসে সমস্ত জানাব, এবং বৃন্দাবনে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও উপদেশ গ্রহণ করব। এই বলে সেদিনের মত বিদায় নিলাম।

পরদিন প্রাতে গেলাম হৃষীকেশে। গদীতে উপস্থিত হতেই ম্যানেজার অতি আগ্রহে আমার হাত ধরে সেই ছোট ঘরটায় নিয়ে বসিয়ে, সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমার সম্মুখে বসে বললেন,—আপনার সমস্ত পরিচয় ফকিরের মুখে শুনেছি। আমি পূর্বেও অনুমান করেছিলাম, আপনি আমাদেরই লোক। দলীয় নিয়মানুযায়ী আপনাকে বিশেষ কিছুই জিজ্ঞাসা করি নি, বা আমার পরিচয়ও দিই নি। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী রামপ্রসাদ বিসি্‌ল আমার বন্ধু, ঠাকুর রোশনলাল আমার আত্মীয়। আমার দ্বারা যদি আপনাদের কোনও সাহায্য সম্ভব হয়, আমি জান কবুল করেও তা করব। আমার মনে হয়, এখন আপনার বৃন্দাবন যাওয়াটা ঠিক

হবে না। বৃন্দাবনে সংবাদ আদান প্রদানে অনেক অসুবিধা ও বিলম্ব হবে। তার চাইতে বরং আপনি এখন থানেশ্বরে আমার গুরুজীর মঠে যেয়ে থাকুন। সেখানে আপনার সাথে যোগাযোগ রাখার সুবিধা হবে। ঐ মঠে থাকলে মনে হয়, আপনার বিপদাশঙ্কাও সর্বাপেক্ষা কম হবে। যদি সম্মত হন, তবে আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।

ম্যানেজারের কথা শুনে, অবধূত মহাশয়ের সাথে পরামর্শ করার কথা বলে, সেদিনের মত বিদায় নিলাম। অপরাহ্নে নিয়মিত সময়ে অবধূত-আশ্রমে উপস্থিত হ'য়ে ম্যানেজারের কথা জানালাম। শুনে অবধূত সম্মতি জানিয়ে বললেন,—লক্ষ্ণৌএর ব্যাপার না মেটা পর্যন্ত থানেশ্বর মঠে থাকাই ভাল। ও ব্যাপার মিটলে, বৃন্দাবন-গোবর্ধন পবতে বাবাজী মহারাজই সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয়। সে আশ্রয়ে তোমার নানা বিষয়ে মঙ্গল হতে পারে।

এরপর দু'দিনের মধ্যেই আমার যাওয়ার ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। বিদায়ের পূর্ব দিনে অবধূত পরামর্শ দিলেন, বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বে যেন আমার সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করে বৈষ্ণব বেশ গ্রহণ করি, এবং বাবাজী মহারাজের ছাত্র হয়ে 'মাধুকরী'করে খাই। তা হলে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকব। আমার বাড়ীতে সকলে যে না খেয়ে মরবে না, সে বিষয়েও পুনরায় আশ্বাস দিলেন। তারপর প্রণাম করে বিদায় হতে তিনিও আমার সাথে লছমনঝোলা পর্য্যন্ত এগিয়ে এলেন। পথে পরামর্শ দিলেন,—বৃন্দাবনে গোবিন্দবাগে হরানন্দ পরিব্রাজক আছেন, আমি যেয়ে যেন তাঁর সাথে দেখা করি। তিনিও আমাদের একজন পৃষ্ঠপোষক।

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন,—আমার মনে হয় তোমার বিরুদ্ধে পুলিসের হাতে মারাত্মক কোনো প্রমাণ নেই। কেবলমাত্র সন্দেহের বশে তোমাকে ভুগিয়েছে। সত্যিই যদি তোমার নামে ওয়ারেণ্ট থাকত, তবে তুমি পুরীতে ঐ দু'মাস অমন ভাবে কাটাতে পারতে না। যাই হোক তথাপি সাবধান থাকাই প্রয়োজন। উপস্থিত এই ব্যাপারটায়

যদি কোনো বিপদ না ঘটে, তবে আমি হরানন্দ পরিব্রাজক মহারাজের দ্বারা অনুসন্ধান করে দেখব, পুলিস মহলে তোমাকে নিয়ে কি চলছে। ঐ পরিব্রাজক মহাশয়ের নিজস্ব লোক কলকাতা লালবাজারের উপর মহলে আছেন। সেখান হতে খুব সম্ভব সঠিক সংবাদ পাওয়া যাবে। তবে তাতে কিছু সময় লাগবে।

লছমনঝোলার সম্মুখে এসে অবধূত মহাশয় শেষ বিদায় দিলেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম করে শেষ আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম।

সন্ধ্যারপর স্বর্গদ্বার সত্রের পরিচালক ম্যানেজারের সাথে দেখা করে জানালাম,—আমি পরদিনই স্বর্গদ্বার ছেড়ে চ'লে যাব।

শুনে ম্যানেজার দুঃখিত হয়ে বললেন,—মহারাজ, আপনি এই তিন মাসের মধ্যে একদিনও কিছু ফরমাস করলেন না। আমি আপনাদের সেবক। আমাকে প্রয়োজনমত যদি হুকুম না করেন, তবে কি করে আপনার সেবা করব? যদি কোনও দোষ ত্রুটি হয়ে থাকে, কৃপা করে বলুন, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে সাধ্যমত আপনার সেবা করতে চেষ্টা করব।

বুঝলাম, ম্যানেজার ধরে নিয়েছেন, তাঁর কোনো দোষ ত্রুটির জন্যই আমি অন্যত্র চলে যাচ্ছি। আমি বললাম—আপনার কোনো দোষ নেই। আমি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, প্রয়োজনীয় বস্তু আমার অল্পই। এখানে যা আপনি দিয়েছেন, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এক জায়গায় বহুদিন থাকা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। সেই জন্যই এখন এস্থান ত্যাগ করে থানেশ্বরে যাচ্ছি। থানেশ্বর মঠে থাকার ব্যবস্থা, আপনাদের হৃষীকেশ গদীর ম্যানেজারই করেছেন।

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-ম্যানেজার অতি শ্রদ্ধাভরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

মনে পড়ল আমার ছেলেবেলার একটা ঘটনা। আমাদের বাড়ীতে তৎকালে প্রসিদ্ধ শ্যামা বাগ্‌দী মহাশয়ের দলের যাত্রাগান হচ্ছিল। পালাটা ছিল যযাতির নরমেধ যজ্ঞ। শ্যামাবাগ্‌দী মশাই হয়েছেন

শুক্রাচার্য, আর এক ব্রাহ্মণনন্দন হয়েছেন রাজা যযাতি। অভিনয়ে শুক্রাচার্য যখন যযাতিকে অভিসম্পাত করলেন, তখন যযাতি ক্ষমা প্রার্থী হয়ে শুক্রাচার্যের চরণ জড়িয়ে ধরলেন।

দৃশ্যটা শেষ হ'লে, কি একটা দেবার জন্য সাজঘরে যেয়ে দেখি, শুক্রাচার্য রাজা যযাতিকে ধম্‌কাচ্ছেন,—'হাঁ ঠাকুর, তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে একেবারে আমার পা-টাই জড়িয়ে ধরলে? এটা যে অভিনয়, তা ভুলে যাও কেন? একটু ধর্ম বাঁচিয়ে চলতে হয়। দাও দেখি একটু তোমার পায়ের ধুলো।'

সেদিনকার সেই অভিনেতা ব্রাহ্মণকে ধমকিয়ে, তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে, মহানুভব শ্যামাবাগ্‌দী মহাশয়ের ধর্ম বাঁচানো ও অপরাধ-মুক্তির দৃষ্টান্ত মনে পড়লেও, আমার পক্ষে সে উপায় গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমার অভিনয় যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরোপুরি বজায় রেখে চলতে হবে।

তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসতেই কানে এল ম্যানেজার কাকে যেন বলছেন, 'বহুৎ বড়িয়া মহাতমা হ্যায়।' শুনে হাসিও পেল, দুঃখও হল।

পরদিন প্রভাতেই হৃষীকেশের পথে যাত্রা করলাম। লছমনঝোলার ওপরে উঠে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম। মনে পড়ল—তিন দিন পূর্বে হয়তো এমনি সময়ে, এই ঝোলাসেতু পার হয়ে, ঐ হিমালয়ের দুর্গম বরফ-ঢাকা দুর্জয় মৃত্যু-উপত্যকা অতিক্রম করতে চলে গেছেন এক মহান দুর্দান্ত বিপ্লবী। যাঁর স্বদেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, নির্ভীক বীরত্ব, পৃথিবীর কারও চাইতে অল্প নয়। তবুও হয়তো তাঁর নামটিও কেউ ভবিষ্যতে জানতে পারবে না।

থানেশ্বরের পথে

হৃষীকেশ হতে বেলা দু'টোর ট্রেনে হরিদ্বার যেযে দিল্লী, প্যাসেঞ্জার ধবতে হবে। বর্ষায় সাহারাণপুর ও আম্বালার মধ্যে বেললাইন ভেঙ্গে যাওয়ায, ও পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ। দিল্লী ঘুরে কুরুক্ষেত্র যেতে হবে. থানেশ্বব কুরুক্ষেত্রের নিকটে।

হৃষীকেশে কালীকমলির গদীর ম্যানেজার নিজে সাথে এসে, ভায়া দিল্লী কুরুক্ষেত্রের একখানা থার্ডক্লাস টিকিট করে, গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন। হবিদ্বার এসে বেলা চাবটেয দিল্লীপ্যাসেঞ্জারে উঠলাম। গাড়ীতে ভিড় ছিল না। এক প্রান্তে জানলার ধাবে আমার সেই আদরাব বোনের দেওযা পুরণো কম্বলটা বিছিযে, আরাম করে বসলাম।

স্বর্গদ্বারে গদী থেকে যা কিছু দিযেছিল, সমস্তই সেই কুটিরে রেখে এসেছি। কম্বল দু'খানা ও লোটাটা সাথে নেওয়াব জন্য ম্যানেজার বলেছিলেন, কিন্তু তা নিলাম না। কারণ, বুঝতে পেরেছি, সন্ন্যাসীর পক্ষে ওর কোনো অভাব হয় না। তারপর এই ক'মাস স্বর্গদ্বার আশ্রমে বাস করে, সমস্ত দেখেশুনে একটা ধারণা হয়েছে, বাবা কালীকমলিওয়ালা সত্যিকারের মহদুদ্দেশ্য নিয়ে এই মহান্ প্রতিষ্ঠানটি গড়েছেন। সেই সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত বলে, এব প্রত্যেকটি কর্মচারী, এমন কি ঝাড়ুদারগুলি পর্যন্ত মহৎ। একটি পয়সার জিনিসও তারা অসদুপায়ে আত্মসাৎ করে না। বড় বড় ধনী দাতারা এসে, সাধুদের কুটিরদ্বারে কাপড়, কম্বল, টাকা, ইত্যাদি রেখে যান। সাধুমহাতমারা সেগুলো তাকিয়েও দেখেন না। সত্রের ঝাড়ুদার বা জমাদার সমস্ত কুড়িয়ে নিয়ে গদীতে জমা দেয়। পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে, একটি পয়সার জিনিসও খোয়া যায় না। সত্যিকারের মহদুদ্দেশ্যের এমনি মহিমা।

হরিদ্বার থেকে গাড়ী ছেড়ে দিল, আর আমি চিন্তা-সমুদ্রে ডুবে গেলাম। সে চিন্তা স্বর্গদ্বারকে কেন্দ্র করেই চলেছিল বেশী। চিন্তা ক্ষেত্রে কোনো সময় দুর্দান্ত ফেরারী চলেছেন দুর্গম বরফঢাকা পথে, কোনো সময় নরঘাতক দস্যু গাইছে 'পতিত পাবন সীতারাম'।

গাড়ী কোন কোন স্টেশন পার হয়ে গেল, খেয়াল নেই। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকেও কিছু দেখি নি। গাড়ীতে কত লোক উঠছে নামছে, কিছুই লক্ষ্য করি নি। চারিদিকে কত কথা, কত শব্দ হচ্ছে, তাও শুনি নি। আমি আমার চিন্তায় বিভোর।

হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙ্গল, একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমার পায়ে হাত দিয়েছেন। বিরক্ত হয়ে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—কি চাই ?

ভদ্রলোক অতি বিনীতভাবে তাঁর পাঞ্জাবী হিন্দীতে যা বললেন, তার মর্মার্থ—তিনি যে আমার মত ধ্যানমগ্ন মহাতমার ধ্যানভঙ্গ করলেন, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমাকে কিছু খাদ্য গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছেন। রাত্রি দশটা বাজে, গাড়ী সাহারাণপুর এসেছে। সাহারাণপুরের জল ভাল বলে, যাত্রীরা এখানেই খাওয়া সেরে নেয়। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে আমার মত মহাপুরুষকে অভুক্ত রেখে, কারও খাদ্য-গ্রহণে রুচি নেই। তাই গাড়ীর সমস্ত যাত্রীর অনুরোধে, মহাতমার ধ্যান ভাঙ্গানোর মত দারুণ দুঃসাহস তিনি করেছেন।

দেখলাম গাড়ীর সমস্ত পুরুষ ও মহিলা হাত জোড় ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। অনুরোধকারীর পিছনে আছেন একটি মহিলা। তাঁর হাতে একখানা থালায় প্রায় একসের মেওয়া, দুটো কলা, আর দুটো আম। মুখখানা মাতৃত্বের অভিব্যঞ্জনায় সমুজ্জ্বল।

এ দৃশ্যের সম্মুখে তখন যে ভাব আমার মনে জেগেছিল, তা বর্ণনা করতে চেষ্টা করব না। যিনি ভারতের এই অদ্ভুত মানসিক ঐশ্বর্য-মাধুর্য্যভরা দান দেখেছেন, তিনি বুঝবেন। আমি সেই মাতৃমূর্তির হাতের থালা হতে দু'মুঠ মেওয়া ও কলা দু'টো নিয়ে, গেরুয়ার ওপরে রেখে, খেতে নিতেই তিনি থালাখানা আমার পাশে নামাতে দিলেন।

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম, যা নিয়েছি তাই আমাব পক্ষে যথেষ্ট. আব লাগবেনা।

ভদ্রলোক পবেব দিনেব সম্বল স্বরূপ সবগুলোই বাখতে অনুবোধ কবলেন।

আমি উত্তব দিলাম, পবেব দিনেব জন্য ভগবান আছেন। আমি কিছু বয়ে নিয়ে বেড়াই নে।

আমাব উত্তব শুনে ভদ্রলোক খুশী হলেন, কি দুঃখিত হলেন, তা বুঝা গেল না। ভদ্রমহিলা অবশিষ্ট মেওয়া সমেত থালাখানা গাড়ীব সমস্ত যাত্রীব সম্মুখে ধবতে লাগলেন। সকলেই থালা থেকে কিছু মেওয়া নিয়ে, মাথায় ছুঁইয়ে, খেলেন।

বুঝলাম, মহাত্মাব শ্রীকব স্পৃষ্ট মেওয়া প্রসাদেব মর্যাদা লাভ কবেছে।

আমাব খাওয়া শেষ হতেই আব একটি ভদ্রমহিলা জলেব কুঁজো হাতে এগিয়ে এলেন। হাত পেতে জল খেলাম দেখে, একজন একটা লোটা দিতে চাইলেন। তাও নিলাম না। কানে ভেসে এল, কে যেন বলছে,—'বহুৎ বড়িয়া ত্যাগী মহাত্মা'।

কথাটা শুনলাম মাত্র। তখনও আমাব মত গেরুয়াধাবীব 'বহুৎ বড়িয়া মহাত্মা' হওয়াব পবিণতি ঠিকমত বুঝে উঠতে পাবি নি। পাবলে তখনই গাড়ী থেকে নেমে, পববর্তী ট্রেন ধবা উচিৎ ছিল। পুলিস ওয়াবেন্টেব ফেবাবী আসামী, আব সংসাববন্ধনভীত যথার্থ সন্ন্যাসী—এ দু'জনেবই এই দিক থেকে অবস্থা সমান। দু'জনেবই 'বড়িয়া মহাত্মা' হওয়া চলে না। এবিষয়ে অসতর্ক হলেই ফেবাবী ধবা পড়ে যান জেলে, বা ফাঁসি কাঠে; আব গেরুয়াপবা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিণী বা আশ্রম-জননী নিয়ে হন উৎকট বিষয়ভোগী মহাত্মা। ভণ্ডামী ও প্রতারণা হয় তাঁর অবশিষ্ট জীবনব্রত।

জল খেয়ে স্থির হয়ে বসে আমাব চিন্তায় ডুবে গেলাম। সদানন্দ অবধূত ভরসা দিয়েছেন, আমার বউ ছেলে না খেয়ে মরবে না। বহুকাল

পরে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। লক্ষ্ণৌতে যদি ডাক পড়ে, তবে আমি নির্দেশ পালনকারী যন্ত্র মাত্র। কি হ'বে না হবে, তা নিয়ে মাথাঘামিয়ে লাভ নেই। যদি কিছু মন্দই হয়, তবে সদানন্দ অবধূতই আছেন।

কি অদ্ভুত ঐ সদানন্দ অবধূত! কতবড় ভোগী! কতবড় ত্যাগী! কতবড় সমালোচক! কি অদ্ভুত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী! আর কতবড় দেশপ্রেম! তাঁকে আমি যে প্রকার দেখেছিলাম, আজ লিখতে বসে তার অল্পই কলমের মুখে প্রকাশ পেল।

গাড়ী চলছে একটার পর একটা স্টেশন পার হয়ে, তার নির্দিষ্ট পথে লক্ষ্য স্থির রেখে। আমার লক্ষ্যহীন চিন্তা চলেছে, বহুস্থান, বহুঘটনা, বহু ব্যক্তিকে জড়িয়ে নিয়ে।

আদরার বোনটির মুখভাবের সাথে, এই পাঞ্জাবী মহিলাটির মুখ ভাবের কি আশ্চর্য সাদৃশ্য! এটা কেবল সাধ-সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাই নয়! এর পিছনে আছে, অপূর্ব একটা সমবেদনার করুণ সুর। এঁরা হয়তো ভাবেন, আমার বাড়ীতে যাদের ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছি, তাদের অন্তরের দুঃখের কথা। অল্প বয়সী সন্ন্যাসী আমি, আমার মায়ের দুঃখ, বোনের দুঃখ, স্ত্রী থাকলে তার দুঃখ, আর তাদের ছেড়ে এসে পথে পথে আমার দুঃখ। তাই আমার মত অল্পবয়সী সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই, স্নেহশীলা নারী-হৃদয়ের স্নেহসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

অনেকে বলেন, সাধু সন্ন্যাসীর পতনের বড় কারণ নাকি নারীর স্নেহ। এ কথা অস্বীকার করার মত সাহস আমারও নেই। তথাপি একটা কথা, একটা প্রশ্ন, মনে জাগে—বৃষ্টির ধারা অকাতরে সর্বত্র বর্ষিত হয়। সে ধারা ময়লা আবর্জনা স্তূপে প'ড়ে, তাকে পচিয়ে, যদি দুর্গন্ধ ছড়ায়, তবে সে দোষটা বৃষ্টিধারার, না আবর্জনা স্তূপের?

রাতটা কেটে গেল। ইচ্ছে করলে আমি বেশ আরামে ঘুমিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু নানা চিন্তায় ঘুমই এল না। প্রাতে সাতটায় দিল্লী

জংসনে গাড়ী পেঁাছাবে, পেঁাছানোর কিছু পূর্বে একজন সহযাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বলতে হল, আমার গন্তব্য স্থল থানেশ্বর মঠ, আসছি হৃষীকেশ স্বর্গদ্বার আশ্রম হতে। কথাটা সকলেই সাগ্রহে জেনে নিয়ে, আমার ওপবে আরও শ্রদ্ধান্বিত হ'যে উঠলেন। তাঁদের কথায় বুঝলাম, উত্তরপশ্চিম ভাবতে থানেশ্বব মঠের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। সে মঠে এমন কযেকজন মহাপুরুষ আছেন, যাঁদেব খ্যাতি ও অঞ্চলে সবজন-বিদিত।

দিল্লী জংসনে আমাদেব গাড়ী পেঁাছে শেষ থামা থামলো। যাত্রীরা তাঁদেব মালপত্র নিযে নামতে লাগলেন। আমি গাড়ীর একপ্রান্তে ছিলাম। অ'মার ব্যস্ততাব কোনো কাবণ নেই, কুরুক্ষেত্র যাওয়ার গাড়ী ছাড়বে বেলা বারোটায। কাজেই সকলের শেষে নামব স্থির করলাম।

গাড়ীব ভিতর থেকেই লক্ষ্য কবলাম, বাইরে প্লাটফর্মে বেশ লোক জমছে। যারা জমাযেৎ হচ্ছে, তারা আমার দিকে তাকিযে আছে। কেউ কেউ আবার হাত জোড় কবে প্রণাম জানাচ্ছে। দেখে অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো।

সকলের শেষে গাড়ী থেকে নামা মাত্র, প্রণামের হুড পড়ে গেল। ক্রমেই ভিড় বৃদ্ধি। যারা জানে না, তারা ভক্তদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচ্ছে,—বহুৎ বড়িয়া রাজকুমাব সন্ন্যাসী হ্যায়। ত্যাগী মহাতমা হ্যায়। লছমনঝোলে পর বাবা কালীকমলেবালাকা অছ্রম্ সরগ্দোযারমে রনেবালা বড়িয়া মহাতমা হ্যায়। থানেশ্বর মঠপর মহাতমালোক সাথ্ মোলাকাত করনেকো যাতা হ্যায়। একঠো সমাধিপর ভররাত চল্‌গয়া।

শুনে তো আমার চক্ষুস্থির। 'যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই রাত হয়!' ফেরারী আসামী আমি, আমি চাই আত্মগোপন করতে। আর আমার সেই আত্মগোপন চেষ্টাই লোক-চক্ষে আরও বেশী করে আমাকে ধরিয়ে দেয়!

অসীম ধৈর্য সহকারে দাঁড়িয়ে আছি। সে সময় আমার মুখের ভাব কেমন হয়েছিল, তা আজ এই কাহিনী লিখতে বসে, আমারই দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কুরুক্ষেত্রে চক্রব্যূহের মধ্যে, সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যু তবুও তাঁর সামর্থ্যানুযায়ী আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। দিল্লী ষ্টেশনে সে দিন তিন সপ্ত একুশ ডজন ভক্ত পরিবেষ্টিত আমি, একদম নিরুপায়।

এমন সময় আজমীড় এক্স্প্রেস এসে সম্মুখেই থেমে গেল। ভিড় আরও বৃদ্ধি হল। শান্তিরক্ষক পুলিশের পাগড়ি গোটা চারেক ভিড়ের বাইরের সারে দেখা যাচ্ছে। সমানে প্রণাম, 'গোড়লাগে মহারাজ', চলছে। আবার কানে এল,—'কৈলাস রনেবালা মহাতমা। পানশো বরষ্ উমর হো গয়া, লেকিন লেড়্কা মাফিক ছুরৎ হ্যায়'।

সর্বনাশ! এরই মধ্যে আমার পাঁচ শ' বছর বয়স পার হয়ে গেল? আমি তো জানতাম ছাব্বিশ পার হয়ে সাতাশে পা দিয়েছি মাত্র! তার পর একেবারে ভূতনাথ মহাদেবের কৈলাসের অধিবাসী!! আমি এ নরলোকে নরদেহে টিকে আছি তো?

শ্রীমধুসূদন নামে আমাদের এক বিপদতারণ ঠাকুর নাকি আছেন। এ বিপদে তাঁর নামটাও মনে পড়ল না। ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন প্লাটফর্ম সুপারিনটেণ্ডেণ্ট লেবেল আঁটা এক ভদ্রলোক। ইসারায় তাঁকে ডেকে নিকটে এনে ইংরেজীতে বললাম—মহাশয়, অনুগ্রহ করে এই ভক্তদের হাত থেকে আমাকে বাঁচান। আমি নিতান্ত সাধারণ সন্ন্যাসী। এরা যা ধারণা করেছে, তার কিছুই আমি নই।

আমার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কানে এল, ভিড়ের মধ্যে বলাবলি হচ্ছে, 'বহুৎ বিদ্বান্ হ্যায়'। 'অংরেজীওয়ালা বিদ্বান বড়িয়া সাধু হ্যায়'।

আমার অবস্থা দেখে ও কথা শুনে প্লাটফর্ম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বোধ হয় বেশ একটু কৌতূহলী হলেন। একজন পুলিস অফিসার ও দু'জন

কনস্টেবলের সহায়তায়, আমাকে ভিড় থেকে বের করে, তাঁর অফিসে এনে বসালেন। অফিসের দরজায় চাপরাসি ও একজন কনস্টেবল পাহারায় থাকল।

অফিস ঘরেও দশ বারোজন রেল কর্মচারী ও দু-দু'জন পুলিস অফিসার জুটলেন। পুলিস অফিসার দেখে, মনটা বেশ শক্ত করে নিয়ে, স্থির হয়ে বসলাম। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি।

উত্তর দিলাম—আমি কিছুই জানিনে। আসছি হৃষীকেশ স্বর্গদ্বার আশ্রম থেকে। যাব থানেশ্বর মঠে। গাড়ীর মধ্যে আমার নিজের চিন্তায়ই বিভোর ছিলাম। কারও সাথে বিশেষ কোনো আলাপ করি নি। কি করে যে আমি কৈলাসের অধিবাসী পাঁচ শ' বছরের সন্ন্যাসী ত্যাগী রাজকুমার হয়ে গেলাম, তা কিছুই জানি নে। মেওয়া ও জল খাওয়ার কথাও বললাম।

আমার কথা শুনে একজন বলে উঠলেন, এই তো সাচ্চা মহাত্মার লক্ষণ।

একজন পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার সাথে তো লোটা, কম্বল, ইত্যাদি কিছু দেখছি নে?

প্রশ্ন শুনে মনে পড়ল, তাইতো! আমার বহির্বাসের পুটুলি, কম্বল গেল কোথায়?

আমি চঞ্চল হ'য়েছি দেখে অফিসারটি আবার প্রশ্ন করলেন,—

আপনার সাথে কি কিছু ছিল?

হ্যাঁ। একখানা পুরণো কম্বলে জড়ানো দু'খানা বহির্বাস, আর দু'টো জামা ছিল।

গাড়ী থেকে সেটা নামিয়েছিলেন তো?

হ্যাঁ। পুটুলিটা বগলে করেই নেমেছি, তা আমার বেশ মনে আছে।

পুটুলির মধ্যে নোট, গিনি, কি পরিমাণ ছিল?

কিছুই না। ও সব আমি পাব কোথায়?

সাধুবাবাদের ছেঁড়া কম্বলের পুটুলির মধ্যে থাকে, হাজার হাজার টাকার নোট ; জটের মধ্যে থাকে, থান থান সোনা আর মোহর। চোরেরা তা জানে। কাজেই আপনার বগল থেকে কম্বল চুরি হয়ে গেছে। জট থাকলে সেটাও চুরি যেত।

জট কি করে চুরি যাবে ?

আপনি কত দিন সন্ন্যাসী হয়েছেন ?

অতি অল্প দিন, প্রায় দু'মাস হল।

কোথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন ?

পুরীধামে, জগন্নাথ ক্ষেত্রে।

তার পর কোথায় কোথায় ছিলেন ?

সন্ন্যাস নেওয়ার পর গুরুজী আমাকে হৃষীকেশে বাবা কালী কমলিওয়ালার গদীতে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের স্বর্গদ্বার আশ্রমে কুটিরে থাকতাম। সেখানে আমার মত অল্পবয়সী সন্ন্যাসীর উপদেশ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার মত উপযুক্ত মহাতমা না পাওয়ায়, থানেশ্বর মঠে যাচ্ছি।

ওঃ, সেই জন্যই আপনি ভবঘুরে ব্যবসাদার সাধুসন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ওদের অধিকাংশেরই জট আসল নয়, দোকান হতে কিনে সাথে রাখে, প্রয়োজন মত মাথায় বসিয়ে নেয়। কেউ আবার পছন্দ মত জট কিনে নিয়ে, আসল চুলের সাথে জুড়ে নেয়। জটের পাগড়ির মধ্যে গাঁজা, আফিং রাখার ভাল জায়গা আছে। তাতে আবকারি ফাঁকি দিয়ে ভাল ব্যবসা চলে। মোটা জটগুলো ভিতরে ফাঁপা থলের মত। ঐ ফাঁপা জটের থলের মধ্যে থাকে সোনার বাট, মোহর, গিনি।

আমার পিছন থেকে এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—আপনি এ রকম সন্ন্যাসী হলেন কেন ?

আমার চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে দেখলাম, প্রশ্নকর্তা উপস্থিত সকলের মধ্যে বয়সে প্রবীণ। বিভাগীয় চিহ্ন কিছু না থাকায়, কোন বিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত, তা জানা গেল না।

তিনি বললেন—আমি বাইশ বছর কলকাতা ছিলাম। সে সময়ে বাঙ্গালী সমাজে মিশে দেখেছি, শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলেরা তিনটি কারণে সন্ন্যাসী হয়।—

একশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত ভাবপ্রবণ যুবক দেশ ও দশের সেবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে, রামকৃষ্ণ মিশন বা ঐ প্রকার কোনো প্রতিষ্ঠানে ঢোকেন।—

আর একশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত যুবক সন্ন্যাসীর বেশ ধরে কিছুকাল নিখরচায় দেশ ভ্রমণ করে, শেষে গেরুয়া ফেলে সংসারী হন। পরে তাঁরা ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে দু'পয়সা কামাই ও সামাজিক গল্পের আসরে বেশ প্রতিষ্ঠাও পান।—

অপর একশ্রেণীর শিক্ষিত বুদ্ধিমান বাঙ্গালী, সাধারণ কর্মক্ষেত্রে নিজের উচ্চাভিলায পূর্ণকরার ভালমত সুযোগ না পেয়ে, শেষ পর্যন্ত গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী হন। এই শ্রেণীর সাধুরা প্রত্যেকেই এক একটা অভিনব মতবাদ, অথবা প্রচলিত মতবাদের সাথে কিছু নূতনত্ব জুড়ে দিয়ে, জোর প্রচারকার্য চালিয়ে বহু অর্থ উপার্জন করেন। এরা সাধারণ ধনীবাঙ্গালীদের চাইতেও বেশী ভোগবিলাসে প্রমত্ত। এই শ্রেণীর চরম লক্ষ্য হচ্ছে, অবতারত্ব বা পরমহংসত্ব লাভ।—

এই তিন শ্রেণীর বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসীদের কারও কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক সাধন ভাজন নেই। বাইরে যে টুকু দেখান বা বলেন, ওটা কেবল ভক্ত ও শিষ্য সংগ্রহের জন্য প্রচার কার্য মাত্র। আপনাকে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ফেলতে পারছিনে। তাই জানতে চাই—আপনি সন্ন্যাসী হলেন কেন?

অবাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গালীর নিন্দা শুনে মন গরম হয়ে উঠল। সোজা উত্তর না দিয়ে, একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম।—

আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে, আপনাকেই কয়েকটি প্রশ্ন করব। উত্তরটা কিন্তু সঠিক দেবেন।—আপনি যখন প্রথম চাকরিতে ঢোকেন, তখন কি এমন মাইনে পেতেন, যাতে আপনার সংসার সচ্ছলভাবে চলতে পারতো?

ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন,—না।

অভাবটা কি আপনার পৈতৃক সম্পত্তি হতে পূরণ হত ?

এবার একটু ঘাবড়িয়ে উত্তর দিলেন,—নাঃ।

এইবার সত্যকরে বলুন তো, তখন আপনার ঘাটতি পূরণ কি ক'র হত ?

এ প্রশ্নের সম্মুখে দেখলাম সকলেই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। প্রশ্নকর্তা মুখ নীচু ক'রে মেঝেয় জুতো ঠুকছেন।

সকলের ভাবটা দেখে নিয়ে হেসে বললাম,—আপনারা ঘাবড়াবেন না। এ প্রশ্ন কেবলমাত্র আপনাদের লক্ষ্য করেই করি নি। বড়লোক-চাকুরে বাদে, আর সকলের সম্মুখেই আমি এ প্রশ্ন তুলে ধরছি। দেখছি, আপনারা সকলেই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। বেশ, আমিই উত্তর দিচ্ছি। আপনারা সাধারণভাবে চাকরিতে প্রবেশ করে প্রথম দিকে যে মাইনে পান, তাতে সংসার চালাতে না পেরে, অনেকেই বাধ্য হয়ে যে উপায়ে অর্থ উপার্জন করে সংসারের ঘাটতি পূরণ করেন, সেই উপায় অবলম্বন করতে পারব না বলেই সংসার করার আশা ছেড়ে দিয়ে, সন্ন্যাসী হয়েছি।

আমার কথায় ঘরের আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে গেল। আলোচনা আরম্ভ হল—সত্যই তো মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের ছেলে, স্কুল কলেজে পাঠ্যাবস্থায় সরকারী-বেসরকারী চাকুরিয়াদের ঘুষ খাওয়া নিয়ে, কতই না বিরুদ্ধ সমালোচনা করে। তারাই চাকরি-জীবনে প্রবেশ করে, এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়, যাতে বাধ্য হয়ে অসৎপন্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। এর জন্য দায়ী তাদের নিয়োগ কর্তারাই। মোটামুটি ভদ্রভাবে পরিবার প্রতিপালনের মত মাইনে দেওয়া হবেনা, অথচ তাদের নিকটে সততা, কর্মকুশলতা, দাবি করা হবে! এ যেন গরুর খাওয়ার ব্যবস্থা না করে, প্রচুর দুধের দাবি করা।

বুঝলাম, আমার ফাঁড়া আপাতত কেটে গেছে। আর কেউই পরিচয়ের জন্য কৌতূহলী হলেন না। পুলিস অফিসার দু'জন প্রস্তাব

করলেন, আমি যদি তাঁদের সাথে যাই, তবে স্টেশনেই রেল পুলিস অফিসে ভাল বাথরুম আছে। সেখানে স্নান করে কিছু খেয়ে নিলে, তাঁরা খুশী হবেন।

তাঁদের প্রস্তাব শুনে প্লাটফর্ম সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বললেন—আমার খাওয়ানোর ভারটা তিনি অপর কাউকে দিতে পারেন না। কারণ, আমি প্রথমে তাঁরই শরণাপন্ন হয়েছি, অতএব আমি তাঁরই অতিথি।

প্রসিদ্ধ শার্লক হোম্‌সের বইতে পড়েছিলাম, মানুষ যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন, সে কিন্তু তার নিকটস্থ বিষয়েই বেশী ভুল করে। জনতাই সবচাইতে নির্জন, আর পুলিশ অফিসই ফেরারীর পক্ষে নিরাপদ স্থান।

আমিও নিশ্চিন্ত মনে দিল্লী স্টেশনে রেল পুলিস অফিসে গেলাম। স্নান, ভোজন, বিশ্রাম, ভালই হল।

সাড়ে বারোটায় আমবালা প্যাসেঞ্জার ছাড়ে। পনরো মিনিট পূর্বে প্লাটফর্ম সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এসে আমাকে নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে তুলে দিলেন। আমার থার্ডক্লাস টিকিট আছে বলতে টিকিটখানা নিয়ে গার্ড সাহেবের হাতে দিলেন। শেষ বিদায় দেবার জন্য প্রায় তিরিশ জন রেল কর্মচারী ও পুলিস অফিসার, আর দশ বারোজন ভদ্র মহিলা উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের ভাবভঙ্গীতে বুঝলাম, সকলেই আমাকে একজন সাঁচ্চা সন্ন্যাসী বুঝে নিয়েছেন। প্রণাম, গোড় লাগে মহারাজ, কৃপা করিয়ে মহারাজ—যথারীতি চ'লল। গাড়ী ছাড়লে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি মোহ

দিল্লী ছেড়ে ঘণ্টাখানেক চলাব পরই গাড়ী মাঝে মাঝে থামতে লাগল। বন্যায় রাস্তার অনেক জায়গা ভেঙ্গেছে। গার্ড সাহেব অবকাশ পেলেই আমার গাড়ীতে উঠে গল্প জুড়ে দেন। দু'জন চেকারও তাঁর সাথে জুটে গেলেন। তাঁরা জানতে চান আমি কোনো অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ দেখেছি কিনা।

আমি স্বর্গদ্বারে যা দেখেছি ও সদানন্দ অবধূতের মুখে যা শুনেছি, তাই বললাম। এই সমস্ত কথাপ্রসঙ্গে ও পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতায় মনে হয়, অবাঙ্গালী শিক্ষিত জনসাধারণ, শিক্ষিত বাঙ্গালীদের চাইতে সাধুসন্ন্যাসীদেব প্রতি বেশী শ্রদ্ধাশীল।

বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলোক—যাঁরা সাধু সন্ন্যাসীর ভক্ত বা শিষ্য হন, তাঁদের অনেকেরই মতলব সাধুমহাত্মার কৃপায বিনা পরিশ্রমে মোক্ষ 'ইনসিওর' করা। সে জন্য তাঁরা আর্থিক 'প্রিমিয়ামটা' ভালমতই দিয়ে থাকতেন।

অবাঙ্গালী সমাজে কিন্তু মোক্ষ নিয়ে কাউকে বড় একটা মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। তাঁরা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো—সকলেই সাধুমহাত্মা খোঁজেন, অলৌকিক শক্তির সাহায্যে কোনো বৈষয়িক সমস্যার সুমীমাংসা করে নেওয়ার মতলবে।

সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তির সাহায্যে লাভবান হওয়ার গল্পও সবদেশে সমান প্রচলিত। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ও সমস্ত গল্পের মূলে কোনো সত্য নেই।

আমি এক মারোয়াড়ী ব্যবসাদারের কাহিনী জানি। মারোয়াড়ীটি অতি অল্পকালের মধ্যে ব্যবসা করে ধনী হয়েছে। অপরাপর সকলের ধারণা, সে কোনো সাধুর নিকটে এমন কোনো বস্তু পেয়েছে, যার মহিমায় তার এই অসম্ভব উন্নতি। বুদ্ধিমান মারোয়াড়ীটিও সে কথা স্বীকার করে

সাধুর কৃপাপ্রাপ্তির একটা মিথ্যে গল্প সকলকে শুনাতো। ফলে তার ব্যবসায় কোনো প্রতিদ্বন্দী ছিল না।

সাধু-মহাত্মাদের কোনো অলৌকিক শক্তি নেই—এ কথা আমি বলছি নে। আমার বক্তব্য—যাঁরা সাধন ভজনের পরিশ্রম ফাকি দিয়ে গুরুর ওপর 'ব-কলমের' জোরে মোক্ষলাভের আশায়, অথবা সাধুসন্ন্যাসীর শক্তির সাহায্যে লৌকিক অলৌকিক, স্বার্থসিদ্ধির আশায়

'যেখানে পাইবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।'

এই মহাজন বাক্য স্মরণ করে, সাধু সন্ন্যাসীর নাম শুনেই ছোটেন, তাদের অনেকের ভাগ্যেই সাধু সন্ন্যাসীর ছাই উড়োতে যেয়ে নিজস্ব বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ছাই ভস্ম-আবর্জনার স্থান আস্তাকুঁড়ে সদৃশ ব্যবসাদার সাধুবাবাদের আস্তানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে, ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী একটা কিম্ভুত কিমাকার হন। ও দিকে ট্যাঁকও বেশ খালি হতে থাকে।

সিদ্ধ মহাত্মার কৃপায় রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় কিনা, তা আমি জানি নে। আমার এই সুদীর্ঘ চলার পথে ও রকম ঘটনা কোথাও দেখি নি। সাধু মহাত্মাদের কৃপায় নরাধম যে নরোত্তম হয়ে ওঠে, তা দেখেছি। স্বর্গদ্বারের রামভকত এর একটা বড় প্রমাণ।

রামভকতের ছিল সৎ হওয়ার জন্য আকুল আগ্রহ। সাধু মহাত্মাদের সম্মুখে এসে প্রথমেই সে তার সারাজীবনের অপকর্ম-কাহিনী অকপটে মহাত্মাদের শুনেয়েছিল, তারপর কেবল কৃপা ভিক্ষা।

সে ভিক্ষা মিলল। সাধুমহাত্মাদের অলৌকিক কৃপায় খুনী ডাকাত হয়ে গেল নিষ্কিঞ্চন 'রামভকত মহারাজ'। আরম্ভ করল সে কঠোর সাধন।

শিক্ষিত ও পদস্থ বাঙ্গালীদের মধ্যে বয়সটা পঞ্চাশের কোঠা পার না হলে, বড় কেউ ধর্ম-কর্ম সাধু-গুরুর ধার ধারেন না; বরং ধর্ম-কর্ম সাধুগুরু নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করেন। শেষ বয়সে কেউ কেউ পরোকালের ভয়ে সাধু গুরু খোঁজেন। এঁদের অবস্থা অনেকটা পল্লীগ্রামে গৃহস্থ

বাড়ীর পিছনে আমগাছের মাথায় দোদুল্যমান কুমড়োর মত। গাছের নীচে যে কুমড়ো ফলে, তা গৃহস্থ পেড়ে খায়। আগডালে ওঠা যায় না, লগা দিয়ে পাড়লে আস্তাকুঁড়েয় পড়ে, সে জন্য, সে গুলো পেকে ঝুলতে থাকে। তারপর গাছ শুখিয়ে অথবা ঝড়-বাতাসে ছিঁড়ে, আস্তাকুঁড়েয় পড়ে ভাঙ্গে। ভাঙ্গা কুমড়ো খায় শুয়োরে, অথবা পচে।

সমাজবৃক্ষের উঁচু স্তরে অবস্থিতদেরও প্রায় এই অবস্থা। এঁরা ব্যবসাদার সাধুবাবাদের খপ্পরে পড়ে এমন মোহগ্রস্ত হন যে, শাস্ত্রযুক্তির দ্বারাও সে মোহ ভাঙ্গানো যায় না।

একবার উত্তর বঙ্গে কোনো এক সহরে গিয়েছি। সহরের বার লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট হ বাবু যেমন উকিল হিসাবে গণ্যমান্য, তেমনি ধর্মশাস্ত্র পড়া ধার্মিক বলেও সর্বজন মান্য। সহরে কোনো সাধু-গুরুবাবা আসলে তাঁর চরণধূলি অযাচিত ভাবেই হ-বাবুর বৈঠকখানায় পড়ে। কোনো সজ্জন এসেছেন শুনলে হ-বাবু যান তাঁর সাথে দেখা করতে।

সেদিন আমি ও হ-বাবু তাঁর বৈঠকখানায় বসে গল্প করছি। এমন সময় দু'খানা বড় ট্যাক্সি এসে সম্মুখের রাস্তায় থামল। সম্মুখের গাড়ী হতে নামলেন এক সাধু।

সাধুটির বয়স ষাটের ওপরে হবে, দেখতে বেশ সুপুরুষ। চুল, দাড়ি ও পোষাকে রবিঠাকুরের দ্বিতীয় সংস্করণ। পোষাকের রংটা অবশ্য গেরুয়া, যে হেতু তিনি সন্ন্যাসী। হাতের আঙ্গুলে নানা রঙের পাথর বসানো আংটি ঝলমল করছে।

আমরা দু'জন এগিয়ে গেলাম। হ-বাবুকে দেখেই সন্ন্যাসী মহারাজ দু'হাত বাড়িয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন। উচ্ছ্বসিত প্রেমের উচ্ছ্বাসটা একটু কমলে সাধু হ-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

সেই প্রথম যে বার আসি, সে বার আপনার দর্শন পেয়েছিলাম। তারপর এ ক'বছরে এসে আপনাকে সংবাদ দিয়েও দর্শন পাই নে কেন ?

সময় হয়ে ওঠে না, তাই কোথাও যাই নে।

এটা কি একটা উত্তর হল ? প্রতিদিনই তো দেখি এই ভদ্রলোকের সাথে বেড়াতে যান।

এই ভদ্রলোকের সাথে বেড়িয়ে আমার কিছু লাভ হয়। ইনি 'পথচারী', পায়ে ভয়ানক জোর। আমি উকিল, মুখে জোর থাকলেও পায় কুড়ে। গাড়ীর দু'টো বলদের একটা বলবান ও চালু হয়ে অপরটা যদি কুড়ে হয়, তবে বলবান চালু বলদটা কুড়েটাকে জোরে হাঁটতে বাধ্য করে। এঁর সাথে বেড়াতে আমাকেও জোরপায়ে হাঁটতে হয়। ফলে বেশ খিদে পায়, রাত্রে ভাল ঘুম হয়। এই লাভের আশায় ওঁর সাথে বেড়াই।

কেন, সাধু-সজ্জনের নিকটে গেলে কি কিছু লাভ হয় না ?

শাস্ত্র তো বলেন সাধুসঙ্গ-গুণে অনেক কিছু—এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত লাভ হয়। কিন্তু যখন দেখি—সাধু, সন্ন্যাসী, সিদ্ধ মহাপুরুষ, গৃহস্থশিষ্যের বাড়ী এসে বহুদিন থেকে, শিষ্যের হাতে রাজসেবা গ্রহণ করার পরও শিষ্যদের অসৎ মতি-গতির কোনো পরিবর্তন হয় না, তখন আমার মত বাইরের লোক দু'একঘণ্টা সাধু-সঙ্গ করে, কি লাভের আশা করতে পারে বলুন ?

আচ্ছা, আচ্ছা, বড় চমৎকার কথা শুনালেন। এ বিষয়ে আপনার সাথে অবসর মত আলোচনা করব। এই তো, সাধু-সজ্জনের নিকটে এলেই কিছু না কিছু লাভ হয়। আপনার নিকটে না এলে কি এমন তত্ত্ব-কথা শুনতে পেতাম ? আচ্ছা, এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি। এখন যাই, পরে দেখা হবে।—বলতে বলতে সাধুবাবা গাড়ীতে উঠলেন।

গাড়ীতে ওঠার সময় সাধুবাবার এক ভক্তিমতী জিজ্ঞাসা করলেন,—

হ-বাবু ও সব কি বললেন ?

ও তোমরা বুঝবে না। হ-বাবু মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর কথা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সময় মত আমি বুঝিয়ে দেব।

ট্যাক্সি ছেড়ে গেল।

আমি হ-বাবুর মুখে শুনলাম,—স্থানীয় অন্যতম প্রধান ধনী

পরিবারের গুরু হয়েছেন ঐ সাধুটি। পরিবারটি যেমন ধনী, তেমনি আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত, তেমনি অসতুপায়ে অর্থোপার্জনে সুদক্ষ। টাকার জন্য সবকিছুই তাঁরা করে থাকেন।

পরিবারটি দেড় পুরুষ হল ধনী হয়েছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষের কুলগুরু বংশটি দরিদ্র। নব্যধনী উচ্চশিক্ষিত পরিবারের ভক্ত ও ভক্তিমতীদের ভক্তি আকর্ষণ করার মত ধনদৌলত, নামধাম, উৎসবের জৌলুষ, কুলগুরুবংশে কারো নেই। এই সুযোগে এই মহারাজ সন্ন্যাসী গুরুবাবা এসে, তাঁদের উপযুক্ত সদ্‌গুরুর অভাব পূরণ করেছেন। সন্ন্যাসী গুরুমহারাজের শিষ্যালয়ে ভেট ও প্রণামী প্রাপ্তিটা বেশ রাজোচিত হয়।

বাংলা দেশে পল্লী অঞ্চলে এই সমস্ত গেরুয়াপরা সিদ্ধ মহাপুরুষদের বড় একটা দেখা যায় না। পল্লী অঞ্চলে দেখা যায়, ব্রজপ্রেম রসে সিদ্ধ গোসাঁই ও বৈষ্ণব-বাবাজী। দু' চারটে শিব-কালী-পাওয়া লাল কাপড় পরা সাধুও দেখা যায়।

একবার ঢাকা হতে মাইল দশেক পশ্চিম-উত্তরে ভাকুর্তা গ্রামে গিয়েছি। একদিন এক বাড়ীতে সন্ধ্যারাতে কীর্তন শ্রবণের নিমন্ত্রণ পেলাম। শুনলাম, কীর্তনে একজন ব্রজভাবসিদ্ধ গোসাঁই উপস্থিত থাকবেন।

যথাসময় উপস্থিত হয়ে দেখলাম, বহুজন সমাবেশ হয়েছে। প্রধান শ্রোতার আসনে বসে আছেন সেই ভাবসিদ্ধ গোসাঁই। গলা তাঁর একগাদা ফুলের মালা, আর তিন পাশে তিনটি বৈষ্ণবী। পেছনেরটির বয়স বছর বাইশ হবে, ডাইনেরটি জ্যেষ্ঠা, বয়স চল্লিশের ওপরে। শুনলাম বাড়ীতে মা-গোসাঁই আছেন, তিনি ভক্তদের কৃপা করতে বিদেশে যান না। এই তিনটি ডেপুটি মা-গোসাঁইই সব সময় প্রভুর সেবা করেন।

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই বলুন না কেন, আমার আসনটা হল প্রভুর দক্ষিণা নায়িকার ডাইনে। কীর্তন আরম্ভ হল।

জোর কীর্তন চলল। গানটা আর এখন মনে নেই, ধুয়াটা মনে আছে।—

'হরিনামে কত মধু আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভাবের বন্যা এসে গেল। প্রথম দেখা দিল প্রভুর শিরঃকম্প, তারপর উদর ঝম্প, তারপর উল্লম্ফ। তার সাথে হা-হাঃ, হু-হুঃ, হি-হিঃ—প্রেম বিকার।

এই জাতীয় প্রেমটা বোধ হয় ছোঁয়াচে। প্রভুর প্রেম বিকার কীর্তনে ও শ্রোতাদের মধ্যেও ঢুকে পড়ল। তাঁরা আরম্ভ করলেন জোড়ায় জোড়ায় প্রেমালিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে গড়াগড়ি নামক একপ্রকার মল্লযুদ্ধ।

দেখলাম দু'একজন প্রেমযোদ্ধা সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকেও তাকাচ্ছেন। দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। জাপানী জুজুৎসুর প্যাঁচ গোটাকতক জানি, কুস্তির আখড়াযও কিছুদিন ঘোরাফেরা করেছি। সে শিক্ষা বলে গোয়ালন্দঘাটে ব্লাকমুর সাহেবকে কাদায় ফেলে মাডমুর করা এককথা, আর এই প্রেমযুদ্ধে দু'জনে মাটিতে পড়ে অক্ষতদেহে 'লাউ গড়্ গড়্' করা পৃথক কথা। এ লাউগড়্গড়ের টিপ্টাপ কিছুই যে, আমি জানি নে।

আমাকে চঞ্চল হতে দেখে পাশের মাতাজী বললেন,—

কি বাবা, এসব দেখে ভয় করছে ?

হাঁ মা, একটু তো করছেই। যদি এসে ধরে ?

আচ্ছা বাবা, তুমি একটু পিছনে সরে বস, আমি সম্মুখে বসি।

তাই বসলাম। আস্তাকুঁড়ের থান ইটের আড়ালে ছুঁচো যেমন নিরাপদ আশ্রয় পায়, আমিও তেমনি নিরাপদ আশ্রয় পেলাম।

প্রায় দেড়ঘণ্টা কীর্তন চলার পর প্রথম কিস্তি কীর্তন সমাপ্তির সঙ্কেত হরিধ্বনি পড়ল। আমারও 'ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল'।

ভাগ্যটা আমার একদিক হতে বড়ই মন্দ। প্রায়ই কোথাও যেয়ে একেবারে নিরামিষ ভালমানুষ হয়ে ফিরতে পারি নে। যতক্ষণ কীর্তন চলছিল ততক্ষণ ভাবছিলাম, থামলেই পালাব। কিন্তু তা আর হল না। কীর্তন থামার সাথে সাথেই পাষণ্ড নাম কেনার সুযোগ মিলে গেল।

কীর্তন থামতেই চোখে পড়ল একটা লোক এক কোল্কে তামাক সেজে নিয়ে আসরে আসতেই বিশ-পঁচিশজন ভক্তের হাত একসাথে কোল্কেটার উপরে থাবা মারল। কোল্কেটা পড়ে যেয়ে আগুন ছিটল।

ব্যাপারটা দেখে হাতজোড় করে আসরে বললাম,—

আপনাদের কাছে আমার একটা নিবেদন—আমরা যদি একখানা বাতসা মুখে দিই, তবে তার মিষ্টি-স্বাদ দশ-পাঁচ মিনিট মুখে লেগে থাকে। আজ এখানে আপনারা এই একটু আগেই হরিনামের মধু আস্বাদন করে দেখলাম মাতোযারা হয়ে পড়েছিলেন। কি আশ্চর্য! কীর্তন থামার সাথে সাথে একটা কোল্কের ওপরে আপনাদের বিশ-পঁচিশখানা হাত থাবা মারল! আপনাদের এই হরিনামের মধুটা কেমন মাল, তা আমাকে কেউ বুঝিয়ে দেবেন?

বুঝিয়ে আর কেউ দিলেন না। এগিয়ে এলেন একতারা হাতে এক বৃদ্ধ ফকির। ফকির একতারা বাজিয়ে গান ধরলেন,—

'বৃন্দাবনে কিসের গোলমাল হয়?
অচরিত বাউলে কয়,—
বৃন্দাবনে কিসের গোলমাল হয়?
চোদ্দ হাত জলের তলে, আমন ধানের নাড়া পোড়ে,
ফেঁচোয় ঠোকরাইয়া খাইল খৈ।
সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল, বাঘে মোষে জুইড়াছে হাল,
পিঁপড়ায় চইড়া দিচ্ছে মই॥
ভাউয়া ব্যাঙের তড়াসে, নাও থুইলাম কচুবনে রে,
ওরে ফড়ঙ্গে পাঁড়াইয়া ভাঙ্গছে গোলোই॥
ও পাগল মন রে,······॥"

প্রায় আধঘণ্টা নেচে কুঁদে গেয়ে ফকির থামলেন। আমি ফকিরকে অনুরোধ করে বললাম,—ফকির সাহেব আপনার গানের তাৎপর্যটা একটু বুঝিয়ে দিন?

বাবা, তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে, এ গান তারই উত্তর। এর অর্থ যদি

ভাল কবে বুঝতে চাও, তবে ঐ গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা কব। গোসাঁই তো বহু শাস্ত্র জানে বলে শুনি।

কীর্তন থামাব পব হতে এ পর্যন্ত আব গোসাঁই-এব দিকে তাকাই নি। ফকিবেব কথায ফিবে দেখলাম, গোসাই প্রভু চোখ বুঁজে স্থিব হযে বসে আছেন, প্রসাবিত বাঁহাতে মযলা ন্যাকডা জডানো ছোট কোল্কে, ডান হাতে ববদান ভঙ্গী।

বুঝলাম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব লক্ষণ প্রভুব আছে। ভাগবত বলেন 'বৈষ্ণব নাং যথা শম্ভুঃ—বৈষ্ণবগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিব ঠাকুব।' শিবঠাকুব নাকি সবাপেক্ষা বড গেঁজেল। মহাজন পন্থা অনুসবণ কবে প্রভুটিও নিশ্চযই সিদ্ধ হযে গলে গিযেছেন। তথাপি ফকিবেব গানেব তাৎপর্যটা বুঝিযে দিতে অনুবোধ কবলাম।

প্রভু চোখ না খুলেই হাতেব কোল্কেটায আব একটা মোক্ষম কৈলাসী টান শেষ কবে, বাঁযেব সেবাদাসীব হাতে সেটা দিযে বললেন,—নে, আব এক ছিলুম সাজ। বাইদাসীটা কোনো কাজেব নয। যে এতদিনেও গুরুসেবাব জিনিস তৈবী কবতে শিখল না, সে নিত্য বৃন্দাবনে যেযে মোহনবিলাসী যুগলেব সেবা কি কবে কববে? নবোত্তম ঠাকুব বলেন, 'সাধনে সাবিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা, পক্কাপক্ক এই সে বিচাব।' সাধন কালে যে কাযমন-বাক্যে গুরুসেবা কবতে পাবে না, তাব কখনো ব্রজপ্রাপ্তি হতে পাবে না।

বাইদাসী আমাব সম্মুখেবটি। তিনি ঝঙ্কাব দিযে উঠলেন,—তোমাব ব্রজে যাওযাব জন্য আমাব মাথা ব্যথা নেই। তুমি মবে ব্রজে যেযে সুখ খেও। এখন এই বাবাঠাকুব যা জানতে চাইলেন, তাই বল।

ওঃ, ঐ যাদু ফকিবেব গানেব অর্থ? ও সব বহিবঙ্গ ব্যাপার, কৃষ্ণপ্রেমের বিরোধী। শোনো নি? চৈতন্য চরিতামৃত বলেছেন—পাণ্ডিত্যাদ্যে কভু নাহি কৃষ্ণ ভক্তি হয। মহাভাবত বলেছেন—বিশ্বাসে মিলায বস্তু তর্কে বহুদূর। সব শাস্ত্রই বলেন—গুরুবাক্য বলবান্। এই সব মহাবাক্য ত্যাগ

করে, তোরা যাদু পাগলার গান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস। পোড়া কপাল তোদের। জয় নিতাই, জয় নিতাই। ঘোর কলি, কেউ বললেও শোনে না। ও নিতাই দাসী, তৈরী হল ?

বাঁযেরটা নিতাইদাসী ছোট কোল্কে এগিয়ে দিলেন। প্রভু আর একটা টান চড়ালেন।

দেখে শুনে মেজাজ গরম হযে উঠল। ফকিরকে বললাম,—

ফকির সাহেব, যদি অনুমতি করেন তবে আপনার গানের প্রথম লাইনটা আমি ব্যাখ্যা করি ?

হাঁ বাবা, কর। মুর্শিদ তোমাকে দযা করুন।

আসরে বহু লোক। উঠে দাঁড়িয়ে গলার স্বর চড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলাম,—

এই গোসাঁই এইমাত্র বললেন, 'এটা ঘোর কলিকাল। কেউ বললেও লোকে শোনে না।' কথাটা ঠিক। আপনারাও আমার কথা শুনে গ্রহণ করবেন কিনা জানি নে। তথাপি যা বুঝেছি, তা বলব।—

এই গানের প্রথমে আছে 'বৃন্দাবনে কিসের গোলমাল হয়'। বর্ত্তমানে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ধর্ম, ব্রজপ্রেম ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে বাঙ্গালী সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা চলছে, তা দেখে বাউল কবি বলছেন বৃন্দাবনের পরম সুন্দর আনন্দরসব্রহ্ম শ্রীরাধাগোবিন্দ নিয়ে তোমরা এ কি বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়েছ ?

ভক্তিশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানহীন পাঠক গোসাঁইরা ব্যাখ্যা করছেন ভক্তিতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব। যে 'প্রেমভক্তি মোক্ষ হইতেও সুদুর্লভ', সেই ভক্তির ভক্ত সেজে কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থগুলো করছে প্রেমের অভিনয়। শাস্ত্রীয় সাধনভজনের সাথে অপরিচিত ব্যক্তিরা কেবল চোখের জল দেখিয়ে প্রেমিক ভক্ত বলে সমাজে সমাদর পাচ্ছেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিরোধী আচার 'রাগভক্তি সাধন' বলে চলছে। এই সব ব্যাপার প্রকৃত তত্ত্বতাৎপর্যের নিকৃষ্ট বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়।

এইটুকু বলে ফকির সাহেবকে অনুরোধ করলাম,—এইবার আপনি ব্যাখ্যা করুন। আপনাদের বাউলে হেয়ালী বাউল ছাড়া অপর কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

আমার অনুরোধে ফকির দিগ্‌দর্শন হিসাবে বললেন,—

আমন ধানের গোড়া বহু জলের তলে থাকে। মানুষের দেহে ছয়টা চক্র ও আটটা পদ্ম আছে। এই চোদ্দটা স্থানের নীচে মলাধারে আমাদের সমস্ত কর্মচিন্তার মূল মনের স্থিতি।

জল শুখিয়ে গেলে চাষী ধান কেটে নেয়। ক্ষেতে পড়ে থাকে ধানের নাড়া। চাষী ক্ষেত আবাদ করার জন্য নাড়ায় দেয় আগুন। ভগবান আমাদের এই দুর্লভ মানবদেহে প্রেমভক্তির আবাদ করার জন্য মন নাড়ায় জ্বেলে দেন দুঃখের আগুন।

নাড়ায় আগুন দিলে নাড়ার মধ্যে পড়ে থাকা ঝরাধান ফুটে খৈ হয়। তেমনি আমাদের বিষয়বাসনা রূপ দুখের আগুনের তাপে দেবার্চনা, পিতৃ-শ্রাদ্ধতর্পণ, বারব্রত, ভগবৎনাম শ্রবণ-কীর্তন, প্রভৃতি সৎকর্মে কিছু কিছু প্রবৃত্তিও স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়।

ফেচো একশ্রেণীর পাখি, এরা খায় টাটকা ছাই। মাঠে নাড়া পুড়োলে ফেঁচো ছাই খেতে এসে প্রথমে খুঁজে খুঁজে খৈ গুলো খেয়ে শেষ করে। এ সংসারে একশ্রেণীর ধূর্ত আছে, তারা নির্ঝঞ্ঝাটে বিষয় ভোগের মতলবে সাজে সাধু, সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণব-গোসাঁই। এই সাজ ও কতকগুলি শস্তা বোল চালের জোরে গৃহস্থদের শিষ্য করে, প্রথমেই শিষ্যদের পুরুষানুক্রমিক পূজা-পার্বণ, বার-ব্রত, শ্রাদ্ধ-তর্পণ, স্বাভাবিক ধর্মকর্মগুলি যথাসম্ভব বন্ধ করে দেয়। তারপর গৃহস্থ শিষ্যের কামনা-বাসনা-আগুনে পোড়া বিষয় অর্থাদি গুরুসেবার নামে আত্মসাৎ করে ভোগী গৃহস্থ অপেক্ষাও অধিক বিষয় ভোগ করে।

সোনার লাঙ্গল—মানে সাধন-ভজন, আর রূপার ফাল—ইষ্টমন্ত্র। লাঙ্গল টানে দুটো বলদে, সাধন-ভজনও চলে গুরু ও শিষ্যের মিলিত চেষ্টায়। লাঙ্গল চালাতে যদি বলদের পরিবর্তে বাঘ ও মোষ জোড়া যায়, তবে

কখনো লাঙ্গল চলে না। বাঘ ও মোষ পরস্পর পরস্পরের শত্রু। বাঘ—সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী বা বৈরাগী গুরু, মোষ—গৃহস্থ শিষ্য। সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য পরস্পর বিরোধী। এই দু'জনে একত্রে সাধন ভজন করতে গেলে ধর্মক্ষেত্রে যে বিপর্যয় দেখাদেয়, তা রোধ করার চেষ্টা—জমির ঢেলা ভেঙ্গে সমান করার জন্য পিঁপড়ের সাহায্যে মই দেওয়ার মত হাস্যকর ব্যাপার।

অবোধ শিশু যেমন ভাউয়া ব্যাঙ—অর্থাৎ কোলাব্যাঙ দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পেতে চায়, অজ্ঞান মানবও তেমনি সংসার দুঃখে ভীত হয়ে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। সে আশ্রয় খুঁজতে যেয়ে, যদি কচুবন সদৃশ ব্যবসাদার সাধুবাবাদের কবলে পড়ে, তবে ফড়িং সদৃশ তুচ্ছ সাধুর উপদেশে, নৌকার গলুই সদৃশ বিবেক বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতা লোপ হয়।

এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে ফকির আমাকে বললেন,—বাবা, আমি মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া জানি নে। তুমি আমার কথাগুলো ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে—যদি শাস্ত্র প্রমাণ জানা থাকে, তবে তার উল্লেখ করে, এদের শোনাও। ফল কিছুই হবে না, তবুও শুনুক।

আপনি 'নাও' শব্দটার অর্থ তো বললেন না?

ওঃ তাই নাকি! এই দেখ বাবা, বুড়ো হয়েছি, এখন আর তাল-মান বোধ নেই। নাও মানে নৌকা। এই দেহই নৌকা। এই মানব দেহ অবলম্বনে সাধন ভজন করে, ভবপারে আনন্দময়ের কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু ব্যবসাদার সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানা কচুবনে গেলে সর্বনাশ হয়। এখন তুমি একটু ব্যাখ্যা করে শোনাও।

ফকির সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করলাম। ফল হল এই—ওদেশে আমি ভক্তি বিরোধী মহাপাষণ্ড বলে পরিচিত হলাম। কোথাও কীর্তন বা মহোৎসব হলে, আর কেউ আমাকে নিমন্ত্রণ করত না।

ফকির মুসলমান, কিন্তু তাঁর কথাগুলি সব হিন্দু শাস্ত্র-সম্মত। শাস্ত্র-যুক্তির সাহায্যে ফকিরের কথাগুলি খণ্ডন করতে পারেন, এমন কোনো তথাকথিত সংসার ত্যাগী গুরু আমি এ পর্যন্ত দেখিনি।

ব্যবসাদার সাধু-সন্ন্যাসী সব দেশেই আছে। কিন্তু 'আশ্রমজননী' 'মানসকন্যা' 'ব্রহ্মচারিণী' 'ভৈরবী' 'বৈষ্ণবী'—এঁদের মধ্যে যে কোনো একটা নিয়ে সংসার ত্যাগী সাধুসন্ন্যাসীর মঠ, আশ্রম বা তপোবন প্রতিষ্ঠা করে বাস করার রীতি, এক মাত্র বাঙ্গালী সাধু, সন্ন্যাসী ও বৈরাগী ছাড়া অবাঙ্গালীদের মধ্যে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

সেদিন সেই গাড়ীর মধ্যে আমার শ্রোতাদের বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে কিছুই শুনাই নি।

থানেশ্বর মঠ।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বিলম্বে ট্রেন কুরুক্ষেত্র স্টেশনে পৌঁছাল। গাড়ী থেকে যখন নামলাম, তখন সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। গার্ডসাহেব এসে স্টেশন মাস্টারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে পরিচয়ে গার্ডসাহেব যে ভাষা ব্যবহার করলেন, তার ফল হ'ল এই যে, স্টেশনমাস্টারের ঘরে আরও একঘণ্টা থাকতে হল। হৃষীকেশ-গদীর ম্যানেজারের পত্র পেয়ে, থানেশ্বর মঠ হতেও একজন সন্ন্যাসী আমাকে নিতে এসেছেন। শেষ পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসীর সাথে, স্টেশনের কর্মচারীদের কৌতূহলী প্রশ্ন জাল কাটিয়ে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হ'য়ে পড়েছে।

কুরুক্ষেত্র স্টেশন থেকে থানেশ্বর মঠ তিন মাইল। কি একটা কারণে সেদিন ছিল হরতাল, দোকানপাট গাড়ীঘোড়া—সব বন্ধ। কাজেই তিন মাইল পথ হেঁটেই যেতে হবে। বহু চেষ্টা করেও যে, গাড়ী

পাওয়া যায়নি, তা সঙ্গী সন্ন্যাসী কয়েকবার বললেন। আমার কিন্তু হেঁটে যেতেই বেশ লাগছিল।

মাইল খানেক যেয়েই থানেশ্বর ছোট সহর। রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা নেই। হরতালের জন্য দোকান পাট সব বন্ধ থাকায় পথ যেমন অন্ধকার, তেমনি জনবিরল। উত্তর পশ্চিম ভারতে ছোট সহর বা বড় পল্লীর একটা বড় অসুবিধা এই যে, গৃহস্থ বাড়ী ও দোকান ইত্যাদির সমস্ত আবর্জনা—মায় ভাঙ্গা কাঁচ পর্যন্ত, সদর রাস্তার ওপরে ফেলা হয়। সে আবর্জনা যে কতদিনে সরবে, তা কেউ বলতে পারে না।

আমরা সাবধানে সহরের পথ অতিক্রম করে একটা মুসলমান পল্লীতে প্রবেশ করলাম। এক পাশে একটা সুউচ্চ বৃহৎ প্রাচীরের গাযে চালা বেঁধে, প্রত্যেক চালায বোধ হয় এক একটা পরিবার বাস করে। সাধারণত দরিদ্র মুসলমানদের বাড়ীতেও বেশ একটু আবরু থাকে। এদের কিন্তু সে রকম কিছু দেখলাম না। এক একটা আবরুহীন চালায় গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়া মুরগী মানুষ জড়াজড়ি করে বাস করছে। দেখে একটু বিস্মিত হলাম।

পল্লী অতিক্রম করে সঙ্গী সন্ন্যাসীকে এই মুসলমানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে শুনলাম, এরা পূর্বে হিন্দু ছিল। থানেশ্বর মন্দির রক্ষার্থে হিন্দু আমলে এক হাজার জাঠরাজপুত যোদ্ধা নিযুক্ত থাকত। মহম্মদ ঘোরী যখন থানেশ্বর মন্দির দখল করেন, তখন বারো বছরের বালক হতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত জাঠ পুরুষ নিহত হয়। জাঠ যুবতী ও কিশোরীগুলি যুদ্ধের বক্‌সিস রূপে সৈন্যদের মধ্যে বিতরিত হয়। অত্যধিক অত্যাচারের ফলে তাদের প্রায় সকলেরই জীবনান্ত ঘটে। অবশিষ্ট বৃদ্ধা ও শিশুদের ইসলাম কবুল করানো হয়। সেই থেকে এদের ওপর নেমে এসেছে নিদারুণ দারিদ্র্যের অভিসম্পাত। এদের সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, এরা যুবতী স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে পারে না। এদেশের ধনীরা ছলে বলে কৌশলে চৌদ্দ-পনরো বছর বয়সেই মেয়েগুলি হস্তগত

করে, বছর দশেক রেখে, তারপর তাড়িয়ে দেয়। তখন এসে বিয়ে করে সংসারী হয়, কেউ বা বেশ্যা হয়ে যায়।

সঙ্গীর মুখে এই হতভাগ্য জাঠদের কাহিনী শুনে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থাও মনে পড়ল। বাংলাদেশেও বহু দরিদ্র অশিক্ষিত হিন্দু এককালে নানা কারণে মুসলমান হয়েছে। কিন্তু তাদের ভাগ্যে এতবড় দুর্দৈব কখনও আসে নি। তার কারণ বোধ হয়, রাজশক্তি মুসলমান বা খৃষ্টান হলেও, দেশের জমিদার সম্প্রদায় ছিলেন মার্জিত রুচি ধর্মভীরু হিন্দু-মুসলমান। সেই জমিদার শ্রেণীর হাতেই ছিল বাংলার পল্লীবাসীর সমাজনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

তবে একটি ব্যাপার ভারতে সর্বত্রই সমান। মুসলমান রাজত্বকালে ইসলাম প্রাচারক মৌলবী-মোল্লারা অশিক্ষিত দরিদ্র হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে, একসাথে মসজিদে নামাজ পড়েই কর্তব্য শেষ করেছেন। তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইত্যাদি বিষয়ে চেষ্টা তাঁরা করেছেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূর্বে হিন্দুসমাজে তারা যেমন অবজ্ঞাত ছিল, মুসলমান হয়েও তার পরিবর্তন হয় নি। ফলে ধর্মকে অবলম্বন করে তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করার উর্বরক্ষেত্র তৃতীয় পক্ষ বিদেশী শাসকরা পেয়েছেন।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে অবশিষ্ট পথ উভয়ে নীরবেই অতিক্রম করলাম। কোন সময়ে যে মঠে প্রবেশ করেছি, তা খেয়ালই নেই; ঐ হতভাগ্য জাঠদের কথা আমাকে এতই অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। চমক্ ভাঙ্গল তখন, যখন সম্মুখবর্তী এক দিব্যকান্তি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে বসতে বললেন।

দেখলাম সম্মুখেই শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের সুসজ্জিত গদী। গদীর পাশে নীচু আসনে বসে আছেন আমার অভ্যর্থনাকারী সন্ন্যাসীমহারাজ। আমি প্রথানুযায়ী গদীর সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, পরে সন্ন্যাসীমহারাজকে অভিবাদন জানালাম। সন্ন্যাসীমহারাজ প্রত্যভিবাদন জানিয়ে, পথশ্রান্ত আমাকে সে দিনের মত বিশ্রাম গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন।

আমার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সেই পূর্বসঙ্গীই আমাকে নিয়ে চললেন। মঠের বাইরে একটা ছোট সবজি ক্ষেত পার হয়ে, সুন্দর ফলের বাগানের মধ্যে কয়েকখানা ছোট পাকা ঘর। তারই একখানায় আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। ঘরখানা প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব দিয়ে সাজানো।

সঙ্গীকে প্রশ্ন করে শুনলাম, আমি যে প্রকৃত সন্ন্যাসী নই, তা জেনেই এই ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কোনো সম্ভ্রান্ত গৃহস্থভক্ত মঠে এলে, এই সমস্ত ঘরে থাকেন। মঠের ভিতরে রাত্রে কেবলমাত্র সন্ন্যাসীরাই থাকেন। যিনি মঠে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, তিনি অধ্যক্ষ মহান্ত নন। অধ্যক্ষ প্রধান মহান্ত মহারাজ প্রাতে আটটা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত এবং অপরাহ্নে তিনটে থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত আচার্যের আসনে বসে শাস্ত্রালোচনা ও উপদেশ প্রার্থীদের উপদেশ দেন। অন্য সময় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট মহলে একাকী থাকেন। তাঁর বিনানুমতিতে সে মহলে কারও প্রবেশাধিকার নেই। সকালে বিকালে যে তিন ঘণ্টা তিনি সর্বসমক্ষে থাকেন, তখন কেবল পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা ছাড়া অন্য কথা বলেন না।

মঠে আরও চারজন বড় মহারাজ আছেন। তাঁরা অধ্যক্ষ মহারাজের গুরুভ্রাতা। এই চারজনই প্রকৃতপক্ষে মঠের পরিচালক। উপদেশ-প্রার্থীর উপদেশ ও সন্ন্যাস প্রার্থীর সন্ন্যাস প্রদান, এই দুইটিমাত্র করেন অধ্যক্ষ মহারাজ। আর সমস্ত কাজ অপর চারজন মহারাজের নির্দেশ-মত মঠবাসী চেলা সন্ন্যাসীরাই করে থাকেন।

মঠে চেলা সন্ন্যাসী আছেন আঠার জন। আমার সঙ্গী ঐ আঠার জনের মধ্যে একজন। এই আঠারজন চেলা সন্ন্যাসীদের মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে। একশ্রেণী—বড় মহান্ত মহারাজদের মত মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া বহির্বাস ও ত্রিদণ্ডধারী। অপর শ্রেণীর মাথায় জট, মুখে দাড়ি, পরিধানে ডোর-কৌপীন, কটিদেশে মোটা দড়ি বাঁধা। এপ্রকার দু'টি শ্রেণীর কারণ শুনলাম, যাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন, তাঁরাই মুণ্ডিত মস্তক ত্রিদণ্ডধারী। আর যাঁদের উপনয়ন

সংস্কার নেই, তাঁরাই জটাডোর ধারী সন্ন্যাসী। আমার সঙ্গী মুণ্ডিতমস্তক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী।

রাত্রি ন'টায় আহার এসে গেল। চারখানা ঘি মাখা মোটা রুটি, আচার, আধসের দুধ, আর অল্প কিছু শাক। এদেশে তরকারিকে বলে শাক, আর শাককে বলে সব্জি। শুনলাম, ভাতের চলন নেই। জ্বর বা পেটের অসুখ হলে ভাত পথ্য দেওয়া হয়।

পশ্চিম অঞ্চলে সাধারণ গৃহস্থেরা মিছে আটার রুটি খায়। মিছে আটা মানে—যব গম ভুট্টা ছোলা জোয়ার বাজরা, সমান পরিমাণে মিশিয়ে পেষাই করা। দরিদ্রেরা কেবলমাত্র জোয়ার ও বাজরা পেষাই করা আটার রুটি খায়। খাঁটি গমের আটা ধনীর খাদ্য, দরিদ্রের ভোজ। মঠে খাঁটি গমের আটাই চলে। সে গম সন্ন্যাসীরা নিজহাতে মঠেই পেষাই করেন।

পরদিন প্রাতে আটটার পূর্বেই স্নানাদি সমাধা করে, মঠে গেলাম। একটা প্রশস্ত হলঘর, অনেকটা আমাদের বাংলাদেশের ঘেরা নাটমন্দিরের মত। তার একপাশে মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের সুসজ্জিত গদী। তার পাশে একটু নীচু আসন মঠাধ্যক্ষ আচার্যের। আচার্য তখনও আসেন নি। আচার্যের আসনের বাঁয়ে একখানা পুরু মূল্যবান গালিচার ওপরে বসে আছেন চার জন সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, হাতে তাঁদের সন্ন্যাস দণ্ড। গদীর সম্মুখে অপর আঠার জন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। তাঁদের মধ্যে তিন জন মুণ্ডিত মস্তক ত্রিদণ্ডধারী। জটাধারীদের দণ্ড নেই।

সন্ন্যাসীদের পিছনে সাধারণ দর্শনার্থী ও শ্রোতাদের আসন। এই সমস্ত আসনের বেশ কিছু তফাতে ঘরের একপ্রান্তে আছে মহিলা দর্শনার্থিনীদের আসন। এই প্রকার বসার প্রথা, বাংলার বাইরে প্রায় সমস্ত মঠ আশ্রমেই দেখেছি। বাংলা দেশে, বিশেষ ক'রে কলকাতা সহরে দেখি—মহাপুরুষ সাধুসন্ন্যাসী গোস্বামী প্রভুদের আসনের পাশেই আদর করে বসানো হয় মহিলাদের। আর বৃদ্ধা মহিলা ও পুরুষেরা থাকেন পিছনে। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি—বাংলার বাইরে

বাঙ্গালী-প্রভাব বর্জিত সর্বত্রই কোনো সাধু মহাপুরুষ তাঁদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার অধিকার মহিলাদের দেন না। অঙ্গ সংবাহন, তৈলমর্দন, ইত্যাদি একেবারে কল্পনাতীত। শাস্ত্রে নাকি এগুলো অত্যন্ত নিষিদ্ধ। শাস্ত্র কি তবে বাংলা ও বাঙ্গালী সাধু-সন্ন্যাসী-গোস্বামী প্রভুদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা দিয়েছেন ?

যখন সভাগৃহে প্রবেশ করলাম, তখন বহিরাগতের আসনে চারজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ছিলেন। আমি বহিরাগতের আসনেই বসলাম। মঠের সন্ন্যাসীদের হাতে দণ্ড দেখে, আমার সেই চারপয়সার বাঁশের কঞ্চিখানার কথা মনে পড়ল। সেখানা পুরীর ধর্মশালায় ফেলে এসেছি। নবদ্বীপ থেকে পুরী পৌঁছা পর্যন্ত দণ্ডটা সাথেই ছিল, তারপর বোধহয় একদিনও হাতে করি নি। তাতে কিন্তু আমার সন্ন্যাসী সাজায় কোনো বাধা আসে নি। নবদ্বীপ হতে যা কিছু নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তার মধ্যে আছে কেবল আমার স্ত্রীর দেওয়া সেই তেরটা আধুলা, আর কয়েকটা তামার পয়সা।

ঘড়িতে আটটা বাজার সাথে সাথেই আচার্যের আসনের পিছনের পর্দা সরে গেল। এসে দাঁড়ালেন এক দিব্য কান্তি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। ঘরখানা যেন দিব্য পবিত্র জ্যোতিতে ভরে গেল। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে সমস্ত সন্ন্যাসী ও দর্শনার্থী উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আরম্ভ হল সমবেত কণ্ঠে বেদমন্ত্র আবৃত্তি। কি সে উদাত্ত কণ্ঠ! কি সে অপূর্ব গম্ভীর সুরঝঙ্কার !! সারা ঘরখানা গভীর আনন্দে পূর্ণ করে সে সুর চলেছে অনন্তের উদ্দেশে। মাথা আপনা হতেই নত হয়ে পড়ল শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্যের চরণ তলে, যাঁর অপূর্ব সৃষ্টি এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও এই প্রকার মঠ।

মঠ ও আশ্রমের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনি, আমিও করি। তথাপি ভাবি—জলে মানুষ ডুবে মরে, জলের দোষে কত ব্যাধি হয়, কিন্তু তাই বলে মানুষ কুয়ো ইঁদারা পুকুর কাটা বন্ধ করে, জল ব্যবহার ছাড়তে পারে কি ?

বেদমন্ত্র ও শ্রীশঙ্করাচার্যের মহিমা স্তব আবৃত্তি শেষ হলে, সকলেই গদীর সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম। প্রধান অধ্যক্ষ মহান্ত মহারাজ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আচার্যের আসন গ্রহণ করলে, আবার আমরা তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে যার যার আসনে বসলাম। তারপর আরম্ভ হল উপনিষদ ব্যাখ্যা। পাঠ শেষে প্রশ্নোত্তর ছলে আলোচনা চলল। অনেকেই প্রশ্ন করলেন, তবে বেশীর ভাগ প্রশ্ন করলেন ঐ চারজন বৃদ্ধ মহাত্মা। উত্তর দাতা একমাত্র প্রধান মহান্ত মহারাজ। সমস্ত প্রশ্নই বেদাদি শাস্ত্র সংক্রান্ত। ঠিক সাড়ে ন'টায় সভা ভঙ্গ হল। অপরাহ্ণেও ঠিক একই প্রকার দেখলাম। অপরাহ্ণে দেখলাম বহিরাগত শ্রোতার সংখ্যা বেশী হয়।

প্রথম দিন আর কোথাও বেড়াতে গেলাম না। পরদিন অপরাহ্ণে সভা ভঙ্গ হলে, আমার সেই সাথীটিকে সাথে করে থানেশ্বর শিবদর্শনে চললাম।

থানেশ্বর শিব।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে আমি প্রথম থানেশ্বর যাই। তখন থানেশ্বরের প্রাচীন মন্দির মুসলমান অধিকৃত ছিল। সে মন্দিরে সাধারণত কোনো হিন্দু প্রবেশাধিকার পেত না। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের পরাজয় সংবাদ যখন থানেশ্বর মন্দিরে পৌঁছাল, তখন সোমনাথের কথা স্মরণ করে, মন্দিরের পূজারীদের মধ্যে নির্বাচিত পাঁচজন ব্রাহ্মণ, মন্দিরের থানেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বিখ্যাত ত্রিযুগী প্রদীপ, নিকটবর্তী

গভীর অরণ্যে এনে রক্ষা করেন। বিজয়ী মুসলমানেরা মন্দির দখল করে সমস্ত পূজারী ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক পণ্ডিত ও ছাত্রদের হত্যা করে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের স্ত্রী কন্যারা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে ভারতে প্রথম জহরব্রত পালন করেন। তাঁদের পরিবারবর্গের অপর সকলে নিখোঁজ হন। এই প্রকারে কিছুকালের জন্য এদেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি নিঃশেষ হয়ে যায়।

কয়েক বৎসর পরে, দেশে কথঞ্চিৎ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে, থানেশ্বর শিবের সেবাইত ব্রাহ্মণ পাঁচজন, তাঁদের অভাবে সেবার কি উপায় হবে ভেবে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। দেশে আর বিবাহযোগ্যা ব্রাহ্মণকন্যা নেই যে, বিবাহ করে সেবাইত বংশ রক্ষা করা যায়। তখন শিবঠাকুর নিজেই সেবাইতদের গোপকন্যা বিবাহ করে সেবাইত বংশ রক্ষা করতে নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী সেবাইত বংশ রক্ষা পায়।

আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীর সাথে মঠ থেকে বেরিয়ে প্রায় এক মাইল যেয়ে, থানেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হলাম। স্থানটির পরিবেশ নির্জন গম্ভীর, নানা জাতীয় বড় বড় গাছের ছায়াশীতল। একটি সাধারণ ঠাকুরবাড়ীর মত ছোট মন্দির ও কয়েকখানা কোঠাঘর আছে।

মন্দিরে প্রবেশ করে শিবদর্শন করলাম। দেখলাম একপাশে সেই বিখ্যাত ত্রিযুগী ঘৃতপ্রদীপ অনির্বাণ জ্বলছে। বৃহৎ প্রদীপ, প্রদীপে প্রায় পাঁচ সের ঘি ধরে। পুণ্যার্থী যাত্রীরাও প্রদীপের ঘি অথবা ঘৃতমূল্য দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে থাকেন।

মন্দির দর্শন ক'রে বাইরে একটা ছোট পুকুরের ধারে এসে দুজনে বসলাম। সঙ্গী সন্ন্যাসীটি মহাভারত থেকে থানেশ্বর শিবের কাহিনী শুনালেন। কাহিনীটি আমার পূর্বেই পড়া ছিল।

সেই মহাভারতের যুগে, এই শিবঠাকুরের প্রধান সেবিকা ছিলেন কৌরব জননী গান্ধারীদেবী ও পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে, উভয় জননীই তাঁদের আরাধ্য দেবতা শিবঠাকুরের নিকটে, নিজ নিজ পুত্রের বিজয় বর প্রার্থনা করলেন।

শিবঠাকুর পড়লেন মহা মুস্কিলে। দু'জনই তাঁর পরমভক্ত, কাকে বঞ্চিত ক'রে কাকে বিজয় বর দেবেন? সরল বুদ্ধি সাদা শিবঠাকুর বিপাকে পড়ে, শেষে পরামর্শের জন্য কূটবুদ্ধি তিন বাঁকা কৃষ্ণঠাকুরের শরণাপন্ন হলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র পরামর্শ দিলেন,—আগামী কাল রাত্রিগতে ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে, যে এক হাজার সোনার পদ্ম দিয়ে থানেশ্বর মন্দিরে শিবপূজা করতে পারবে, তার পুত্রেরাই জয়লাভ করবে।

শিবঠাকুর তাঁর দুই ভক্তিমতীকে সেই কথাই জানিয়ে দিলেন।

মহাদেবের কথা শুনে, গান্ধারী দেবী পরমানন্দে গৃহে এসে তাঁর পুত্রদের ডেকে, এক দিনের মধ্যে এক হাজার সোনার পদ্ম প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন। রাজা দুর্যোধন তখনই সেপাই পাঠিয়ে হাজার কর্মকার ধরে এনে, লাগিয়ে দিলেন হাজার সোনাব পদ্ম তৈরী করতে। কর্মকাবেরা তাদের পৈতৃক মাথাটা কাঁধেব ওপরে টিকিযে রাখার গরজেই আহার নিদ্রা ত্যাগ কবে সোনার পদ্ম তৈরীতে লেগে গেল।

ওদিকে কুন্তীদেবী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর সর্বহারা পুত্রেরা আর কি করে হাজার সোনার পদ্ম যোগাড় করবে? তাও আবার এক দিনের মধ্যে!

কুন্তীদেবীর সেই কাতর ক্রন্দন তাঁর ভাইপো কৃষ্ণচন্দ্রের কানে গেল। তিনি পিসীমাকে সান্ত্বনা দিযে লাখখানেক সোনার পদ্মের উপযুক্ত চন্দন ঘষতে বললেন। অদ্ভুতকর্মা ভাইপোর পরিচয় কুন্তীদেবীর ভালই জানা ছিল। তিনি তখনই ভীমসেনকে বলে আস্ত একটা চন্দন গাছ আনিযে, সমস্ত বেটারবৌ-নাত্‌বৌদেব লাগিয়ে দিলেন চন্দন ঘষতে।

সন্ধ্যার পর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সখা অর্জুনকে সাথে নিয়ে রথে চড়ে, চললেন শিবঠাকুরের খাস খাজাঞ্চি কুবেরের বাড়ী। সাথে নিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ সুদর্শন চক্র, আর কৌমোদকী গদা। অর্জুন নিলেন তাঁর গাণ্ডীব ধনুক ও অক্ষয় তূনীরভরা বাছা বাছা বাণ।

দুই সখা কুবেরের বাড়ী যেয়ে তাঁকে ডেকে এনে, সেই রাত্রি দুপুরের

মধ্যেই শিবঠাকুরের ভাণ্ডার হতে এক লাখ সোনার পদ্ম কুবেরের নিজের লোক দিয়ে থানেশ্বর মন্দিরে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

শুনে কুবের বললেন—তিনি কৈলাসপতি মহাদেবের ধনভাণ্ডারের রক্ষক মাত্র। মহাদেবের বিনানুমতিতে একটি পাই পয়সাও কাউকে দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। এমন কি কৈলাসনাথের কোনো আদেশ পান নি বলে, নিজের জন্যও একটি পয়সা খরচ করতে পারেন না। গৃহস্থদের ফেলে দেওয়া খুদ-কুঁড়ো কুড়িয়ে এনে, তাই খেয়ে, কোনো প্রকারে জীবনধারণ করে, এই ধনভাণ্ডার পাহারায় নিযুক্ত আছেন। যদি তাঁদের নিতান্তই স্বর্ণপদ্মের দরকার হয়, তবে একখানা উপযুক্ত দরখাস্ত লিখে, কয়েকজন জামিনদারের সহি সহ তাঁর হাতে দিলে, তিনি সেটা ম্যানেজার নন্দীশ্বর মহারাজের আফিসে পাঠিয়ে দেবেন। নন্দীশ্বর মহারাজ উপযুক্ত তদন্ত করে, যদি সঙ্গত মনে করেন, তবে অবকাশমত শিবঠাকুরের চরণে দরখাস্ত উপস্থিত করবেন। আশা করা যায়, যখন স্বয়ং দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ণপদ্ম চাইছেন, আর যদি ভাল ভাল জামিনদার থাকে, তখন দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে যাবে। তারপর মঞ্জুরীকৃত দরখাস্ত ম্যানেজার, হেডক্লার্ক, বড়বাবু, ছোটবাবুদের আফিস ঘুরে কুবেরের হাতে এলে, শিবঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী ভৃঙ্গী মহারাজের নিকট হতে ভাণ্ডারের চাবি এনে, তিনি হিসেবমত মাল বের করে দিতে পারবেন। এতে এক বছর সময়ের কমে তো হবেই না, দশ পনরো বছরও লাগতে পারে। তবে যদি এক বছরের মধ্যেই মাল বের করার ইচ্ছে থাকে, তা হলে বাংলাদেশের নওগাঁয় যে বিশুদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাই যদি মনখানেক আনতে পারেন তো ভাল হয়। শিবঠাকুরের রাজ্যে নীচে উপরে সর্বত্রই সিদ্ধির দরবার।

কুবের মহাশয়ের সমস্ত কথা শুনে, কৃষ্ণচন্দ্র বেশ একটু গম্ভীর ভাবে তাঁর গদাখানা উঁচু করে ধরে, অতি বিশুদ্ধ ভাষায় স্পষ্ট করে বললেন—

ওহে কুবের, তোমার স্কন্ধের উপরে মস্তক নামক একটি অঙ্গ আছে। যদিও ঐ মস্তকটি তোমার দেহের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, তথাপি উহার

মধ্যে অবশ্যই কিঞ্চিৎ মস্তিষ্কও আছে। এখন কথঞ্চিৎ বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে দর্শন কর আমার হস্তস্থিত এই তৈলমার্জিত সুবৃহৎ মুদগর। ইহারই নাম জগৎবিখ্যাত কৌমোদকী গদা। আরও দেখ আমার সুবিখ্যাত সুতীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্র। আমার সখা তৃতীয় পাণ্ডব শ্রীল অর্জুন মহাশয়ের হস্তস্থিত গাণ্ডীব নামক বিখ্যাত ধনুক ও অক্ষয় তূনীরও তোমার দর্শনীয়। আরও শ্রবণ কর, আমার সখা অর্জুন মহাশয়ের ঐ তূনীরের মধ্যে তোমার প্রভু কৈলাসনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র পাশুপত অবস্থান করিতেছে। ইহা কোনও অহিংস রাষ্ট্রের সশস্ত্র সৈন্যের অস্ত্র সজ্জার মত নিরর্থক নহে। কার্যকালে ইহার প্রয়োগ মোটেই অহিংস বা বিধিনিষেধের দ্বারা বাধিত হইবে না। আমরা এগুলি কেবল মাত্র শোভা বর্দ্ধনের জন্য আনয়ন করি নাই, আমাদের স্বার্থসিদ্ধির বাধা অপসারণের জন্যই আনিয়াছি। অতএব হে কুবের মহাশয়, আর কাল বিলম্ব না করিয়া সুবোধ বালকের মত আমার আদেশ পালন কর। আমাদের সময় অতি অল্প।

এ বড় ভয়ানক দরখাস্ত ! নাকের ওপরে উদ্যত মুগুর !! তথাপিও কুবের একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য জানালেন, তাঁর নিকটে ভাণ্ডারের চাবি নেই।

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—তালা চাবি দরজা, সব হাতুর পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেল।

বেগতিক দেখে কুবের, তাঁর গোপন ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ভাণ্ডার খুলে, গুনে গুনে সোনার পদ্ম ঝুড়ি ভর্তি করতে লাগলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র কুবেরকে আর একটা ধমক দিয়ে বললেন—সময় অল্প, এখনকার মত ঝুড়ি মেপে হাজার ঝুড়ি পদ্ম পাঠিয়ে দাও। তারপর তুমি বসে বসে তোমার স্টক মিল কর।

কুবের বললেন,—আজ্ঞে, হিসেবে যদি গোলমাল হয় ?

তার জন্য চিন্তা কি। যদি দু'পাঁচশ' কম পড়ে, উপরে রিপোর্ট পাঠাবে,—ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে। তোমাদের গণেশের তো ইঁদুর বাহন আছেই।

আজ্ঞে, সোনার পদ্ম কি করে ইঁদুরে খাবে ?

তুমি দেখছি আচ্ছা বেকুব ! আরে একি আমাদের দেশের ইঁদুর যে, সরকারী গুদামের চাল চিনি গম খাবে ? এ হচ্ছে হিমালয়ান্ গনেশী ইঁদুর, এরা সোনার পদ্মই খায়।

কিন্তু এই সুদৃঢ় ভাণ্ডারে ইঁদুর ঢুকবে কি করে ?

ওহে কুবের, তুমি এতকাল ধরে এতবড় একটা ভাণ্ডারের খাজাঞ্চির কাজ করছ, অথচ কিছুই শিখতে পার নি !! সুবিধেমত দেওয়ালে একটা ফুটো করে রেখে দেবে। যদি কেউ সত্যিই সরেজমিনে তদন্ত করতে আসেন, ঐটে দেখিয়ে দিও; আর তার সাথে কিছু সিদ্ধি দিও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর কুবের আর কোনও আপত্তি না তুলে, ঝুড়ি মেপে হাজার ঝুড়ি পদ্ম নিজের লোক দিয়েই থানেশ্বর মন্দিরে পাঠিয়ে দিলেন। চালান শেষ হলে বিদায় বেলায় ভয়ার্ত কুবের শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রণাম করে মলিন মুখে সম্মুখে দাঁড়ালেন।

পরম কৃপালু কৃষ্ণচন্দ্র কুবেরকে আশীর্বাদ করে বর দিয়ে বললেন— ওহে কুবের, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি বড়ই অল্প, নচেৎ এতকাল ধরে এতবড় একটা ধনভাণ্ডার হাতে পেয়েও এপর্যন্ত ভুঁড়ি মোটা হল না ! আমি তোমাকে বর দিচ্ছি, এই সম্মুখবর্তী কলি কালে যখন স্বর্গে দেবরাজের সাম্রাজ্যবাদ দূর হয়ে এক অভিনব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই গণতন্ত্রের প্রথম যুগে, তাদের মহাধিকরণ নামক সর্বোচ্চ কার্য্যালয়ে, তুমি শিক্ষানবিশীর সুযোগ পাবে। সেই সুযোগের যদি সদ্ব্যবহার করতে পার, তবে কি করে হিসেব রাখতে হয়, কেমন করে উপরওয়ালার জন্য নিখুঁৎ রিপোর্ট লিখতে হয়, ইত্যাদি অনেক কিছু শিখতে পারবে। তারপর সেখান থেকে পাকা হয়ে এসে যখন এই শিবের ভাণ্ডার হাতে পাবে, তখন কয়েক বছরের মধ্যেই এমন কিছু গুছিয়ে নিতে পারবে, যাতে কোনো সন্দেহবশে যদি তোমার চাকরি যায়, তাতেও দুধের বাটিতে কেউ হাত দিতে পারবেনা। তোমার পরবর্তী চৌদ্দপুরুষ বসে বাবুগিরি করে কাটাতে পারবে।

বর পেয়ে কুবের পরম সন্তুষ্ট চিত্তে আর একবার কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম করে, অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ফিরে এসে পিসীমাকে সুসংবাদ দিলেন। পিসীমা কুন্তীদেবী তাঁর বধূদের নিয়ে পরমানন্দে চললেন মন্দিরে। সাথে চলল বালতি বালতি ঘষাচন্দন। অরুণোদয়ের পূর্বেই কুন্তীদেবী হাজার ঝুড়ি চন্দনমাখা সোনার পদ্ম থানেশ্বর মহাদেবের মাথায় ঢেলে দিয়ে, পেয়ে গেলেন নিজ পুত্রদের বিজয় বর।

তারপর যখন মহাদেবের আদেশে যক্ষেরা সোনারপদ্ম কুড়িয়ে ঝুড়ি ভরতি করে, পুনরায় কুবেরের নিকটে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করছে, আর কুন্তীদেবী বধূদের সাথে গৃহে ফিরছেন, তখন গান্ধারীদেবী সহস্র স্বর্ণপদ্ম সোনার থালায় সাজিয়ে নিয়ে উপস্থিত হ'লেন থানেশ্বর মন্দিরে।

মন্দিরে এসে গান্ধারী দেবী যা দেখলেন, তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। সহস্র স্বর্ণপদ্মের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গৃহে ফিরে পুত্রদের ডেকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, এ যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী। ও সমস্ত শিবের বর টর কিছু নয়। আসল কথা হচ্ছে—মহাবুদ্ধিমান কূটকৌশলী শ্রীকৃষ্ণ, আর মহাযোদ্ধা অর্জুন যে পক্ষে আছে, সেই পক্ষেরই জয় হবে। বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে উপযুক্ত ডাণ্ডা প্রয়োগ করতে পারলে, শিবঠাকুর পর্যন্ত সেই ডাণ্ডাধারীর অনুকূলেই বর দেন। অতএব বিবাদ মিটিয়ে ফেলাই ভাল।

গান্ধারীদেবীর সে সুপরামর্শ তাঁর পুত্রগণ গ্রহণ না করায়, যে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটেছিল, এবং সে কাণ্ডে কূটবুদ্ধি কৃষ্ণচন্দ্র কি প্রকার কূটকৌশল খাটিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাণ্ডবদের জয়ী করেছিলেন, মহাভারতে তা বিশদভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

কুবের তাঁর ভাণ্ডার সম্বন্ধে উপরে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তাতে যখন কৈলাসের বড়কর্তারা কৃষ্ণার্জুনের বরাবর একখানা কড়া নোটও পাঠান নি, তখন বুঝতে হবে—হয় তাঁরা সমস্ত শুনে বুদ্ধিমান রাজনীতিকের মত নীরব থাকাই ভাল মনে করেছিলেন। নয় তো কুবেরের রিপোর্টে

কৈলাস রাজকুমার শ্রীমান গণেশের প্রিয় ইঁদুরের কীর্তিকলাপই সরেজমিন তদন্তে সুপ্রমাণ হওয়ায় ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

থানেশ্বরের প্রাচীন মন্দির

পরদিন চললাম মুসলমান অধিকৃত প্রাচীন থানেশ্বর মন্দির দেখতে। যে দিন প্রথম থানেশ্বর মন্দিরের ধার দিয়ে মঠে যাই, সেদিন রাত্রের অন্ধকারে এর বিশালত্ব বুঝতে পারি নি। তখন দেখে বুঝলাম, একে মন্দির বলার চাইতে ছোট একটা দুর্গ বললেই ঠিক হয়। বাইরে থেকে দেখে এর মধ্যে যে কোনো মন্দির আছে, তা কিছুই বুঝা যায় না। প্রায় অর্ধবর্গমাইল জুড়ে মন্দিরের অবস্থিতি। প্রথম একটা সুদৃঢ় পাথরের প্রাচীর, উচ্চতা প্রায় কুরি ফুট। মুসলমান আক্রমণকালে এ প্রাচীরের অনেক জায়গা ভেঙ্গে ফেলা হয়। সে ভাঙ্গা আর মেরামত করা হয় নি। বোধ হয় চারদিকে চারটি সিংহদরজা ছিল। এখন আর তার সবকটা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ভাঙ্গাপ্রাচীরের সাথে সিংহদরজা এক হয়ে গিয়েছে। এই প্রাচীরের মধ্যে আর একটা প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু লাল পাথরের প্রাচীর সমচতুষ্কোণে অবস্থিত। এই চতুষ্কোণ প্রাচীর মাটি দিয়ে ভরাট করে, তার ওপরে থানেশ্বরের মন্দির, পূজারীদের বাস গৃহ, অধ্যাপক ও ছাত্রদের আবাস, ইত্যাদি ছিল। পূজারী, অধ্যাপক ও ব্রহ্মচারী ছাত্র মিলে এক হাজার ব্রাহ্মণ থানেশ্বর মন্দিরে থাকতেন।

আমি সেই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম থানেশ্বর মন্দির দেখেছিলাম। তখন সে মন্দিরে কোনও অমুসলমান প্রবেশ করতে পারত না। ১৯৪৯-এ

আবার যাই, তখন আর কোনো বাধা ছিল না। পূর্বদিকের অন্ধকার সুরঙ্গ পথে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে একটা সুবৃহৎ খোলা চত্বর। সেই চত্বরে দেখলাম অনেকগুলি অল্প বয়সী ছেলে খেলা করছে। আমাদের দেখে দুটো ছেলে দৌড়ে এল। তারাই আমাদের সাথে করে নিয়ে, বাঁ দিকে একটা দরজা পার হয়ে, আবও কয়েকটা সিঁড়ি ওপরে উঠে, ছোট খোলা চত্বরের মধ্যে থানেশ্বর শিবের মন্দির দেখাল।

বর্তমান কাশী বিশ্বনাথের মন্দির অপেক্ষা একটু ছোট অষ্টকোণ মন্দির, নিখুঁত হরিদ্রাভ মার্বেল পাথরের তৈরী, ঠিক যেন সদ্য প্রস্তুত একখানা অলঙ্কার। ভাবতের অন্যান্য স্থানে বিজয়ী মুসলমানদের হাতে হিন্দুমন্দির যেমন রূপান্তরিত হয়েছে, অথবা তাব সুকুমার কারুকার্য বিকৃত হয়েছে, এ মন্দিবে তা হয়নি। কেবল মাত্র মন্দিরের মধ্যে যে স্থানে শিব ছিলেন, সেই স্থানে দুটি কবর দেওয়া হয়েছে।

মন্দির দর্শন করে, সেই ছেলে দুটির সাথে আবার সেই বড় চত্বরে এলাম। ছেলে দুটিব ভাষা প্রায় কিছুই বুঝি নে। কোনো প্রকারে বুঝিয়ে, তাদের দু'জন শিক্ষকের সাথে দেখা করলাম। দু'জন শিক্ষকই গ্রাজুয়েট। তাঁরা ইংরেজীতে বললেন, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তারই ফলে থানেশ্বরের মুসলমানরাও পাকিস্তানে চলে গেছে। তারপর থেকে এ মন্দিরে হিন্দু প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এ মন্দির এখন সরকারী অনাথ আশ্রম। বারো শ' অনাথ বালক ও তিরিশ জন শিক্ষক এখানে থাকেন। বালকগুলির পিতামাতা স্বজনবর্গ অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা লাভের দক্ষিণান্ত ক'রতে নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন। এই প্রকার হিন্দু-শিখ নিরুদ্দিষ্টের সংখ্যা সরকারী হিসাবে ছেষট্টি হাজার কয়েক শ'। বেসরকারী হিসাবে অনেক বেশী।

শিক্ষক মহাশয়দের অবস্থাও একই প্রকার। স্ত্রীপুত্র পরিজন সব গিয়েছে। এখন এই অনাথ বালকেরাই তাঁদের সব। নিজ জন্মভূমি ও গৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পথে, স্ত্রী কন্যা স্বজন হারা হওয়ার যে

কাহিনী দু'জনে শুনালেন, তা এই বিংশ-শতাব্দী কেন, চেঙ্গীজ তৈমুরের যুগেও কল্পনা করা কঠিন। আশ্চর্যের বিষয় ঐ সময়ে পাঞ্জাবের গভর্ণর ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ। বহু ইংরেজ সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৃটিশ সৈন্য সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানেই মোতায়েন ছিল। তারপর ছিলেন ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশের সংবাদপত্রের বহু প্রতিনিধি। তাঁদের চোখের ওপরে এই বিভৎস কাণ্ড ঘটেছে।

হত্যাকাণ্ডকেই বিভৎস বলছি নে, সেই হত্যার রকমারী পদ্ধতি ও আনুসঙ্গিক ঘটনাই সর্বাপেক্ষা বিভৎস। ভারতের অমুসলমান আর মুসলমান সম্প্রদায় গুলো বোধ হয় কয়েক দিনের জন্য মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু ইংরাজেরা কি করেছিলেন ? তখনও তো তাঁদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমত ছিল ?

আবার সেই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ফিরে যাওয়া যাক। প্রাচীন থানেশ্বর মন্দির দুর্গের নিকটে যখন পৌঁছলাম, তখন সূর্যদেব অস্তাচলে চলেছেন। মন্দিরের পূর্বদিকে দুই প্রাচীরের মধ্যপথ দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছি। মাঝামাঝি এসে দেখতে পেলাম, মূল মন্দির-প্রাচীরের গায়ে ছোট প্রবেশ দরজা। বাইরে থেকেই উপরে ওঠার চারপাঁচটা সিঁড়ি দেখা গেল। সুদৃঢ় মোটা লোহার শিকের দরজার বাইরে বসে একজন মোল্লা তসবি জপ করছেন। সঙ্গী সন্ন্যাসীর মুখে শুনলাম, এই মোল্লা সাহেবরাই দরজায় পাহারার কাজ করেন।

মন্দিরের দক্ষিণে এসে সঙ্গী একটি স্থান দেখিয়ে বললেন ,—

মহারাজ, সেই ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের সংবাদ যখন থানেশ্বর মন্দিরে পৌঁছাল, তখন এইস্থানে জ্বালা হয়েছিল ভারতের প্রথম জহর যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড। আর ঐ দেখুন ঐ প্রাচীরের ওপরে, ঐ জায়গা থেকে কয়েক হাজার ব্রাহ্মণ মহিলা সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। মহারাজ, বিধর্মী বিজেতার আক্রমণ হতে নারীর ধর্ম ও মর্যাদা রক্ষার উপায় জহরব্রত উদ্‌যাপন, এই থানেশ্বরে এই স্থানেই প্রথম হয়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আত্মকলহরত হিন্দুভারতেব চরম দুর্দিনের প্রারম্ভ এই থানেশ্বরে। আর্যহিন্দুসভ্যতার লীলাভূমি ভারতের বুকে যুদ্ধাবসানে সহস্র সহস্র নিরীহ নরহত্যা, সহস্র সহস্র নারীর চরম লাঞ্ছনার প্রথম ক্ষেত্র এই থানেশ্বব। স্থানীয় ব্রাহ্মণ মহিলারা জহর-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে লাঞ্ছনার হাত এড়িযে গেলেন, কিন্তু অপর যারা সে ব্রতে যোগ দেয় নি, তাদের কাহিনী বিজেতাদের ভযে স্তব্ধীভূত ঐতিহাসিকেব লেখনী লিখতে পাবে নি। জনশ্রুতি, গ্রাম্য কবির কবিতা ও গানই কেবল সে সমস্ত মর্মান্তিক কাহিনী আজও জন সমাজে কিছু কিছু জানায। এ অঞ্চলে পুরুষ অপেক্ষা নাবীর সংখ্যাল্পতাব মূলেও রযেছে এই সমস্ত কারণ। থানেশ্বরের পতনের পরও ভারতের হিন্দু পুরুষেরা কোনও শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে মনে হয না। কিন্তু হিন্দুনারী-সমাজ বুঝেছিলেন, বিদেশী বিধর্মীব হাতে পরাজয়ের তাৎপর্য কি। তাই থানেশ্বরের পতনের পর, এ জাতীয বিপদের সম্মুখীন হলেই, তাঁরা জহব ব্রত পালন করতে আরম্ভ কবেন।

আরও খানিক এগিযে যেযে পশ্চিমে প্রাচীরের ওপরে একটা জায়গা দেখিয়ে সঙ্গী সন্ন্যাসী বললেন—ঐ যে স্থানটি দেখছেন, ঐখানে এই মন্দিরের এক হাজার ব্রাহ্মণের ছিন্নমুণ্ড, তাঁদেরই গলার পৈতা দিয়ে বেঁধে, দিনের পর দিন ঝুলিয়ে রাখা হযেছিল। ঐ যে ভাঙ্গা প্রাচীরের পশ্চিমে মাঠ দেখছেন, ঐ মাঠে এমনই এক সন্ধ্যায়, মন্দির রক্ষক কয়েক হাজার বালক-বৃদ্ধ-প্রৌঢ়-যুবক বীর জাঠের সাথে অগণিত আক্রমণকারীর অসম যুদ্ধ হয়েছিল। সে যুদ্ধে বারো বছরের বালক হতে অশীতিপর বৃদ্ধ সকলেই যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। একটি বালক বা বৃদ্ধও যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালায় নি। আর আমাদের সম্মুখে প্রাচীরের মধ্যে যে স্থান দেখতে পাচ্ছেন, এই স্থানে এক হাজার পুরোহিত-ব্রহ্মচারী-অধ্যাপক-ছাত্র, তাদের প্রাণের দেবতা থানেশ্বরের মন্দির রক্ষার শেষ চেষ্টা করে প্রাণ দিয়েছে। মহারাজ, এখনও তাদের পবিত্র রক্ত এই মাটিতে মিশে আছে। এখনও বোধহয় তাদের হতাশ

আত্মা, এই প্রাচীরের ধারে কেঁদে ফিরছে। আজও বোধহয় তাদের দীর্ঘশ্বাস কানপাতলে শোনা যায়। সেই ১১৯১ খৃষ্টাব্দ হতে আজ (১৯২৬) পর্যন্ত কোনও হিন্দু ঐ প্রাচীরের অভ্যন্তরে কি হয়েছে, তা দেখতে পায় না।

ফেরারী সন্ন্যাসী।

থানেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরদুর্গ দেখে, বেশ একটু রাত্রি হলেই মঠে ফিরলাম। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীর ভাষা, কথাবার্তা ও চালচলনে তিনি যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের চাইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির ব্যক্তি, তা বুঝতে পেরেছি। সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের পরিচয় জানতে চাওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। তথাপি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। আমার ঘরে এসে তাঁকে বসিয়ে বললাম, দেখুন, আপনার কথাবার্তা শুনে, আপনার পূর্বাশ্রমের কিছু পরিচয় জানার আকাঙ্ক্ষা কোনো প্রকারেই চেপে রাখতে পারছিনে। যদি বিশেষ দোষ কিছু না হয়, তবে আমার এ কৌতূহল দূর করলে সুখী হব।

তিনি আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন,—আমি পূর্বাশ্রমে একজন ফেরারী খুনে ডাকাত।

শুনে চমকে উঠলাম। প্রশ্ন করলাম—আপনিও কি তবে কোনও বিপ্লবী দলভুক্ত?

না, আমি বিপ্লবী দলের কেউ নই। আমি আমার ব্যক্তিগত

ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খুন করেছি, ডাকাতের দলে মিশে ডাকাতি করেছি। আমার কাহিনী আপনাকে বলি শুনুন,—

আমি জাতিতে মারাঠী ব্রাহ্মণ। জন্মস্থান সিন্ধু প্রদেশে কোনো পল্লীতে। আমাদের জমিদারী না থাকলেও পিতাব হাতে বহু নগদ টাকা ছিল। সে টাকা ব্যবসাদাব সিন্ধী মুসলমানদেব মধ্যে খাটিযে ভাল আয হত। আমার আরও তিনটি ছোট ভাই, পবমা সুন্দরী তুটি যমজ বোন ও মা বাপ নিযে, আমাদের পবিবারটি গ্রামেব মধ্যে সুখী গৃহস্থ বলে পবিচিত ছিল।

সেবাব আমি কবাচী কলেজে আই, এস, সি, পাশ কবে বি, এস, সি, পড়ি। বোন তু'টিব বযস সতবো বছব। তু'জনেরই বিবাহ ঠিক হযেছে। বিবাহেব নির্দ্ধাবিত দিনেব তু'সপ্তাহ পূর্বে গহনা ও কাপড় জামা কেনার জন্য আমাব পিতা বোন তুটিকে নিয়ে করাচী আসেন। এই আসাব পথেই হোক, আর কবাচী এসেই হোক, আমার বোন তুটি কযেকজন জমিদাব পুত্রের নজরে পড়ে।

সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কোনো সুন্দরী মেযে বা বউ, জমিদার-জায়গিরদারদের নজবে পড়লে সহজে নিষ্কৃতি পায না। পিতামাতা বা স্বামী মুসলমান হলে, বড় বেশী গোলমাল হয না, আপোষেই সমস্ত মীমাংসা হয। দরিদ্র হিন্দু হলে, হয় মেয়ে বউ নিয়ে দেশান্তরে পালায, নয তো গোপনে বিক্রী করে। বড়লোকেব হাবেমের বাঁদী বাইরে চলতে হলে বোরখা পরে, কাজেই হিন্দু আত্মীয়বর্গের লজ্জাব কারণ ঘটে না। সংঘর্ষ বাধে মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুপরিবারের মেয়ে-বউ নিয়ে। সে সংঘর্ষে প্রাযই মেয়েটির বা বউটির জীবনান্ত ঘটে।

পিতা করাচী হতে বাজার করে নিশ্চিন্তমনে বাড়ীফিরে বিয়ের আয়োজন করছেন। এমন সময় জমিদারের তরফ হতে লোক এসে তাদের দাবি জানাল। পিতা ঘৃণাভরে তাদের তাড়িয়ে দিলেন।

আমার পিতার নিকটে যেমন লোক এসেছিল, তেমনি যেখানে বোন দু'টির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল, সেখানেও তারা জানিয়েছে—জমিদারের মুখের গ্রাসে কেউ যেন হাত না দেয়। ফলে বিবাহ ভেঙ্গে গেল।

জমিদারপক্ষের প্রস্তাবককে তাড়িয়ে দেওয়ার পর চলল ভীতি প্রদর্শন। অনেকে পরামর্শ দিলেন, মেয়ে দু'টিকে নিয়ে দেশান্তরে পালিয়ে যেতে। পিতা অত্যন্ত জেদীলোক ছিলেন, তাদের পরামর্শে কর্ণপাত করলেন না। বোন দু'টিও পিতার মতই জেদী, তারাও পালাবে না।

তারপর একদিন এল চরমপত্র—সাত দিনের মধ্যে মেয়ে ছেড়ে না দিলে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

পত্র হাতে পিতা গেলেন থানায়। দারোগা সাহেব তাঁকে অভয় দিলেন। পিতা তাতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে, গেলেন জেলা সদরে বড় কর্তাদের দরবারে। তাঁরাও অভয় দিয়ে বললেন—প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই করা হবে। গ্রামের নিকটবর্তী বন্দরের মুসলমান ব্যবসাদার, যারা আমার পিতার খাতক, তারাও সাধ্যমত সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল।

সাতদিন কেটে গেল। গ্রামে আমাদের বন্দুক ছাড়াও আরও চারটে বন্দুক ছিল। একদিন সদর হতে নোটিশ এল, সমস্ত বন্দুক সদরে নিয়ে দেখাতে হবে।

দিন মত সমস্ত বন্দুক সদরে গেল। ফেরার শেষ গাড়ী ছিল চারটেয়। আমাদের গ্রামের বন্দুক দেখে ফিরিয়ে দেওয়া হল সন্ধ্যা পাঁচটায়। সে রাত্রে গ্রামের একটা বন্দুকও গ্রামে ফিরল না।

সন্ধ্যার গাড়ীতে বন্দুক ফিরল না দেখে, পিতা ভয় পেয়ে গেলেন। ভীত পিতা থানায় যেয়ে দারোগাসাহেবের শরণাপন্ন হলেন। দারোগা-সাহেব বললেন—ঘাবরাও মৎ। সব ঠিক হ্যায়।

রাত্রে হুড় দস্যুর আক্রমণ হল। বোন দুটি গায়ে কাপড় জড়িয়ে, তাতে কেরসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে, দোতলার ছাদ হতে লাফিয়ে পড়ল। বাবা, মা, ছোট ভাই তিনটি, জবাই হয়ে মরল।

থানা বাড়ী থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে লুঠপাট খুনখারাপি করে ডাকাত চলে গেলে, দারোগা পুলিশ নিয়ে এলেন। গ্রামের লোকও এল। এসে দেখল, মেয়ে দু'টি তখনও পুড়ছে।

আসামীদের কোনো খোঁজ হল না। জমিদারের লোকেরা প্রচার করতে লাগল—মেযে দু'টির ওপরে যথেচ্ছ অত্যাচার করার পর, তাদের অবাধ্যতার জন্য পুড়িযে মারা হয়েছে। অতএব সাবধান, জমিদার-জাযগিরদারদের বিরুদ্ধে কেউ যেন না চলে।

জমিদাব পক্ষের একথা কেউ বিশ্বাস করে নি। গ্রামের বহু লোকে দেখেছে, ডাকাতেব আক্রমণের প্রথম দিকেই মেযে দু'টি দোতলার ছাদে দাঁড়িযে গাযে কাপড় জড়িযে আগুন ধরিযেছে। আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, তখন দু'জন লাফিযে পড়েছে।

আমি এই হত্যাকাণ্ডের প্রথম সংবাদ পেলাম, আমাদের কলেজের প্রিন্‌সিপ্যালের নিকটে। তিনি আমাকে ডাকিযে নিযে সংবাদপত্র থেকে সংবাদটা দেখালেন।

প্রিন্‌সিপ্যাল ছিলেন ইংরেজ। আমার মুখে প্রাথমিক ঘটনা শুনে, বুঝিয়ে বললেন—উত্তর-পশ্চিম ভারতে এ প্রকার ঘটনা হামেশাই ঘটছে। এই জন্যই প্রাচীন পারশ্যের মত সৌখিন ও স্ত্রীস্বাধীনতার দেশে, নারীরা তাঁদের প্রাচীন পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ কবে, ঢিলে পাযজামা, শার্ট ও বোরখা পরতে আরম্ভ করেন। ন'বছর বযস হলেই মেয়েদের বাইরে পথে চলতে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক হয়। উত্তর পশ্চিম ভারতে অমুসলমান নারীরাও তাঁদের প্রাচীন শাড়ী ত্যাগ ক'রে পাযজামা পরতে আরম্ভ করেছেন, যাতে প্রযোজন হ'লে দৌড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারেন। সমগ্র পশ্চিম-উত্তর ভারতের ভদ্রঘরের মেয়েরা এই কারণেই তাঁদের স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে পর্দানশিন অন্তঃপুর-চারিণী হয়েছেন। বৃটিশ সরকার এর প্রতিকার করতে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধু ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছেন। ইত্যাদি।—

ইংরেজ অধ্যক্ষের মুখে এ প্রকার সান্ত্বনা বাক্য যথেষ্ট শুনলাম। এ ছাড়া আর কি সান্ত্বনাই বা তিনি দেবেন ?

ছুটি নিয়ে গ্রামে গেলাম। মুসলমান ব্যবসাদারদের নিকটে আমাদের লগ্নী টাকা কিছু আদায় হ'ল। যথারীতি পিতামাতার শ্রাদ্ধ করলাম। হতভাগ্য তিনটি ভাই আর বোন ছু'টির উদ্দেশেও চোখের জল মিশিয়ে পিণ্ড দিলাম। তারপর গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলকে নিমন্ত্রণ করে ভোজ দিলাম। সমস্ত খরচ বাদে আমার হাতে থাকল প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা।

টাকাগুলো নিয়ে গেলাম করাচী। কলেজে না যেয়ে উঠলাম এক হোটেলে। বাজারে যেয়ে কিনলাম ভাল একখানা ছোরা। ছোরাখানা জামার তলায় লুকিয়ে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার একটি শিকারের দেখা পেলাম। পিছু নিয়ে কিছুদূর যেয়েই সুযোগ পেয়ে বসিয়ে দিলাম ছোরাখানা তার বুকে। ছোরা বসিয়ে দিয়েই পালালাম না। রক্তাক্ত ছোরা টেনে খুলে নিয়ে হাতে ক'রে পাগলের মত চিৎকার করে বললাল,—এই আমার একটি বোনের প্রতিশোধ।

তারপর ছোরা হাতেই ছুটলাম, কেউই বাধা দিল না, সকলেই ভয়ে পথ ছেড়ে দিল। ঢুকে পড়লাম একটা গলিতে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হ'য়েছে। গলি ঘুঁজি ঘুরে হোটেলে পেঁাছে গেলাম। টাকার নোটগুলো কোমরে বেঁধে, কাঁধে একখানা কম্বল আর ছোট ব্যাগটা হাতে নিয়ে, আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। লোকাল ট্রেনে করাচীর পূবে হায়দরাবাদ এসে পেয়ে গেলাম আজমীড় এক্‌স্‌প্রেস। টিকিট কেটে এক্‌স্‌প্রেসে উঠে, পরদিন বেলা দশটায় পৌছে গেলাম আজমীড়।

সেদিন সংবাদপত্রে কোনো সংবাদ দেখলাম না। পরদিন দেখলাম, বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে—করাচীর রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে রোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড। জমিদার অমুক বাহাদুরের পুত্র, অমুক বড় সরকারী কর্মচারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমুক, আততায়ীর হস্তে নিহত।

আমাদের সর্বনাশের সংবাদ সংবাদপত্রেই দেখেছিলাম, ভিতরের পৃষ্ঠায় ছোট একটা ডাকাতির সংবাদ, মাত্র চার লাইন।

তার পরদিন সংবাদপত্রে দেখলাম, আততায়ীর নামধাম সমস্ত পুলিসে জানতে পেরেছে। আসামী ধরার জন্য পুলিস বিশেষ তৎপর হ'য়ে উঠেছে। বুঝলাম আজমীড় আর নিরাপদ নয়।

আবার রেলস্টেশনে যেয়ে টিকিট কিনলাম চিতরগড়ের। রাত্রি আটটায় চিতরগড়ে নেমে, স্টেশনে থাকতে সাহস হ'ল না। অপরিচিত জায়গা, কোথায় কি আছে জানি নে। লোকের নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতেও সাহস হয় না। কি জানি, যদি কারও আমার ওপর দৃষ্টি পড়ে।

স্টেশন হ'তে বেরিয়ে কিছু দূরে যেয়েই দেখলাম, রাস্তা থেকে অল্প দূরে একটা বড় গাছের তলায় চারটে উট শুয়ে আছে। ছ'জন লোক আগুন জ্বেলে রাত্রের খাবার চাপাটি তৈরী করছে। জায়গাটা বেশ ভাল বলে মনে হল, গাছের ছায়ায় আলো-অন্ধকার। আমিও যেয়ে কম্বল পাতলাম।

একজন এসে আমার পরিচয় জানতে চাইল। পরিচয় দিলাম— বাড়ী আজমীরের নিকট পুষ্করে। কম্বল তৈরীর ব্যবসা আছে। ভেড়ার লোম কিনতে এসেছি। রাত্রিটা তাদের সাথে গাছ তলায়ই কাটাব।

কলেজের ছাত্র আমি, সংসার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রায় কিছুই ছিল না। অপরিচিতের নিকটে ঐপ্রকার পরিচয় দেওয়া যে বিপজ্জনক, তা জানতাম না। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি, আমার মুখচোখ শক্ত ক'রে বাঁধা হচ্ছে, হাত পাও বাঁধা। বুঝলাম ডাকাতের হাতে পড়েছি। কোনো প্রকার মুক্তির চেষ্টা না করে অসাড়ে পড়ে থাকলাম।

আমার কোমর হতে নোটের তাড়াটা খুলে নিল। বুঝলাম নোটগুলো গুনছে। গুনে দেখে পরামর্শ করল—'বড় ব্যবসাদার, অনেক টাকা মুক্তিপণ আদায় হবে, উটের পিঠে বেঁধে সর্দারের নিকটে নিয়ে চল।'

তারপর উটের পিঠে ঘণ্টা পাঁচেক চলার পর, একজায়গায় এসে চলা শেষ হ'ল। আমাকে নামিয়ে আরও কিছুক্ষণ পরে হাত-পা ও চোখ-মুখের বাঁধন খুলে দিল। রাত্রি তখন প্রভাত হ'য়ে সূর্য উঠছে।

পাহাড়ে জায়গা, চতুর্দ্দিকেই পাহাড়। দশজন সঙ্গীসহ দস্যুসর্দার আমার সম্মুখে উপস্থিত। সর্দার জিজ্ঞাসা করল—কত টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা কর?

উত্তর দিলাম—আমি ব্যবসা করি নে।

তবে কার টাকা নিয়ে লোম কিনতে এসেছ?

আমি লোম কিনতে আসি নি। ও টাকা আমার।

এদের নিকটে ব্যবসাদার বলে পরিচয় দিয়েছ কেন?

আমি ফেরারী। খুন করে ফেরার হয়েছি। তাই মিথ্যে পরিচয় দিয়েছি।

সমস্ত কথা খুলে বল?

সমস্তই বললাম। সংবাদপত্র দু'খানা ব্যাগে ছিল, ব্যাগটা চেয়ে নিয়ে সেটাও দেখালাম।

সমস্ত কথা শুনে সর্দার বললেন—তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার টাকা আমরা নেব না। তুমি কোথায় যেতে চাও বল, আমার লোক তোমাকে সেখানে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর যদি এখন আমাদের আশ্রয়ে থাক, তবে পুলিসে তোমার ছায়াও খুঁজে পাবে না। তুমি নির্ভয়ে থাকতে পার। এই লও তোমার টাকা।

আমি টাকা নিলাম না। বললাম—আপনারা যদি দয়া করে আশ্রয় দেন, তবে আমার টাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি সমস্ত বিষয়েই অনভিজ্ঞ। এ অবস্থায় যদি এখন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই, তবে ধরা পড়ে যাব।

সর্দার বললেন,—তুমি আমাদের অতিথি হয়ে যতদিন ইচ্ছা থাকতে পার। যখনই এখান থেকে যেতে চাইবে, তখনই তোমার

সমস্ত টাকাই পাবে। আর যদি আমাদের দলে যোগ দাও, তবে তোমার শত্রুদের ওপরে ভালমত প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

আমার অন্তরে তখন প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। এ সুযোগ আমি লুফে নিলাম। দলে ভর্তি হলাম।

আরম্ভ হল আমার শিক্ষা। ঘোড়ায় চড়া, উটে চড়া, গাছে ওঠা, দেওয়াল টপ্‌কানো, বন্দুক পিস্তল তলোয়ার লাঠি চালানো, কত কি।

দিন কাটতে লাগল। অবকাশ মত সঙ্গীদের মুখে তাদের কাহিনী শুনতাম। সকলের কাহিনীই প্রায় এক প্রকার, প্রবলের হাতে দুর্বলের নিদারুণ উৎপীড়ন। সে পীড়নের কোনো প্রতিকার না পেয়ে, শেষে প্রতিশোধ নেবার জন্য এই দলে যোগ দিয়েছে। প্রায় সকলেই দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর গৃহস্থঘরের মানুষ। তাদের কয়েক-জনের কাহিনী যা শুনলাম, তা আমার চাইতেও মর্মান্তিক।

উত্তর পশ্চিম ভারতে 'হুড়্' নামে পরিচিত এক দস্যু সম্প্রদায় আছে। হুড়েরা সকলেই মুসলমান। রাজা, জমিদার, ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের কারবার চলে। হুড়েরা ঐ সমস্ত রাজা নবাব জমিদারদের বহু দুষ্কার্য উদ্ধার করে দেয়।

আর একশ্রেণীর ডাকাতের দল আছে। সে দলে হিন্দু মুসলমান সমস্ত শ্রেণীর লোকই ভর্তি হয়। এই সমস্ত দল রাজা নবাব ধনীদের পরম শত্রু। এই দলগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ। মধ্যে মধ্যে এদের দলে উচ্চবংশ মধ্যবিত্ত ঘরের অত্যাচারিতা সুন্দরী যুবতীও যোগ দেয়। এরাই হয় সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্করী। ডাকাতির সময় হত্যা করা হয় এদের নেশা।

এই শ্রেণীর ডাকাতদের বহু দল আছে। প্রতিদলে এক একজন সর্দার আছে। প্রত্যেক দলের কার্যক্ষেত্র এক একটা এলাকায় সীমাবদ্ধ। প্রয়োজন হলে কয়েকটা দল একত্রিত হয়েও কাজ করে। পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা আছে।

দলে যোগ দিয়ে আমার এক বছর কেটে গেল। এর মধ্যে কোনো ডাকাতিতে যোগ দিতে আমার ডাক পড়েনি। আরও কয়েকমাস কেটে গেলে একদিন সর্দার ডেকে বললেন—তোমার প্রতিশোধ নেবার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। ঐ এলাকাটা একজন মুসলমান সর্দারের। তুমি আগামীকাল আমার দলের দু'জনের সাথে যেয়ে, তাদের দলে যোগ দেবে। কাজ শেষ হলে আবার দলে ফিরে এস। কোনো ভয় করবে না। আমার লোক দু'জন তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বদা পাশেই থাকবে। তুমি তাদের পরামর্শ মত চলবে।

সর্দারের কথামত পরদিন যাত্রা করে মীরপুরখাস স্টেশনে নেমে মুসলমান সর্দারের দলে যোগ দিলাম। সর্দার মুসলমান হলেও দেখলাম তার দলে হিন্দু ও শিখই বেশী।

দু'দিন পরে রাত্রে হল আমাদের অভিযান। দলের সকলেই রং ইত্যাদির সাহায্যে ছদ্মবেশ করে নিয়েছে। আমিই কেবল সর্দারের কথামত সাধারণ বেশেই চললাম।

যে বাড়ী আমরা আক্রমণ করলাম, তাদের তিনটে বন্দুক, দুটো রিভলভার ছিল। বাড়ীও সুদৃঢ় প্রাচীরে সুরক্ষিত। কিন্তু প্রায় একবছর যাবৎ সর্দারের দু'জন লোক খানসামার চাকরি নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে ছিল। তাদের কর্মকুশলতায় বাড়ীর সদর দরজার লোহার কবাট আমাদের গতিরোধ করল না। বন্দুক পিস্তলও কোনো কাজে এল না।

বাড়ীর অন্দর মহলে ঢুকে বৃদ্ধ জায়গীরদার ও তাঁর পুত্রদের বেঁধে ফেলা হ'ল। তারপর তাদের সম্মুখে আনা হল, বাড়ীর বউ ও মেয়েদের।

সর্দার আমার হাত ধরে ওদের সম্মুখে দাঁড় করে দিয়ে, একটা ভয়ঙ্কর হাসি হেসে জমিদার ও তার পুত্রদের বলল—চিনতে পারছ কি, এই লোকটি কে? মনে করে দেখ, একবছর পূর্বে এরই সুন্দরী দুটি বোনকে ধরে আনার জন্য হুড় নিয়ে এদের বাড়ী গিয়েছিলে। বোন দু'টকে ধরতে পার নি, তারা আগুনে পুড়ে মরেছে। তোমরা এর বাবা, মা, ছোট

তিনটি ভাইকে ছাগলের মত জবাই করেছিলে। ও নিজে করাচীর রাস্তায় তোমাদের একটার বুকে ছোরা বসিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। আজ আমরা তোমাদের বুঝাব, পরের মেয়ে-বউ কেড়ে এনে, তাদের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার করলে, সেই মেয়ে-বউ গুলোর স্বামী, ভাই, বাপ, মার মনে কেমন লাগে।

তারপর যে বিভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হতে লাগল, তার কিছুটা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মানুষ যে এমন পশু হতে পারে, তা আমার ধারণাতীত ছিল। আমি নীচে পালিয়ে এলাম।

নীচের তলায় অনেকগুলো বাঁদী চেঁচামিচি করছে। পনরো ষোল বছর বয়স থেকে সব বয়সের মেয়েই তাদের মধ্যে ছিল। কেউ কিন্তু তাদের গায়ে হাত দিল না। আশ্চর্যের বিষয়, এই বাঁদীরাই বাড়ীর বউ-মেয়েদের ধরিয়ে দিয়েছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে লুট ও অত্যাচার চলল। ওপর তলায় নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে নীরব হয়ে গেল। কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটল না। দু'ঘণ্টাপরে লুন্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে আমরা আমাদের পথ ধরলাম।

পরদিন সঙ্গী দু'জনের সাথে আমাদের দলে ফিরে চললাম। আমাকে নীরব ও বিমর্ষ দেখে, সঙ্গী দুজন কারণ জানতে চাইল। উত্তরে বললাম, তোমরা যে মেয়ে-বউদের ওপরে এ প্রকার অত্যাচার করবে, তা জানলে আমি আসতাম না।

শুনে তারা হো হো করে হেসে বলল—তোমার বোন দু'টি যদি সে রাত্রে ওদের হাতে ধরা পড়ত, তবে কি হত জান? তখনই যে তাদের ওপরে বেশী অত্যাচার হত, তা নয়। মেয়ে দু'টো চালান হয়ে যেত ঐ ধনী বদমাশদের গুপ্ত আড্ডায়। তারপর ওরা বন্ধুবান্ধব ডেকে এনে দিন রাত মেয়ে দুটোর ওপরে অত্যাচার করত। সে অত্যাচারে মরণাপন্ন হলে, নিয়ে যেত বাড়ীতে। বাড়ীতে যেয়ে সুস্থ হলে, তখন অন্তত দশ বছর ধরে ওদের বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে বাড়ীতে দু'চার মাস

করে ঘুরতে হত। ঐ বাড়ীর নীচের তলায় যে একপাল মেয়ে দেখলে, তাদের সকলেরই ভাগ্যে প্রায় এই প্রকারই ঘটেছে।

আমার আর এ সব কথা শোনার প্রবৃত্তি ছিল না। আমি অনুরোধ করে তাদের থামিয়ে দিলাম। দলের আড্ডায় এসে সর্দারকে জানালাম, আমি আর তাঁদের দলে থাকতে চাইনে। এ কাজ আমার পোষাবে না।

সর্দার হেসে বললেন—ঠাকুর, তা আমি জানি। একে তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তাতে সদ্বংশের শিক্ষিত যুবক। প্রতিহিংসার তাড়নায় তোমার পক্ষে খুনকরা সহজ, কিন্তু এ প্রকার ডাকাতি করা সম্ভব নয়। ঐ সর্দার যে এইভাবে প্রতিশোধ নেবে, তা বুঝতে পারলে আমি তোমাকে পাঠাতাম না। আচ্ছা বেশ, তুমি যেতে পার। তোমার টাকা নিয়ে যাও। যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, তবে সমস্ত টাকা না নিয়ে, অল্প কিছু নিয়ে যাও। অবশিষ্ট টাকার জন্য আমি তোমাকে একখানা চিঠি করে দিচ্ছি। অমুক অমুক সহরে, অমুক অমুক ব্যক্তির গদীতে চিঠি দেখালেই প্রয়োজনমত টাকা পেয়ে যাবে। এখন তুমি দক্ষিণে হায়দরাবাদ বা মহিশূর রাজ্যে চলে যাও। সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ঘুরতে থাক। আমাদের দেশের পুলিস কেবলমাত্র একটা খুনকরা আসামী বেশী দিন খোঁজ করে না। কোনো প্রকারে বছর দুই কাটাতে পারলেই তোমার সম্বন্ধে পুলিসের দৃষ্টি খতম হয়ে যাবে। তোমার টাকা ফুরিয়ে যদি আরও টাকার প্রয়োজন হয়, তবে ঐ সমস্ত গদীর মালিকের সাথে দেখা করে, তার পরামর্শ মত আমার নিকটে এস। তোমার যা টাকা লাগে আমি দেব।

সর্দারের পরামর্শই গ্রহণ করলাম। বেরিয়ে পড়লাম আপনারই মত গেরুয়া পরে, মাথা নেড়া করে। নানা দেশ ঘুরতে থাকলাম, কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি এল না। কিছুতেই ভুলতে পারলাম না, সেই রাত্রের নিরপরাধিনী অসহায়া দশ বারোটা নারীর ভীতি বিহ্বল মুখচ্ছবি, আর তাদের কাতর আর্তনাদ।

নিজ হাতে ছোরা বসিয়ে খুন করেছি। ছোরা বসানোর সাথে সাথে সেই বদমাশটাও মরণ চিৎকার করেছিল তাতে আমার মনের ওপরে কোনও গ্লানির রেখাপাত হয়নি। কিন্তু ঐ রাত্রের দৃশ্য আমি কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। সব সময় কানে বাজত তাদের করুণ আর্তনাদ, আর চোখে ভাসত তাদের সেই কাতর মুখচ্ছবিগুলি।

তিন বছর দেশে দেশে ঘুরলাম। ক্রমেই অবস্থা খারাপ হতে লাগল। মনে হত, আমি বোধহয় ঘোর উন্মাদ হয়ে যাব। ঘুরতে ঘুরতে একদিন এলাম এই মঠে। দর্শন পেলাম মঠাধ্যক্ষ মহাতমাকে। লুটিয়ে পড়লাম তাঁর চরণে। খুলে বললাম আমার সমস্ত কাহিনী। ভিক্ষা চাইলাম আশ্রয় ও মনের শান্তি।

ভিক্ষা মিলল। মহাতমা আমাকে চরণে স্থান দিয়ে সন্ন্যাস দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মনের শান্তি ফিবে পেলাম। মহাতমা করুণার প্রতিমূর্তী। আমার অবস্থা বুঝে তিনি আমাকে দিয়েছেন সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা, যা এই মঠে আর কারও নেই। তারপর এই আঠার বছর এই মঠে আছি।

এই হল আমার ইতিহাস।

থানেশ্বরে বাঙ্গালী ফকির।

থানেশ্বর এসে প্রায় একমাস কাটতে চলল। সাধারণ-ভাবে দেখলে খুব সুখে থাকারই কথা। মঠের পবিত্র পরিবেশ, আহারাদির সুব্যবস্থা, যাঁদের সাথে পরিচয় হয়েছে তাঁদের আন্তরিক সদ্ব্যবহার—এ সবই পেয়েছি। কিন্তু বিধাতা বোধহয় মানুষের জন্য নিছক সুখের ব্যবস্থা

করেন নি। সুখের সাথে দুঃখ থাকবেই। এর কারণ—বিধাতার দান 'মন' নামক অদ্ভুত পদার্থটি। আমাদের মন সুখভোগ্য ঐশ্বর্যের মধ্যে ব'সে খুঁজবে দুঃখ, আর দুঃখ দারিদ্র্যের ঘোর অন্ধকারে ব'সে খুঁজবে সুখ। সে খোঁজাখুঁজির তীব্রতা নির্ভর করে কিন্তু, সুখ ও দুঃখের পরিমাণের ওপরে।

কপিলাবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদন তাঁর পুত্র সিদ্ধার্থের সুখের জন্য সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই করেছিলেন। ফলে রাজকুমারের মন রাজপথে খুঁজে বের করল জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের দুরবস্থা, মৃতদেহের বিবর্ণ মুখমণ্ডল। পেয়ে গেলেন দুঃখ ভোগের অবলম্বন।

মানুষ নিজে নিজের সুখের ব্যবস্থা ক'রে সুখী হতেই পারে না, কারণ সুখের ব্যবস্থা করাটাই দুঃখ। অপরে যদি ব্যবস্থা করে, তাতেও সুখ হয় না। রাজা শুদ্ধোদন ও তাঁর পুত্র সিদ্ধার্থ এ বিষয়ে চমৎকার দৃষ্টান্ত।

পাঠক-পাঠিকা হয়তো মনে ভাবছেন, থানেশ্বর মঠে এসে এত আরামে থেকেও আমার দুঃখের হেতু, বাড়ীর চিন্তা ও লক্ষ্ণৌএ কর্তব্য সম্পাদনে ভয়। আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন তবে বলব, ও দুটোর একটাও নয়। এ দুঃখের হেতু অভূতপূর্ব। বাড়ীর চিন্তা এতই পুরণো হয়ে গিয়েছে যে, ও আর মনে সাড়া জাগায় না। নতুন জুতোর ফোস্কা ব্যথা দেয়, পুরণো হ'য়ে কড়া পড়লে সুখ-দুঃখ কোনো বোধই থাকে না। লক্ষ্ণৌ যেতে ভয় তো দূরের কথা, থানেশ্বরে এসে যা দেখলাম ও শুনলাম, তাতে লক্ষ্ণৌ যেয়ে কিছু করার উৎসাহ বেড়ে গেল।

যেদিন প্রথম থানেশ্বর এসেছি, সেই দিনই পথে থানেশ্বর-মন্দিরে প্রাচীরের গায় দেখলাম জাঠ মুসলমানদের দুরবস্থা। শুনলাম তাদের দুরবস্থার হেতু। মন্দিরের পথে শুনলাম, থানেশ্বরের পতন কাহিনী। দেখলাম জহরব্রতের স্থান, বিজয়ী মুসলমানদের সাথে বীর জাঠদের যুদ্ধ-ক্ষেত্র। আর দেখলাম মন্দির-প্রাচীরের ওপরে সেই স্থান, যেখানে এক-হাজার ব্রাহ্মণের ছিন্নমুণ্ড তাঁদেরই গলার পৈতে দিয়ে বাঁধা ছিল দিনের পর দিন।

প্রতিদিন অপরাহ্নে বেড়াতে যাই। মঠ থেকে বেরিয়ে পথে এসেই পা যেন আপনা হতেই টেনে নিয়ে যায় ঐ ১১৯১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ভারতের পরাধীনতার সূচনা-ভূমির দিকে।

থানেশ্বর মন্দির-দুর্গ প্রবেশ-পথের নিকটে এসে পথ চলা থেমে যায়। উঁচু প্রাচীরের নীচে দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবি—ঐ দরজা দিয়ে এমনি সময় ফুল, ফুলের মালা হাতে কত নরনারী যেত থানেশ্বর দর্শনে। আজ ওব ভিতরে আমার প্রবেশাধিকার নেই। ঐ যে দরজার বাইরে ব'সে মোল্লাসাহেব তসবি জপ করতে করতে আমাকে দেখছেন, আমার অন্তবের কথা উনি কি বুঝতে পেরেছেন? যদি বুঝে থাকেন, তবে ওঁর অন্তরে কি ভাব জেগেছে? বিজয়ের গর্ব, না পরাজিতের প্রতি সমবেদনা?

মোল্লা সাহেব তো দেখছি ধার্মিক, অবিরত তসবি জপ করছেন। বিধর্মীর ধর্মমন্দির সশস্ত্র লোক বলে অধিকাব ক'বে নিজ ধর্মের উপাসনা-মন্দিরে পরিণত করলে উপাস্য ভগবান সন্তুষ্ট হন কি? শাস্ত্রে কি এর কোনো ব্যবস্থা আছে?

ভাবতে ভাবতে আবার পথ চলি। মন্দিরের দক্ষিণে এসে গতি থেমে যায়। সন্মুখে জহরব্রতের স্থান। ঐখানে জ্বলেছিল প্রচণ্ড অগ্নিশিখা। সে আগুনে শেষ হয়ে গিয়েছে কত সুখ, কত আশা, কত রঙিন স্বপ্ন। কানে ভেসে আসে ডি, এল, রায়ের গান—

'সধবা অথবা বিধবা তোমরা রহিবে উচ্চশির ;
উঠ বীরজায়া বাঁধহ কুন্তল ঘুচাও অশ্রুনীর ॥'

গানটা কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়ে ওঠে। গুন গুন করতে করতে এগিয়ে যাই পশ্চিমে। মন্দির দুর্গের বাইরের প্রাচীর পশ্চিম দিকে ভেঙ্গে গেছে। সন্মুখেই খোলা মাঠ। ঐ মাঠেই থানেশ্বর রক্ষার জন্য নাতীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ঠাকুরদাদা। বর্শাবিদ্ধ নাতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অশ্বারোহী ঘাতকের ওপরে। কল্পনানেত্রে ভেসে ওঠে বাস্তব রূপ নিয়ে সে দৃশ্য। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

মাঠের প্রান্তে সূর্য ডুবে যায়। দমকা হাওয়া মন্দির দূর্গের প্রাচীরে বাধাপেয়ে হুঁ হুঁ, শোঁ শোঁ শব্দ করে ওঠে। ফিরে তাকাই সেদিকে। সহস্র ছিন্ন মুণ্ড ব্রাহ্মণের আর্ত আত্মা, হাজার হাজার লাঞ্ছিতা নারীর ভয়ব্যাকুল আর্তনাদ সাথে নিয়ে যেন আমাকে ঘিরে ফেলে। আমাকে উপদেশ দেয়—মুসলমান অভিযানের সম্মুখে ভারতের হিন্দু এক হ'তে পারে নি, তার জন্যই আমাদের এই লাঞ্ছনা। তোমরা সতর্ক হও। ভারতের মুক্তির জন্য তোমাদের পন্থা বিভিন্ন হয় হোক, উদ্দেশ্যে এক হও। তোমাদের মধ্যে যারা বিভীষণ, তাদের খুঁজে বের করে সাবধান হও! মনে রেখ, সহস্র জ্ঞাত-শত্রু অপেক্ষা একটি বিভীষণ মারাত্মক। এই বিভীষণ গোষ্ঠীই ভারতে সমস্ত অনর্থের মূল। এদের ক্ষমা করাও অপরাধ।

রাতের আঁধার নেমে আসে, ঝাপসা হয়ে যায় থানেশ্বরের প্রান্তর। ফেরার পথে আবার দাঁড়াই মন্দির-দুর্গের দরজার কাছে। ভাবি, এই দরজা খুলতে হবে। তারজন্য ভারতের স্বাধীনতা প্রয়োজন। লক্ষ্ণৌ যাওয়ার নির্দেশ এলেই যাব। আমার লক্ষ্যভেদ অব্যর্থ, বুকের নিশ্বাসও একটু হাত কাঁপাতে পারবে না।

সকল ব্যাপারেরই সীমা আছে। সীমার নিকটে এলে, হয় সেটি ধ্বংস হয়ে যায়, নয় তো পিছন ফেরে। দুঃখ-অশান্তিরও সীমা আছে। সে সীমায় পৌঁছুলে দুঃখ-অশান্তি সমূলে ধ্বংস হয়, অথবা মাঝামাঝি রকমের একটা সামঞ্জস্য ক'রে সাময়িক শান্তি আসে।

আমার অশান্তিরও সাময়িক শান্তির ব্যবস্থা হল।

প্রতিদিনের মত সেদিনও বেড়াতে বেরিয়ে মন্দির দূর্গের পশ্চিমে মাঠে দাঁড়িয়ে আছি। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের এক জাঠ নারী দশ-এগার বছরের একটি মেয়ের সাথে দশ বারোটা ছাগল-ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরছে।

মা ও মেয়ে। মেয়েটি সদ্য ফোটা ফুলের মত কমনীয়। মায়ের মুখ সাঁঝের স্থলপদ্মের মত কেন? এ তো দারিদ্র্যের ক্ষতচিহ্ন নয়!

তবে কি আমার মারাঠীবন্ধু কথিত লাঞ্ছনা এও ভোগ ক'রেছে ? ঐ ফুলের মত মেয়েটার ভাগ্যেও কি তার মায়ের তুর্ভোগ আছে ? কেউ কি এদের রক্ষা ক'রতে এগিয়ে আসে না ? রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম—সব কি পঙ্গু হয়ে গিয়েছে ?

যদি তাই হয়, তবে এ রাষ্ট্র, এ সমাজ, এ ধর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করতে হবে। তাতে সারা ভারত একটা জনশূন্য শ্মশান হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। ভবিষ্যৎ কালে সেই ভারত-মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে বিদেশী ঐতিহাসিক স্মরণ করবে, এখানে এমন একটা মহান্ জাতি ছিল, যারা ধর্মের মর্যাদা, নারীর মর্যাদা, জাতির মর্যাদা রক্ষার জন্য নিঃশেষ হয়ে গিয়ছে।

হঠাৎ কানে এল—আপনি কি বাঙ্গালী ?

ফিরে দেখি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এক মুসলমান ফকির। মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম সি, আই, ডি, নয়। প্রশান্ত মুখমণ্ডল কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁপে ভরা। বয়স অনুমান করা যায় না, পঞ্চাশও হ'তে পারে, পঁচাত্তরও হ'তে পারে, এর বেশী কমেও আপত্তি নেই। কারণ, হিন্দু সাধু ও মুসলমান ফকিরদের দেখে বয়স অনুমান করা যায় না, বহু জায়গায় ঠেকে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। ফকির আকারে খাটো, পরণে ফকিরদের পেটেণ্ট আলখাল্লা, মাথায় ছোট টুপি, হাতেও সেই পেটেণ্ট বাঁকা লাঠি।

কোনো উত্তর না দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে একটু হেসে বললেন—বাংলায় কথা বলছি ব'লে অবাক্ হলেন যে। কেন, বাঙ্গালী ফকির কি পাঞ্জাবে এসে আস্তানা করতে পারে না ? চলুন না, অল্প দূরেই আমার আস্তানা। সেখানে ব'সে একটু আলাপ-সালাপ করব

চললাম ফকিরের সাথে। প্রায় আধ মাইল যেয়ে আস্তানা। বড় বর্ষাতি গাছের তলায় ইঁটের পাঁজার মত একখানা মেটেঘর, বারান্দা নেই। নিকটে লোকালয়ও নেই। স্থানটি নির্জন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফকির এক পাশ থেকে এক খানা ঘাসের আসন এনে ব'সতে দিলেন।

পথে আসতে কোনো কথা হয় নি। গাছতলায় ব'সে ফকির বললেন,—কিছুদিন ধরে দেখছি আপনি ঐ মন্দিরটার চারদিকে ঘোরেন। আপনার মুখের ভাব দেখে অন্তরের কথাও কিছু কিছু টের পাই। বলুন তো আপনার জন্মস্থান কোথায় ?

ফরিদপুর জেলা পাংসায়।

পাংসা ! আপনি পাংসার মাতাম্ ফকিরকে চেনেন ?

ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছি, তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসতেন। বড় জ্যেঠামশাই তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। জ্যেঠামশাইর মৃত্যুর পর আর তাঁকে দেখিনি। শুনেছি তিনি এখনও বেঁচে আছেন।

হ্যাঁ, তিনি এখনও বেঁচে আছেন। এখন বলুন তো ঐ মন্দিরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে আপনি কি ভাবেন ?

আপনি বারে বারেই ওটাকে বলছেন মন্দির। কিন্তু ওটা তো আমাদের মন্দির নয়, ওটা আপনাদের মসজিদ, বা ঐরকম একটা কিছু।

হ্যাঁ, এই নিয়েই তো হ'য়েছে বিপদ। যতদিন হিন্দুস্থানের বুকে একটি হিন্দুমন্দিরও মসজিদ সেজে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততদিন হাজার হাজার গান্ধী আপ্রাণ চেষ্টা করেও হিন্দু মুসলমানে আন্তরিক মিলন ঘটাতে পারবে না।

আপনার কথাটার তাৎপর্য আমি বুঝছি এই যে, ভারতের মুসলমান যেন হিন্দুর সাথে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে বলছে—যা হবার তা হয়ে গেছে, ও আর কিছু মনে ক'র না। এখন এস আমরা দু'ভাই মিলে-মিশে এই ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করি।' অপর পক্ষে হিন্দুরা মুসলমান আমলের কথা স্মরণ ক'রে, ভারতের স্বাধীনতার জন্যেও মুসলমানদের আকুল আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না।

নাঃ, আমি ও তাৎপর্যে কথাটা বলিনি। আমার কথার তাৎপর্য—অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আসছে, যখন এই হিন্দুস্থানে মুসলমানদের নিজ প্রয়োজনেই হিন্দুদের সাথে আন্তরিকভাবে মিলিত

হতে চেষ্টা করতে হবে। সে চেষ্টায় সাফল্যলাভের প্রধান অন্তরায় হবে ঐ মসজিদ বেশধারী হিন্দুমন্দির। আমি মুসলমান, আমার মক্কার কাবাসরিফ তো দূরের কথা, একটা ছোট মসজিদও যদি কোনো বিধর্মী বলপূর্বক অধিকার ক'রে তার ধর্মস্থানে পরিণত করে, তবে আর যাই করি না কেন, সেই কাফেরদের সাথে যে, কোনো কারণেই বন্ধুত্ব করব না, এ নিশ্চয়। আপনাদের কাশীবিশ্বনাথের মন্দির, অযোধ্যার রামচন্দ্রের মন্দির, মথুরার কিষাণজীর মন্দির, এই থানেশ্বরের শিব মন্দির, মসজিদ সেজে চোখের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আপনাদের সাথে আমাদের হবে স্থায়ী মিতালী—এ কথা বলতে পারে এক মতলববাজ, আর উন্মাদ। সৎ, সুস্থমস্তিষ্ক কোনো ব্যক্তি বলবে না।

বিস্মিত হয়ে গেলাম ফকির সাহেবের কথা শুনে। একজন মুসলমান এ প্রকার চিন্তা করে! এ আমার পক্ষে অভাবনীয়।

রাত হয়েছে। শ্রদ্ধাসহকারে সেলাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। ফকির সাহেব আমাকে সুযোগ পেলেই আসতে বললেন। ফকির সাহেব না বললেও আমি আসতাম। অল্প একটু আলাপেই বুঝেছি, এ সাধারণ ফকির নয়। সে দিন ফকিরের কথাই ভাবতে ভাবতে মঠে ফিরলাম।



বাংলার ফকির সম্প্রদায়

পরদিন প্রভাতে ঘুমভেঙ্গেই প্রথমে ফকিরের কথাই মনে জাগল। আমি এর পুর্বে কোনো শিক্ষিত ফকিরের সাথে পরিচিত হই নি। যাঁদের আমি দেখেছি বা আলাপ করার সুযোগ পেয়েছি, তাঁরা ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানলেও দেশের ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি জানেন ব'লে মনে করার মত কিছু পাই নি। তবে সাধারণ ভাবে দেখেছি, ফকির মাত্রই ধর্ম বিষয়ে উদার। সব ধর্মকেই তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। হিন্দু-মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক তাঁদের ভক্ত হয়। এঁদের সাধন ভজন পদ্ধতি রহস্যাবৃত। নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ছাড়া, অপর কারও নিকটে সাধন-ভজন রহস্য প্রকাশ করেন না।

বাঙ্গলা দেশে ফকিরেরা বহু গান রচনা করেছেন। আমাদের সাহিত্য-সমালোচকগণ ঐ সমস্ত গানের নামকরণ করেছেন 'বাউল সঙ্গীত'। ফকিরেরা কিন্তু গানগুলি 'বাউল সঙ্গীত' নামে মেনে নিতে চান না। তাঁরা বলেন, 'আমাদের চারটি সম্প্রদায় আছে—আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ। চার সম্প্রদায়ই গান রচনা করেন। সে সমস্ত গান একমাত্র বাউল সম্প্রদায়ের নামে চলবে কেন?'

মুসলমান মোল্লা-মৌলবিরা কিন্তু এই ফকির সম্প্রদায়কে ভাল চোখে দেখেন না। একটা ঘটনা এখানে লিখি,—

পাবনা জেলায় বেড়া ও নাকালিয়া গ্রামের মাঝে বড়াল নদীর তীরে পাইখন্দ নামে একটা ছোট গ্রাম আছে। গ্রামে দশ-বারো ঘর সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ও বিশ-পঁচিশ ঘর মুসলমান কিছুকাল পূর্বেও বেশ মিলে মিশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতেন।

প্রায় এক শ' বছর পূর্বে এই গ্রামের এক মুসলমান প্রভাতে বড়াল নদীতে মাছধরা দোয়াড় তুলতে যেয়ে, একখানা হাতে লেখা বড় পুঁথি পান। পুঁথিখানা বাড়ী এনে যত্ন করে রেখে দেন। নিজে

লেখাপড়া জানেন না, অপর কারও দিয়ে পড়িয়ে শুনবেন পুঁথিতে কি লেখা আছে।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, হনুমানের মত মুখাকৃতি এক বিরাট পুরুষ তাঁকে বলছেন—তুই ফকির হয়ে যদি সাতদিন ঘরে দরজা বন্ধ করে একা অনাহারে থাকতে পারিস, তবে পুঁথি পড়তে পারবি, আর পুঁথিতে লেখা সব তোর কণ্ঠস্থ হয়ে যাবে। এই পুঁথি প্রভু রামচন্দ্রের লীলা 'রামায়ণ'। এই রামায়ণ গান করে বহু অর্থ পাবি। তোর তিন পুরুষ এই রামায়ণ গেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। চতুর্থ পুরুষে এমন ঘটনা ঘটবে, যাতে এই রামায়ণ তোদের ছেড়ে যাবেন। এই রামায়ণ একমাত্র তোর বংশের বড় ছেলে পাবে, আর কেউ পাবে না। অপর কাউকে প'ড়তেও দিবি নে।'

স্বপ্নাদেশ মত সব পালিত হল। মুসলমানটি হলেন বিখ্যাত রামায়ণ গায়ক। তাঁদের উপাধি হল 'গায়েন'। তাঁর তৃতীয় পুরুষ যদু গায়েনের রামায়ণ গান আমি ছেলে বেলায় শুনেছি। অপূর্ব সে গান। পাবনা সহরে যদু গায়েনের গান হলে জনতা সামলাতে বহু পুলিস প্রয়োজন হ'ত। তাঁর মুখে 'রাবণ বধ' ও 'সতীর বনবাস' পালা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা এখনও সে গানের সাথে অপর কোনো রামায়ণ গায়কের গানের তুলনা করতে চান না।

প্রতি বছর সরস্বতী পূজোর সময় দু'দিনের জন্য তাঁরা রামায়ণ পুঁথিখানা গ্রামের রায়বাড়ীতে পূজার জন্য দিয়ে যেতেন। একবার জ্যোতীশ রায়মশাই পুঁথি খুলে দেখেছিলেন, লেখা বাংলা, দেবনাগরী বা তাঁর পরিচিত কোনো অক্ষরে নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, পুঁথি খুলে দেখার অল্প সময়ের মধ্যে যদুগায়েন এসে বললেন—পুঁথি খোলা হয়েছে। এটা খুব অন্যায়। এর ফল রায় বংশের পক্ষে অশুভ হবে। এই ব'লে পুঁথি নিয়ে গেলেন। পরে দেখা গেল, সেই থেকে পাইখন্দের রায় পরিবারের দুর্দশা আরম্ভ হল। এই ঘটনা আমি জ্যোতীশ বাবুর মুখে শুনেছি।

সম্ভবত যদু গায়েনের মৃত্যু হয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। ১৯২৭-এ যখন হিন্দু মুসলমানে বিরোধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন একদিন কয়েকজন মোল্লা-মৌলবি বহু মুসলমান সাথে করে পাইখন্দ গায়েন-বাড়ীতে উপস্থিত হন। তাঁরা গায়েন-বাড়ীর ওপরে গো-কোরবানি করে সকলকে গোস্ত খাওয়াবেন, আর রামায়ণ পুঁথিখানা পুড়িয়ে দেবেন।

বেগতিক দেখে যদু গায়েনের বিধবা স্ত্রী তাঁর ছেলেকে দিয়ে গোপনে পুঁথিখানা নাকালিয়া পাঠিয়ে দেন।*

এই প্রকার বহু ঘটনা শুনেছি। মৌলবিদের নিকটে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি, অনেকে এই ফকির সম্প্রদায়কে মুসলমান ব'লে স্বীকার করতেই চান না। তথাপি বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান আছেন।

এই সম্প্রদায়ে তিন শ্রেণীর ফকির দেখা যায়। একশ্রেণীর ফকির নারীসঙ্গ বর্জিত। এদের 'দরবেশ' বলা হয়। দরবেশের আস্তানা 'দর্‌গা' নামে পরিচিত। পাংসায় 'সাহজী সাহেবের দরগা' বিখ্যাত। এই দরগায় হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান শ্রদ্ধা সহকারে মানত করে। কামনা পূর্ণ হলে দরগার ঢিবির কাছে প্রদীপ জ্বেলে দরগায় দুধ ঢেলে দেয়।

আর একশ্রেণীর ফকির সস্ত্রীক সাধন ভজন করেন। এঁদের সন্তান হয় না। একস্থানে আস্তানা ক'রে বহু ফলের গাছ রোপণ করেন। গাছে ফল ধরতে আরম্ভ করলেই সে আস্তানা ত্যাগ ক'রে নতুন অস্তানা করেন। এঁরা নিজের হাতে রোপণ করা গাছ বা লতার ফল নিজে খান না। এই শ্রেণীর ফকির 'সাঁই' নামে পরিচিত।

* (পুঁথিখানার আমি খোঁজ করেছি। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য সে প্রকার চেষ্টা কিছু করতে পারিনি। শেষ চেষ্টা করেছিলাম ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। তাতে জানতে পাই, পুঁথিখানা কলকাতা চলে গেছে। বেড়া, নাকালিয়া, হাটুরিয়া জগন্নাথপুর পাইখন্দের বহু ব্যক্তি এখন কলকাতা আছেন। তাঁরা যদি চেষ্টা করে পুঁথিখানা উদ্ধার করেন, তবে বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে আর একটি অমূল্য রত্ন সংগৃহীত হবে ব'লে মনে করি।)

আর একশ্রেণীর ফকির সাধারণ গৃহী। এরা দরবেশ বা সাঁই-এর শিষ্য। গৃহী ফকিরদের দু'টো বড় উৎসব আছে। একটা 'মাদর গাজীর বাঁশ তোলা'। এ উৎসবটা প্রায় হিন্দুদের চড়ক পূজোর মত। একটা সরল তল্লাবাঁশ রঙিন কাপড় জড়িয়ে মাথায় চামর ও নিশান বেঁধে নিয়ে হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের বাড়ীতে গাজীর বাঁশ নাচিযে ভিক্ষা করা হয়। রাত্রে 'মাদার গাজীর বয়াৎ' অর্থাৎ পাঁচালি ও ফকিরী গান গায়। তিন দিন বা সাত দিন পরে শিরনি দেওয়া হয়।

আর একটা উৎসব 'বেরা ভাসানো'। এ উৎসব আমি দেখি নি। যা শুনেছি, তাতে কলাগাছ দিয়ে বড় বড় ভেলা প্রস্তুত করা হয়, সেই ভেলার ওপরে নানা আকারের ঘর তৈরী ক'রে, কাগজের ফুল ও আলোক-মালা দিয়ে সাজিয়ে, রাত্রে নদীতে ভাসানো হয়। মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা জেলার মইনটের বেরা ভাসানো উৎসব নাকি দেখার মত।

ফকির সম্প্রদায় যে সমস্ত গান রচনা করেন, তা প্রায়ই হেঁয়ালী। আমাদের সাহিত্যগবেষকগণ চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদ ও ফকিরদের গানের যে ব্যাখ্যা করেন, তা শুনে সহজিয়া বৈরাগী ও ফকিরগণ হাসেন। ঐ সমস্ত গানের হেঁয়ালী তাঁরা নিজ সম্প্রদায ছাড়া অপর কাউকে বুঝিয়ে দেন না। এ বিষয়ে নাকি তাঁদের গুরুর নিষেধ আছে।

ফকির সম্প্রদায় তাঁদের মন্ত্রতন্ত্র ও কেরামতির জন্য বিখ্যাত। থানেশ্বরের ফকিরের সাথে পরিচয় হওয়ার পরদিনই তাঁর এক কেরামতি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

গঙ্গার কাহিনী

থানেশ্বরে ফকিরের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পরদিন প্রভাত হতেই ফকির সাহেব ও তাঁর কথাগুলো মন অধিকার করে বসল। অপরাহ্নে মঠে প্রার্থনা সভা শেষ হলেই চললাম ফকিরের আস্তানার দিকে। অন্য দিনের মত সে দিন মন্দির-দূর্গের প্রবেশ দরজার নিকটে এসে গতি থেমে গেল না। একবার তাকিয়ে দেখলাম দরজার বাইরে বসে মোল্লা সাহেব তসবি জপ করছেন। আমি হন্ হন্ করে জোরপায়ে মন্দিরের সীমানা পার হয়ে গেলাম।

দূব হ'তেই দেখলাম আস্তানার গাছতলায় আরও ক'জন ব'সে আছে। দেখে মনটা একটু দমে গেল। ফকিরের সাথে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, তা আব কেউ শুনবে—এটা আমি চাই নে।

ফকির আমাকে দেখে আনন্দিত হয়ে বললেন—আমি আপনার অপেক্ষাই করছি। আজ আমার জন্য আপনাকে একটু সময়েব অপব্যয় কবতে হবে। এঁরা এসেছেন ফযাজাবাদ হতে একটি রোগী নিয়ে। রোগী তার রোগের কথা আত্মীয স্বজনের সম্মুখে বলতে চায না। আমার একটা নিয়ম আছে, একাকী ঘরের মধ্যে কোনো স্ত্রীলোকের সাথে কথা বলি নে। দযা কবে আপনি আমার সাথে থাকবেন।

আমি প্রশ্ন কবলাম—কি বোগ?

ভূতে পাওযা।

এর মধ্যে কাকে ভূতে পেয়েছে?

ঐ মেয়েটিকে।

তাকিয়ে দেখলাম, সতরো-আঠারো বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে দূর আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে বসে আছে। মুখখানা বড়ই বিষণ্ণ।

রোগের লক্ষণ শুনলাম—মাত্র দশ মাস হল বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী এসে, প্রথম মাস দুই ভালই ছিল। তারপর একদিন বেলা আটটার পর থেকে তার মা বাপ, বা বাপেব বাড়ীর কাউকে চিনতে

পারে না। স্বামীকে দেখলেই পাগলের মত তাকে জড়িয়ে ধরে, সে সময় তার কোনো লজ্জাসরম থাকে না। স্বামীকে একবার কাছে পেলে আর ছাড়তে চায় না। বেশীক্ষণ দেখা না পেলে কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে যায়। মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। ডাক্তার-কবিরাজে কিছু করতে পারে নি। এক সাধু দেখে বলেছেন মেয়েটিকে অপদেবতায় আশ্রয় করেছে। অপদেবতাটি অতিশয় শক্তিশালী। সাধারণ ওঝার ক্ষমতা নেই যে, একে তাড়ায়। সেই সাধুর কথামত এই থানেশ্বরের বাঙ্গালী ফকিরের আস্তানায় এসেছেন। মেয়েটি ধনী পিতার একমাত্র সন্তান, পিতা মাতা সঙ্গে এসেছেন। আর এসেছেন স্বামী, শাশুড়ী, মামা শ্বশুর। স্বামীর ছেলে বেলায় পিতৃবিয়োগ হয়। মামাশ্বশুর আর শাশুড়ী সংসারে কর্তা। স্বামীটির বয়স বাইশ-তেইশ, কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ, পাস ক'রেছেন। আর্থিক অবস্থাও ভাল। এরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। মেয়েটির নাম সুশীলা।

সমস্ত শুনে সম্মত হলাম। এ প্রকার ব্যাপারের কথা অনেক শোনা ছিল। কিন্তু নিজের চোখে এর পূর্বে কখনও দেখি নি। ফকির সাহেব, আমি ও মেয়েটি সেই ইটের পাঁজার মত ঘরে প্রবেশ করলাম। ফকির সাহেব একটা মোমবাতি জ্বেলে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে আমার পাশে বসলেন। মেয়েটি ব'সল আমাদের সম্মুখে। কথা যা হল, তা ভাষার জন্য যে টুকু আমি বুঝতে পারি নি, ফকির সাহেব সে টুকু আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

ফকির সাহেব প্রথম প্রশ্ন করলেন—তোমার নাম কি ?

মেয়েটি উত্তর দিল—গঙ্গাদেবী।

গঙ্গাদেবী কে ?

আমি আমার স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

তোমার স্বামী ক'টি বিয়ে করেছেন ?

দু'টি।

তোমার অবস্থা এ প্রকার হল কেন ?

আমাকে খুন করা হয়েছে।

কে খুন করেছে?

আমার শাশুড়ী, মামাশ্বশুর আর এক ডাক্তার।

তোমার স্বামী এ বিষয়ে জানেন?

না, তিনি এখনও কিছুই জানেন না। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। আমার মৃত্যু রহস্য তাঁর কানে গেলে মহা অনর্থ ঘটবে বলেই সকলের সমক্ষে কিছু বলতে চাই নি। আপনাকে সব কথা খুলে বলব। সব কথা শুনে আমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য আপনি যা করতে বলেন, তাই করব। আপনার সাথে একটা সর্ত এই যে, আমার স্বামীর বাড়ী থেকে ঐ শয়তান মামা শ্বশুরটাকে আপনি তাড়াবেন।

তোমার সব কথা শুনে কি করা কর্তব্য স্থির করব। তুমি কোনো কথা গোপন করো না। এই সাধুটিকে ভয় নেই, ইনিও তোমার মঙ্গল করবেন।

আমার সব কথা বলতে একটু সময় লাগবে। আপনারা দয়া করে শুনুন। আমার কথা কাউকে বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছি, কিন্তু বলার মত লোক পাইনি। আপনি লক্ষ্য করেছেন, আমি এখন আর কাউকে ভয় করি নে। আমি বুঝেছি, যে শক্তি আমার আছে, তার সম্মুখে মন্ত্র-তন্ত্র বিশেষ কোনো কাজে আসবে না।

ফকির বললেন—বেশ, আমরা তোমার সকল কথাই শুনব। তারপর তোমার সাথে পরামর্শ ক'রে যা ভাল হয় তাই করা যাবে। এখন তোমার কথা বল।

সুশীলার মুখে গঙ্গার প্রেতাত্মা তার কাহিনী বলতে আরম্ভ করল,—

আমার জন্মস্থান কাশী। বাবা খুব গরিব। দশাশ্বমেধঘাটে বাবা 'ছত্রী' ভাড়া করে পূজার দ্রব্যাদি বিক্রী করেন; আর ঘাটে যারা স্নান ক'রতে আসে, তাদের প্রয়োজন হলে পৌরহিত্যও করেন। এতে যা আয় হয় তাতে, ভাড়াটে বাসায় মা, বাবা ও আমরা তিন ভাইবোনের সংসার খেয়ে প'রে একপ্রকার চলে যেত।

বাবার বড় মেয়ে আমি, আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই বাবার সাথে ঘাটে যেয়ে ফুলের মালা গেঁথে দিতাম। একটু বড় হ'য়ে ঘাটে বাবার অনেক কাজে সাহায্য করতাম। দুপুরে বাসায় এসে খেয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে বেলা দু'টো-আড়াইটের মধ্যে আবার ঘাটে যেতাম। কাশীর ঘাটে বিকাল পাঁচটার পর ভিড় হয়, দু'টো থেকে চারটের মধ্যে বেশী লোকজন থাকে না। ঐ সময়ে বাবা আমাকে পড়াতেন।

আমার বয়স তখন তের বছর। রবিবারে দশাশ্বমেধ ঘাটে খুব ভিড় জমেছে। অনেকে স্নান ক'রে উঠে আমাদের কাছে তিলক পরে, আমি তিলক পরাচ্ছি। সতরো আঠারো বছরের একটি ছেলে এসে তিলক পরার জন্য আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। ঘাটে বসে বহু ছেলে দেখেছি, পরে আরও বহু দেখেছি, কিন্তু অমনটি আর দেখলাম না।

তিলক পরালাম বটে, কিন্তু অত খারাপ তিলক পরানো আমার হাতে কোনো দিন হয় নি। আয়না দিয়ে যখন তিনি মুখ দেখছেন, তখন বাবা তাঁর দিকে তাকিয়ে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন—ও কেমন তিলক পরিয়েছিস? বাবু, তুমি আমার কাছে এস, আমি ভাল ক'রে পরিয়ে দিচ্ছি।

বাবু বললেন—নাঃ, বেশ হয়েছে।

তারপর আমার সম্মুখে একটা পয়সা ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। সেই দিন থেকে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। আর কোনো অল্পবয়সী পুরুষ তিলক পরতে এলে কিছুতেই পরাতে পারতাম না। তাঁদের বাবার কাছে যেতে বলতাম, অথবা ওরকম কাউকে আসতে দেখলেই অন্য কাজে হাত দিতাম।

পরের রবিবারে প্রভাতে ঘাটে যেয়ে পথের দিকে চেয়ে আছি তিনি আসেন যদি।

এলেন তিনি। বাবার কাছে জামা কাপড় রেখে স্নান করলেন। উঠে এসে কাপড় জামা পরে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন,—তিলক পরবেন।

তাঁকে ঘাটের দিকে আসতে দেখেই আমার সব কাজ এলোমেলো

হয়ে গিয়েছিল। যখন তিলক পরার জন্য সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, তখন আমার গা কাঁপছিল। কোনো প্রকারে তিলক পরালাম। পয়সা দিয়ে তিনি চলে গেলেন। যেতে যেতেও দু'-তিনবার ফিরে ফিরে আমাকে দেখলেন।

এই ভাবে চার পাঁচটা রবিবার গেল।

সেদিন রবিবার নয়, বিকাল বেলা ঘাটে ব'সে বাবার কাছে ইংরেজী পড়ছি। এমন সময় তিনি এসে আমাদের কাছে ব'সে বাবাকে বললেন,—আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে আমার ছুটির দিনে এসে গঙ্গাকে পড়াতে পারি।

তাঁর মুখে নাম শুনে আমার যে কি অবস্থা হ'ল, তা ব'লে বুঝোতে পারব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, এর পরে বাবার সাথে তাঁর যে কথা হ'ল, তার একবর্ণও আমার কানে প্রবেশ করে নি।

পরে রাত্রে বাবা আর মা বলাবলি করছিলেন—ছেলেটির নাম শিউপ্রসাদ, বাড়ী ফয়জাবাদ, জমিদার বাপের একই মাত্র ছেলে। বাপ কিষাণপ্রসাদের সাথে আমার বাবার পরিচয় ছিল। শিউপ্রসাদের জন্মের বছরেই কিষাণপ্রসাদ হঠাৎ কলেরা হ'য়ে মারা যান। ওঁরা ব্রাহ্মণ, আমাদের পালটিঘর।

মা জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেটির সাথে আমার গঙ্গার বিয়ে কি সম্ভব ?

বাবা বললেন—সাধারণ ভাবে সম্ভব নয়, ওরা বড় ধনী। তবে বাবা বিশ্বনাথ কৃপা করলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

এই কথা শোনার পর আমি প্রতিদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে যেয়ে স্নান ক'রে প্রথমেই ঘাটের মন্দিরে শিবপূজা করতাম।

প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন বিকালে তিনি একঘণ্টা আমাকে পড়াতেন। দু'মাস পরে আই, এ, পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী গেলেন। বাড়ী যাওয়ার দিন এসে আমাকে এক গাদা পড়া দেখিয়ে দিয়ে বললেন—

ভালভাবে পড়া করে রাখবে। আমি ফিরে এসে তোমাকে ভাল সংবাদ শোনাব।

তিনি বাড়ী যাওয়ার পরদিনই বাবা আমার ছত্রীতে বসা বন্ধ করলেন। আমি নাকি সুন্দরী। ঘাটে সব লোক আমার দিকে ড্যাব্ ড্যাব্ ক'রে তাকিয়ে থাকে। আমিও বেঁচে গেলাম। বাড়ী বসে চন্দন ঘ'সে মালা গেঁথে সব প্রস্তুত ক'রে দিতাম। আমার ছোট বোন ঘাটে যেত।

তিনমাস পরে তিনি ফিরে এসে বি, এ, কলেজে ভর্তি হয়ে রবিবারে আমাদের বাসায় এলেন। আমি তাঁর কথামত ভাল সংবাদ শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছিলাম। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

পরের রবিবারে আমি জিজ্ঞাসাই করলাম—আপনি বাড়ী থেকে ফিরে এসে আমাকে ভাল সংবাদ শোনাবেন বলেছিলেন, তা শোনালেন না তো?

তিনি বললেন—আমি আই, এ, পাশ করেছি।

আমি হেসে বললাম—ও সংবাদ বাবার মুখেই শুনেছি। বাবা বলেছেন, আপনি খুব ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করেছেন। আপনি বলেছিলেন—বাড়ী থেকে ভাল সংবাদ এনে শোনাবেন।

না বাড়ী থেকে সংবাদ আনার কথা আমি বলিনি। তুমি একটু বাড়িয়ে বলছ।

তাঁর কথা শুনে ও মুখের গম্ভীর ভাব দেখে, আমার বুক ফেটে কান্না এল। তাড়াতাড়ি ঘর হ'তে বেরিয়ে গেলাম। তিনিও বিষন্ন মুখে চলে গেলেন।

তার পরের রবিবার হতে দু'বছরের মধ্যে একমাত্র পড়াশুনার কথা ছাড়া তাঁর সাথে আমার কোনো কথাই হত না। প্রতি রবিবারে ও সাধারণ ছুটির দিনে নিয়মিতভাবে এসে আমাকে পড়াতেন।

সেবার বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য দু'মাস আমাদের বাসায় আসেন নি। এর মধ্যে একদিন মার মুখে শুনলাম, আমার বিয়ের সম্বন্ধ

প্রায় স্থির হয়ে গেছে। বৈশাখ মাসের প্রথমেই পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করতে আসবে।

সংবাদ শুনে আমার বুক শুখিয়ে উঠল, দিনরাত বাবা বিশ্বনাথকে ডাকতে লাগলাম।

দিন দশেক পরে হঠাৎ একদিন বেলা প্রায় তিনটে বাজতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন?

প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেললাম। তারপর মনের আবেগ কতকটা শান্ত ক'রে নিয়ে বললাম—আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে।

দেখলাম আমাব কথা শুনে তাঁর মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ নীরব থেকে প্রশ্ন করলেন—আশীর্বাদ হযেছে?

না, আশীর্বাদ হয়নি। এই বৈশাখ মাসের প্রথম হবে।

আমার কথা শুনে তিনি হাত ধরে টেনে নিয়ে, মা'এর ঘরে উপস্থিত হ'লেন। শরীব অসুস্থ থাকায় বাবা সে দিন বাসায়ই ছিলেন। বাবা-মা'র সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন,—আমি গঙ্গাকে যে দিন প্রথম দেখেছি, সেই দিনই স্থির করেছি ওকে বিযে করব। সেবার ছুটিতে বাড়ী যেয়ে মাকে একথা বলেছিলাম। আমাদের এক ম্যানেজার মামা আছেন, তাঁরই পরামর্শে মা মত দেন নি। তখন আমি ছিলাম নাবালক, সে জন্য স্বাধীনভাবে কিছু করা সম্ভব হয় নি। এখন আমি সাবালক হয়েছি। আগামীকাল আপনাকে তিন হাজার টাকা দিয়ে যাব। বৈশাখ মাসের প্রথমেই বিয়ের দিন করুন। আজ দু'বছর যাবৎ আমার কলেজের বন্ধুরা জানে যে, আমি প্রতি রবিবারে আমার ভাবী স্ত্রীকে পড়াতে আসি। কাজেই এ বিয়েতে কোনও বাধা উপস্থিত হ'লে, তা দূর করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না।

এই বলে তিনি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

আশ্চর্য মানুষ! তিন বছরেব মধ্যে কোনো দিন ভাবে ভঙ্গীতেও তাঁব মনেব কথা প্রকাশ পায় নি। তখন বুঝলাম, ছ'বছব পূর্বে কি ভাল সংবাদ আমাকে শুনাতে চেযেছিলেন, কিন্তু পাবেন নি।

বিযে হযে গেল। তাঁব কলেজেব বহু ছাত্র-বন্ধু সাথে নিযে আমরা ফযজাবাদে বাড়ী গেলাম। পূর্বেই তিনি তাঁব ম্যানেজাব মামাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা কবাব নির্দেশ দিযে পত্র পাঠিযেছিলেন। অভ্যর্থনাব কোনো ত্রুটি হল না। শাশুডীও হাসিমুখে আমাকে ঘবে তুলে নিলেন। পাঁচ মাস আমাদেব পবম আনন্দে কেটে গেল। ঐ পাঁচ ম'স আমি স্বামীকে ছাড়া আব কিছুই লক্ষ্য কবি নি।

স্বামী ভালভাবে বি, এ, পাস কবেছেন, তখন এম, এ, পড়তে যাবেন। তাঁব সাথে কথা হল, আমিও সাথে যেযে বাবাব কাছে থাকব! কিন্তু শাশুডী বাদী হলেন। তিনি বললেন—এমন সোনাব চাঁদ বউ ছেড়ে তিনি থাকতে পাববেন না। তাঁব ছেলে কাশী যেযে একটা ভাল বাড়ী ভাড়া কবলে বউ নিযে তিনিও কাশীবাস কববেন।

স্বামী আমাব কাছে বিদায নিযে ঘব হ'তে বেব হতেই হোঁচট খেযে প'ড়ে গেলেন। ছুটে যেযে বুকে ক'বে তুললাম। তিনি হাসিমুখে বললেন—'কিছু লাগেনি'। লাগেনি বটে কিন্তু আমার বুক কাঁপতে লাগল। সাবা বাত ঘুম হল না।

প্রভাতে উঠে হাতমুখ ধুযে বসেছি। শাশুড়ী একগ্লাস দুধ নিয়ে এসে খেতে বললেন। দুধ খেলাম, স্বাদ ও গন্ধ কেমন যেন একটা ওষুধের মত।

দুধ খাওয়ার পর মাথা ঘুরতে লাগল। একবার বমি হল। তার পর এল জ্বব। সারারাত জ্বরের ঘোরে কেবল তাঁবই স্বপ্ন দেখলাম।

পরদিন প্রভাতে শাশুড়ী আবার দুধ নিযে এলেন। আমি খেতে অস্বীকার করলাম। শাশুড়ী গর্জন করে উঠলেন—খেতে হবে। বড়লোকের বউ হওয়ার সখ হয়েছে, আর দুধ খাবেন না! এই থাকল

দুধ, না খেলে আর কিছুই খেতে পাবে না।—এই বলে চলে গেলেন। আমি দুধ ফেলে দিলাম।

সারাদিন আর কেউ আমাকে দেখতে এল না, কোনো খাবারও পেলাম না। সন্ধ্যাবেলা কোনো প্রকারে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, আমার মহল হ'তে বেরনোর সব দরজা বার থেকে বন্ধ। ডেকেও কারও সাড়া পেলাম না। বুঝলাম, এরা আমাকে খুন ক'রবে। হতাশ হ'য়ে বিছানায় পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলাম।

কেঁদে রাত কেটে গেল। প্রভাতে আবার দুধ এল। দু'দিন কিছু খাই নি, কুঁজোর জল ফুরিয়ে গেছে, অসম্ভব তৃষ্ণা, খেলাম সেই বিষ-দুধ।

সারাদিন জ্বরের ঘোরে ছটফট্ করলাম। কেউ দেখতে এল না। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, কাশীর ঘাটে ছত্রীতে ব'সে মালা গাঁথছি। তিনি সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। মালা ভাল হল না। তবুও তিনি আমার মালা নেবেন। পরিয়ে দিতে গেলাম, মালা ছিঁড়ে গেল। ছেঁড়া মালা নিয়েই তিনি চলে গেলেন। দুঃখে কেঁদে ফেললাম।

কাঁদতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। অনুভব করলাম, চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে। চোখ মুছতে যেয়ে দেখি, হাত ওঠে না। নড়তে যেয়ে দেখি, শরীর নড়ে না। হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলাম, কিন্তু সে কান্নায় কোনো শব্দ হল না। বুঝলাম শরীর অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু দূরে মোরগের ডাক শুনতে পেলাম; চোখেও দেখছি।

প্রভাতে শাশুড়ী দুধ নিয়ে এল। আমি অসাড়ে প'ড়ে আছি দেখে কাছে এসে আমাকে দেখতে লাগল। কি সে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি! আমার হাত পা নেড়ে চেড়ে দেখে চলে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে এল তিনজন—শাশুড়ী মামাশ্বশুর, আর এক ডাক্তার। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বলল—সব ঠিক মতই 'হয়েছে। এখন একে এই অবস্থায় কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে, নচেৎ সন্দেহ উঠবে। আজই একজন বড় ডাক্তার ডাকুন, আর শিউপ্রসাদকে সংবাদ

দিন। বড ডাক্তাবেব সাথে আমি থাকব। কোনো ভয নেই। আমাব টাকা দিন।

শাশুডী টাকা এনে দিল। দেখলাম এক কচ শ' টাকাব নোট।

বড ডাক্তাব এলেন। তাঁকে বুঝানো হ'ল— ভয'নক জ্বব হযে বোগী অজ্ঞান হযে যায, তাব পব এই অবস্থা।

বড ডাক্তাব বক্ত পবীক্ষাব কথা বললেন। খুনে ডাক্তাব বক্ত নিল। বড ডাক্তাব চলে গেল, সে বক্ত ফেলে দিযে শাশুডীব গাযেব বক্ত নিযে গেল।

পবদিন স্বামী এসে আমাব বিছানায প'ডে হাহাকাব ক'বে কাঁদতে লাগলেন। আমাব নাম ধবে হাজাব বাব ডাকলেন। তাব অবস্থা দেখে আমাব অন্তব ফেটে যেতে লাগল।

বাত দুপুব পাব হযে গিযেছে। আমাব পাশে স্বামী ঘুমিযে পডেছেন। হঠাৎ আমাব শাশুডী এসে প্রথম ত'কে দেখলেন। তাবপব একটা শক্ত যন্ত্র দিযে আমাব মুখ ফাঁক কবে খানিকটা ওষুধ ঢেলে দিযে মুখ চেপে ধবলেন। আমি ঘুমিযে পডলাম।

ঘুম ভেঙ্গে দেখি, আমি আমাব খাটেব শিযবে দাঁডিযে আছি। আমার স্বামী একটি মেযেব বুকেব ওপবে হাত বেখে ঘুমোচ্ছেন।

চমকে উঠলাম! কে ঐ মেযেটি? এগিযে যেযে ভাল কবে দেখলাম—ও মেযেটা আমি। বুঝলাম, আমি মবে গেছি, ওটা আমাবই মৃতদেহ।

স্বামী জেগে আমাকে ডাকলেন। নাকেব কাছে হাত দিযে দেখে চিৎকাব করে কেঁদে উঠলেন। শাশুড়ী এসেও খুব কাঁদলেন। কাঁদা কাটায় দশদিন চলে গেল। শ্রাদ্ধ শেষ কবে স্বামী কাশী চললেন।

আমি স্বামীব সাথে যেতে নিলাম, পাবলাম না। এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে ঐ বাড়ীর মধ্যে ধরে রাখল। বাড়ীব মধ্যে আমি চলা-ফেবা করতে পারি, সব দেখতে পাই, সব শুনতে পাই; কিন্তু ঐ সীমানার বাইরে যাওয়ার শক্তি নেই।

এর পর এক বছর কেটে গেল, স্বামী বাড়ী এলেন না। শাশুড়ী আর মামাশ্বশুর-ম্যানেজারের কথাবার্তায় অনেক কিছু শুনলাম, অনেক কিছু বুঝলাম।

মামাশ্বশুর শাশুড়ীর কোনো আত্মীয় নন, ছেলে বেলা থেকে পরিচিত। সে পরিচয় বিয়ের পূর্বেই অবৈধ হয়ে ওঠে। আমার স্বামীর জন্মের পর বিষ খাইয়ে শ্বশুরকে মেরে ফেলে, ঐ লোকটা ম্যানেজার হয়ে বসেছে। শ্বশুর বহু নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। সে টাকা শাশুড়ীর হাতে ছিল। সব টাকা ঐ লোকটা আত্মসাৎ করেছে। এখনও টাকা না দিলে ও শাশুড়ীর ঘরে আসে না।

শাশুড়ীর টাকা গিয়েছে, গহনা গিয়েছে, বহু টাকা দেনা। এই দেনা শোধের উপায়—ধনী অযোধ্যাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান সুশীলার সাথে আমার স্বামীর বিয়ে।

সুশীলার সাথে আমাব স্বামীর ছেলেবেলা হতেই পরিচয ছিল। তাদের বাড়ী আমাদের পাড়ায। উভয়পক্ষে বিযের কথাবার্তাও বহুকাল ধরে চলছিল। তিনি বি, এ, পাশ ক'বে এলেই বিয়ে হবে। কিন্তু বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে আমাকে বিযে করে সাথে নিয়ে বাড়ী এলেন। শাশুড়ীর দেনা শোধের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তিনি প্রমাদ গনলেন। ওদিকে সুশীলা শয্যা নিল। সুশীলা আমার স্বামীকে সত্যিই ভালবাসে। সে পণ করল আর বিয়ে করবে না।

কথাছিল বিয়ে হলে সুশীলার বাবা অযোধ্যাপ্রসাদ সমস্ত দেনা শোধ ক'রে দেবেন। সে সুযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মহাজন টাকা আদায়ের জন্য চাপ দিতে লাগল। শাশুড়ী ও তাঁর ম্যানেজার পরামর্শ আঁটলেন, আমার মৃত্যু ঘটাতে পারলেই সুশীলার সাথে তাঁর বিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে, দেনাও শোধ হয়ে যাবে। ফলে আমাকে বিষ খাইয়ে খুন করা হল।

আমার মৃত্যুর পর এক বছরের মধ্যে তিনি বাড়ী এলেন না। শাশুড়ী বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। শেষে সুশীলার বাবা যেয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী এনে বিয়ে দিলেন।

বিয়ে হয়ে সুশীলা যে দিন আমাদেব বাড়ী এল, সে দিন তাকে প্রথম দেখেই আমার খুব ভাল লাগল। আমি বুঝলাম, সুশীলা আমার স্বামীকে সুখী করতে পারবে।

স্বামী একমাস পবে কাশী চলে গেলেন। সেদিন সুশীলার বাবা এসে তিন দিনের জন্য তাকে নিযে গেলেন। বাত্রে আমি শোবার ঘরে বসে আছি। আমার শাশুড়ী আর ম্যানেজার আলো নিযে ঘরে ঢুকে সুশীলার বাক্স খুলে, অনেকগুলো টাকাব নোট বের করে নিয়ে গেলেন।

তিন দিন পরে সুশীলা এসে বাক্স খুলে টাকা না দেখে কাঁদাকাটি করতে লাগল। শুনলাম পাঁচ হাজাব টাকা উধাও হযেছে।

চোরে টাকা নিযেছে বলে ক'দিন একটু হৈ চৈ হযে সব থেমে গেল। আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম, এবা তো আমার স্বামী ও সুশীলার সর্বনাশ ক'রবে! এখন আমি কি কবি?

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল—শুনেছি ভূতে মানুষকে আশ্রয করতে পাবে। আমিও তো ভূত হযেছি। এ অবস্থায সুশীলাকে আশ্রয় ক'রে আমার স্বামীকে সাবধান করি না কেন?

এরপর সামান্য চেষ্টাতেই সুশীলার মধ্যে আমি আবিষ্ট হ'যে গেলাম।

আবিষ্ট হ'যে এক নতুন ব্যাপার জানতে পারলাম। সুশীলা মুখে যে খাদ্য খায, তার স্বাদ আমি পাই। এর পূর্বে আমি সব দেখতে শুনতে পারতাম কিন্তু স্পর্শ কবতে পারতাম না, এখন সেটাও পারি।

সময়ে সময়ে শাশুড়ী কি ক'রছেন, তা দেখবার জন্য সুশীলাকে ছেড়ে যেতাম। আমি ছেড়ে গেলেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সুশীলার চিকিৎসা আরম্ভ হল। স্বামী সংবাদ পেয়ে বাড়ী এলেন। তাঁকে পেয়ে আমার মহানন্দ। এ অবস্থায় তাঁর স্পর্শসুখও আমি পাই।

যে উদ্দেশ্যে সুশীলায় আবিষ্ট হয়েছি, ভেবে দেখলাম সে উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব নয়। মায়ের ওপরে স্বামীর অগাধ শ্রদ্ধা। সে শ্রদ্ধা নষ্ট করতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে। খুঁজতে আরম্ভ করলাম, অন্য আর কি উপায় করা যায়।

ডাক্তার কবিরাজে যখন কিছু করতে পারল না, তখন আসতে লাগল ওঝা। ওঝারা আমার ধমক খেয়েই পালাতো। শেষে এলেন আমার পছন্দমত এক সাধু। তাঁকে নির্জনে সমস্ত কথা খুলে বললাম, এবং আমার স্বামী ও সুশীলাকে রক্ষা ক'রতে অনুরোধ করলাম।

তিনি সব শুনে বললেন—এ অবস্থায় কার্যকর কিছু করবার মত সামর্থ্য তাঁর নেই। তবে তিনি এমন লোকের সন্ধান দিতে পারেন, যিনি ইচ্ছা করলে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে সমর্থ।

তাঁর কথামত এ'রা আমাকে আপনার এখানে এনেছেন। আপনি দয়া ক'রে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে, ঐ দু'জনের হাত হতে আমার স্বামী ও সুশীলা রক্ষা পায়। আমার শাশুড়ী ও ঐ ম্যানেজার ঘটিত কেলেঙ্কারী এবং সুশীলায় আমার আবেশের কথা ঘুণাক্ষরেও আমার স্বামীকে জানাবেন না। স্বামী নিরাপদ হলেই আমি সুশীলাকে ছেড়ে যাব।

রোগীর সমস্ত কথা শুনে ফকির সাহেব শিউপ্রসাদের মা ও ম্যানেজারকে ঘরে ডেকে এনে বললেন—এই সুশীলায় তোমার ছেলের বউ গঙ্গা আবিষ্ট হয়ে আছে। তাকে তোমরা দু'জনে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছ। শিউপ্রসাদের বাবাকেও হত্যা করেছ। সুশীলার বাক্‌স থেকে পাঁচ হাজার টাকা চুরি করেছ। তোমাদের দু'জনের মধ্যে অবৈধ সম্বন্ধ আছে। গঙ্গা অতি ভাল মেয়ে, তাই তোমাদের কেলেঙ্কারী সকলের সম্মুখে প্রকাশ করে নি। সে আমাকে অনুরোধ করছে, তোমাদের দু'জনের খপ্পর হতে তার স্বামী ও সুশীলাকে বাঁচাতে।

ফকির সাহেব একটু থেমে লক্ষ্য করতে লাগলেন দু'জনের ওপরে তাঁর কথার প্রতিক্রিয়া। দেখাগেল দু'জনেই ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কাঁপছে।

ফকির আবার বলতে আরম্ভ করলেন—শোন ম্যানেজার সাহেব, তোমার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এইবার তোমাকে খোদার বিধানে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার পিছনে অতি কুৎসিৎ কুষ্ঠরোগ দাঁড়িয়ে আছে। এখন তোমার বয়স ছেচল্লিশ

বছর। এখন হতে আগামী আঠার বছর তুমি গলিতকুষ্ঠ রোগ ভোগ ক'রে মরবে।

তারপর শিউপ্রসাদের মাকে বললেন—তোমার পাপের কি দণ্ড যে খোদা দেবেন, তা আমি বুঝতে পারছি নে। এখন আমি যা বলি, তোমাকে তাই করতে হবে। যদি আমার কথার অবাধ্য হও, তবে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব। তুমি আর ফয়জাবাদে যেতে পারবে না। এখান হতেই তোমাকে হরিদ্বার অথবা বৃন্দাবন যেতে হবে। যতদিন বেঁচে থাকবে, সুশীলার ত্রিসীমানায়ও যাবে না।

ফকিরের কথা শুনে শিউপ্রসাদের মা যেন পাথর হ'যে গেলেন। ঘর হতে তাদের দুজনকে বের করে দিয়ে রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

কেমন, তোমার পছন্দমত ব্যবস্থা হয়েছে তো?

আজ্ঞা হাঁ, বেশ ভাল ব্যবস্থা করলেন। এখন একটা প্রশ্ন করব—জন্মান্তরে আমার স্বামীকে আমি পাব কি?

হাঁ মা, নিশ্চয়ই পাবে। তোমার পূর্বজন্মে কোনো পাপ ছিল, তাই এ জন্মে এতবড় দুঃখ পেলে। আর তোমাদের বিচ্ছেদ হবে না।

এখন তবে আপনি আমার স্বামীকে ঘরে আনুন। তিনি আমাকে কোলে করে বসে একটু আদর করুন। আপনারা দু'জনে আমার স্বামীর জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা জানান, যেন আমার স্বামী ও সুশীলা সুখী হয় আর আমার সদ্‌গতি হয়। আমি এখনই সুশীলাকে ছেড়ে যাব।

গঙ্গার কথামত ফকির সাহেব ব্যবস্থা করলেন। শিউপ্রসাদ রোগিণীকে কোলে করতেই সে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। বিস্মিত শিউপ্রসাদ তার গায় মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। ফকির সাহেব নামাজ আরম্ভ করলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সুশীলা শিউপ্রসাদের কোলে ঘুমিয়ে পড়ল।

আরও আধঘণ্টা নামাজ প'ড়ে যখন ফকির সাহেব আমার দিকে মুখ ফেরালেন, দেখলাম ফকির সাহেবের দু'চোখে ধারা গড়াচ্ছে।

ফকির সাহেবের কথা

সেদিন ফকির সাহেবের আস্তানা হ'তে ফেরার পথে ও মঠে এসে গঙ্গার কথাই মনে জাগতে লাগল। তিন দিন আগে সেই মুসলমান জাঠ মা ও মেয়ের লাঞ্ছনার কথা ভেবে উত্তেজিত হয়েছিলাম। তার সাথে এই গঙ্গার দুর্ভাগ্য তুলনা করে, আমার সেই জমিদার মনিবের উক্তি মনে পড়তে লাগল,—'এ জগতে অত্যাচার, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত—এ তিনটি চিরকাল আছে, চিরকালই থাকবে।'

ভারত স্বাধীন হলে ঐ জাঠ মেয়েদের ওপরে যে অত্যাচার চলছে তার হয়তো প্রতিকার হবে, কিন্তু এই গঙ্গার মত মেয়ের জীবনমুকুল অকালে ছিঁড়ে ফেলার মত মর্মান্তিক ঘটনার কি প্রতিকার সম্ভব? সমাজ, শিক্ষা, সভ্যতা, আইন, ধর্ম, কোনো কিছুই তো এ প্রকার ঘটনা বন্ধ করতে পারে না! অধিকন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, যাদের আমরা অসভ্য বলি, তাদের সমাজে গঙ্গার দুর্ভাগ্যের মত ঘটনা অতি বিরল। সভ্য ধনী সমাজেই এর প্রাচুর্য। এরই বা কারণ কি?

পরদিন অপরাহ্ণে আবার ফকির সাহেবের আস্তানায় গেলাম। ফকির সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। একটু অপেক্ষা করতেই তিনি এলেন! প্রথমেই শুনলাম সুশীলার বাবা শিউপ্রসাদের মাকে নিয়ে হরিদ্বার গিয়েছেন। আর সকলে ফয়জাবাদ গেছেন। ফকির সাহেব সুশীলার বাবাকে ঘটনাটা আভাসে বুঝিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। শিউপ্রসাদের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান এখন হ'তে সুশীলার বাবাই করবেন।

আস্তানার বর্ষাতি গাছের তলায় দু'জনে বসে প্রশ্ন করলাম—আপনি তো ভূত ছাড়ালেন, কিন্তু কোনো মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করতে তো দেখলাম না?

ফকির উত্তর দিলেন—যেগুলো অসচ্চরিত্র প্রেতাত্মা, সেইগুলো তাড়াতে মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োজন হয়। সচ্চরিত্র সাধু প্রকৃতির প্রেতাত্মা

দূব করতে ওসব প্রয়োজন হয় না, আব মন্ত্র-তন্ত্র তাদের ওপরে কার্যকরও হয না। গঙ্গা সতীসাধ্বী ভাল মেযে, মন্ত্র-তন্ত্র গঙ্গাব ওপরে ক্রিয়া ক'রবে না।

তা হলে কি আপনি বলতে চান—সচ্চবিত্র সাধু ব্যক্তিও মবে ভূত হয ?

হাঁ হয। ববং অসাধু অপেক্ষা একশ্রেণীব সাধুবাই বেশী প্রেতত্ব লাভ কবেন।

আপনি অদ্ভুত কথা শুনালেন। সাবাজীবন সদ্‌ভাবে থেকে বা সাধন ভজন ক'বে, শেষে ম'বে ভূত হযে শেওডাগাছে বসে থাকেন ?

আপনাব কথায অনেক দোষ হযে গেল। প্রথমত আপনাকে বুঝতে হবে, প্রেতত্ব লাভেব হেতু কি। তাবপব বুঝতে হবে, কোন শ্রেণীব সাধু ভূত হন। সাধু শব্দটি আমি বিশেষ অর্থে প্রযোগ ক'বেছি।

আপনি আমাকে বুঝিযে বলুন।

প্রেতত্ব লাভেব একমাত্র হেতু হচ্ছে, নিজেব চেষ্টা-যত্নে গড়ে তোলা কোনো বস্তুব প্রতি অতৃপ্ত ভোগবাসনাব তীব্র আকর্ষণ। এর প্রমাণ, গঙ্গাব প্রেত হওযার ব্যাপাব আপনি নিজেই দেখলেন। গঙ্গা কোনো অপকর্ম কবে নি। তথাপি তার স্বামী ও সংসাবেব প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাকে প্রেতত্ব দিযেছে।—

সাধারণত দেখা যায, যারা স্বভাব দুর্বৃত্ত স্বার্থপব, তাদেব এ সংসাবে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ওপবে বিশেষ আকর্ষণ থাকে না। সে জন্য তারা প্রাযই মরে ভূত হয না। সাধারণ গৃহস্থ যা কিছু ধন সম্পদ অর্জন করে, তা তাদের সন্তান সন্ততিরা ভোগ ক'রলেই তৃপ্ত হয। সে জন্য গৃহস্থদের মধ্যেও প্রেতত্ব লাভের যোগ্য ব্যক্তি অল্প। যারা হয় তারাও অল্পদিনের মধ্যেই এ দুর্ভোগ হতে মুক্ত হয়ে যায, কারণ তাদের আকর্ষণের বিষয় অল্পেই বিনষ্ট হয়।—

যারা সাধু সেজে সন্ন্যাসী বা ফকিরের বেশ ধ'রে আশ্রম বা আস্তানা করেন, তাঁরা প্রায়ই মৃত্যুর পর প্রেত হয়ে ঐ আশ্রম বা

আস্তানায় থেকে যান। আপনি অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন, বহু আশ্রম-আস্তানা-দরগায় যিনি সেবাইত থাকেন, তাঁর ওপরে দেবতার 'ভর' হয়, বা তিনি আদেশ প্রাপ্ত হন। এই উপায়ে ওষুধপত্র বিতরণ ক'রে ও লোকের শুভাশুভ ব'লে, বহু অর্থ প্রাপ্তি হয়। এই 'ভরকরা' বা 'আদেশ দাতা' দেবতা ঐ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা সাধুটির প্রেতাত্মা ছাড়া আর কেউ নয়। অনেক জায়গায় দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস হয়ে গেলেও সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরে ব'সে প্রতিষ্ঠাতার প্রেতাত্মা হাহাকার করছে।

আমি প্রশ্ন করলাম,—সাধু, সন্ন্যাসী, ফকিরদের আশ্রমেব ওপরে এত আকর্ষণ হওয়ার কারণ কি?

ফকির বললেন—দেখুন, মানুষ মানুষই। মানুষ তার স্বভাব কখনো ত্যাগ করতে পারে না। মানুষের স্বভাবই একটা অবলম্বন চায়, যাকে কেন্দ্র ক'রে সে তার কর্মশক্তি সার্থক করতে পারে। সংসারী মানুষ সংসারের মধ্যেই তার কর্মশক্তি নিয়োগ করে তৃপ্ত হয়। সংসারত্যাগী সাধু ফকিরদের মধ্যে যাঁরা সত্যই খোদার জন্য ব্যস্ত, তাঁদের আশ্রম বা আস্তানা করার মত প্রবৃত্তিই থাকেনা। কারণ তাঁদের সমস্ত শক্তি সেই খোদার জন্য নিযুক্ত থাকে। যদি কোনো ভক্ত আস্তানা ক'রে দেয়, তবে সেখানে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে থাকেন। যাঁরা নিজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা-যত্নে আস্তানা গড়ে তোলেন, তাঁদের ঐ আস্তানা, বা আশ্রমের ওপরে হয় অসাধারণ মমত্ব। গৃহস্থ তার বিষয় সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি অল্পেই সহ্যকরে নিতে পারে। কারণ, আজীবন তারা লাভ লোকসান নিয়ে ঘর করতে অভ্যস্ত। এই সমস্ত সাধু-ফকির কিন্তু তাঁদের আশ্রমের সামান্য ক্ষতিও সহ্য করতে পারেন না। সে ক্ষতি যদি তাঁদের জ্ঞাতসারে কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা হয়, তবে একেবারে বেসামাল হ'য়ে পড়েন। এইপ্রকার নিজহাতে গড়া আস্তানা বা আশ্রমের ওপরে অত্যধিক মমত্বের ফলে, মৃত্যুর পর প্রেতদেহ লাভ ক'রে, ঐ আস্তানায়ই থেকে যান। একটু চেষ্টা করলেই এই সমস্ত প্রেতাত্মা দেখা যায়। তাঁদের সাথে কথাও

বলা যায়। আমাদের ফকির সম্প্রদায় এই জন্যই কোথাও আস্তানা ক'রলে বেশীদিন সেখানে থাকেন না।

আমি প্রশ্ন করলাম,—অনেক সাধুসন্ন্যাসী আছেন, যাঁদের কোনো নিজস্ব আশ্রম নেই। তাঁদের মধ্যে কি কেউ প্রেতত্বলাভ করেন না ?

হ্যাঁ, করেন। যাঁরা নানারকমের মূল্যবান ভোগ্য পদার্থ ও টাকার বোঝা ঘাড়ে ক'রে, বা ব্যাঙ্কের পাশ বই ঝোলায় পুরে ঘুরে বেড়ান, তাঁদেরও প্রেতত্ব লাভের যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। আসল কথা হচ্ছে—এ জগতের কোনো বস্তুর প্রতি অত্যধিক আসক্তিই প্রেতত্ব লাভের হেতু।

আশ্রম, মঠ, আখড়া, আস্তানা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা বহু সাধুসন্ন্যাসীর মৃত্যুকালের কথা আমি শুনেছি। যা শুনেছি, তাতে তো তাঁরা ভগবানের নাম করতে করতে সজ্ঞানেই দেহত্যাগ করেন।

শুনেছেন বটে, তবে তা শুনেছেন সেই সাধু-সন্ন্যাসীর শিষ্য বা ভক্তদের মুখে। নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী কারও মুখে শোনেন নি।

আচ্ছা, এই সুশীলাকে ছেড়ে যাওয়ার পর গঙ্গার কি অবস্থা হয়েছে, তা বলতে পারেন ?

আমার মনে হয় গঙ্গার প্রেতত্ব দূর হয়েছে।

এটা আপনি কি করে বুঝলেন ?

বুঝলাম কয়েকটা ঘটনায়। গঙ্গা বেশ বুঝেছে যে, এই অবস্থায় তার পক্ষে স্বামীকে নিয়ে প্রকৃত সুখী হওয়া সম্ভব নয়। তার স্বামীও সুখী হবে না। তারপর একটা দারুণ আশঙ্কা ছিল স্বামীর অনিষ্ট হচ্ছে দেখে। শিউপ্রসাদের মা ও ম্যানেজারের যে ব্যবস্থা করা হল, তাতে সে ভয় দূর হয়েছে। এখন আর তার এই অবস্থায় থাকতে কোনো ইচ্ছা নেই। সে যখন সুশীলাকে ছেড়ে গেল, তখন সুশীলা ঘুমিয়ে পড়ল। ভূত ছেড়ে গেলে রোগীর এরকম ঘুম আসে না। ভূত ছেড়ে যাওয়ার সময় রোগী চিৎকার ক'রে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে, দাঁত লেগে মুখে ফেনা ওঠে। সুশীলার ও সব কিছুই হয় নি। এই সব কারণেই আমার মনে হয়, সুশীলাকে ছাড়ার সাথে সাথে গঙ্গার প্রেতত্ব নাশ হয়েছে।

আপনি অতি মহৎ সাধু। আজ যদি আমার এই সন্ন্যাসীর বেশ না থাকত, তবে আপনার পায়ের ধূলো নিতাম। এখন আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রেতত্ব দূর হওয়ার পর গঙ্গার আত্মার কি অবস্থা হল,—জানতে চাই।

ঐ অবস্থাকে 'স্বপ্নাবস্থা' বলা হয়। এ বিষয়ে আপনাকে ভালভাবে বুঝাতে পারবেন, যে মঠে আপনি আছেন সেই মঠের মহান্ত মহারাজ।

আপনারা কি আমাদের শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন ?

আমাদের ফকির সম্প্রদায় যুক্তিবাদী। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে, সেটি উপলব্ধির জন্য সাধনপদ্ধতি দেখিয়ে দিলে, ফকিরেরা সাধন করে উপলব্ধি করার পর শাস্ত্র সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, নচেৎ করেন না।

* * *

ফকিরকে আমার খুবই ভাল লেগেছে। পরদিন আবার আস্তানায় গেলাম। গাছতলায় দুজন আরাম ক'রে বসে প্রশ্ন করলাম।—

আপনি সেদিন বলেছিলেন—এমন একটা দিন আসবে যখন ভারতের মুসলমানদের নিজপ্রয়োজনেই হিন্দুদের সাথে আন্তরিকভাবে মিশতে হবে।' কথাটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

ফকির সাহেব বলতে আরম্ভ ক'রলেন।

মুসলমান ধর্মগ্রহণের পর দুর্ধর্ষ আরবজাতি বহুদেশ জয় ক'রে, সে সব দেশের সমগ্র অধিবাসীকে ইসলাম কবুল করিয়েছে। কিন্তু ভারতে তা সম্ভব হয় নি; এমন কি কোনো মুসলমান সম্রাট চেষ্টা করেও নিজ সাম্রাজ্যে মুসলীম 'সরিয়ৎ' অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেন নি। ভারতে মুসলীম শাসনের প্রথমদিকে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলিজী তাঁর সাম্রাজ্যে হিন্দুদের শাসন ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য মক্কা হ'তে দু'জন বড় আলেম এনেছিলেন। তাঁরা মুসলীম রাজ্যে হিন্দু প্রজাদের অধিকার ও শাসন সংরক্ষণ সম্পর্কে যে ব্যবস্থা দিলেন, তা সম্রাট অনুসরণ করতে পারেন নি। সম্রাট বুঝেছিলেন যে

সরিয়তের ঐ সমস্ত বিধান হিন্দুপ্রজাদের ওপরে চাপাতে গেলে সাম্রাজ্য টিকবে না।

সম্রাট আকবর অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি হিন্দুদের দোষগুণ বিচার ক'রে দেখে বুঝেছিলেন—ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টা না হলে মোগল সাম্রাজ্য স্থায়ী হবে না, সাম্রাজ্যের উন্নতিও অসম্ভব। এ জন্য আকবর যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, সেই নীতির ফলে সাজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সবদিক থেকে বেশ একটা মিলন হয়েছিল। ঐ সময়ের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হিন্দুরাজার সাথে মুসলমান রাজার যুদ্ধে উভয়পক্ষেই হিন্দু মুসলমান সেনাপতি ও সৈন্য যুদ্ধ করেছেন। মুসলমান মুসলমানের পক্ষে, আর হিন্দু হিন্দুর পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেন নি। উভয় পক্ষেরই লক্ষ্য ছিল, জন্মভূমির স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করা।—

আওরঙ্গজেব সম্রাট হয়ে মাত্র কয়েকটি মুসলীম সরিয়তী ব্যবস্থা বিধর্মী হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে আকবর-জাহাঙ্গীর-সাজাহানের সাধনা হিন্দুমুসলমানের মিলন পর্বতে বিরাট ফাটল সৃষ্টি করলেন। সে ফাটলে তলিয়ে গেল মোগল সাম্রাজ্য। ফাটলের দু'পাশে দুই পা রেখে দাঁড়াল এসে বণিক ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদের পায়ের চাপে ফাটলটা এখন এত বড় হয়েছে যে, দুপক্ষের একে অপরের কথা ভালভাবে শুনতে পাচ্ছে না, বুঝতেও পারছে না। এই অবস্থাটা বিপজ্জনক। বিশেষ করে মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।—

আমার মনে হয় ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিন নিকটবর্তী হয়েছে। এই স্বাধীনতা লাভের সময় ও পরে কি যে ঘটবে, তা চিন্তা করে সময় সময় ব্যাকুল হয়ে পড়ি। গত মহাযুদ্ধে (প্রথম মহাযুদ্ধে) বিজাতীয় মনোভাব সম্পন্ন ইহুদীদের চক্রান্তে জার্মান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। হিটলার দেশের কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে ইহুদী সম্প্রদায়টাকেই 'কুইসলিং' নাম দিয়ে জার্মানদেশ হতে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। হয়তো শেষ

পর্যন্ত একটি ইহুদীও জার্মানীতে থাকবে না। ভারতে যদি এপ্রকার ঘটে তবে সর্বনাশ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—তাহ'লে এখন আমাদের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

আমি যা বুঝেছি তাতে বর্তমানে মুসলমানদের কিছু বলে লাভ নেই। মুসলমানদের পৃথক স্বার্থের মোহ এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, কোনও মুসলমান নেতা বিনাসর্তে হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা বললে তিনি মুসলমানদের চোখে নেতা ব'লে গণ্য হন না। হিন্দুদের আমি বলতে চাই—যে কোনো শিক্ষিত মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিলেই তাঁরা তাকে মাথায় তুলে যে নাচানাচি করেন, ওটা বন্ধ করতে হবে। তাঁদের বোঝা উচিৎ এযাবৎ বহু মুসলমান—যাদের কোনো প্রতিষ্ঠাই ছিলনা, তাঁরা কংগ্রেসে ঢুকে পরে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের সম্মানিত সাম্প্রদায়িক নেতা হয়েছেন। কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবির সাথে আপোষ আলোচনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে হবে। তাতে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন যদি পিছিয়ে যায়, তো যাক। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যদি বাধে, তো বাধুক। তথাপি সাম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবাদ মেনে নেওয়া হবে না। মনে রাখতে হবে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান এই দু'টি মাত্র সম্প্রদায়ই বাস করে না। এ ছাড়া আরও বহু সম্প্রদায় আছে।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কি করা উচিত হবে?

স্বাধীন ভারত সরকারের প্রধান কর্তব্য হবে, কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ যাতে মাথা তুলতে না পারে, তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যারা একবার সাম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবাদের নেতৃত্ব করেছে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের সম্পূর্ণ বর্জন করে, তাদের কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। যতদিন পর্যন্ত ভারতে সাম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবাদের নামগন্ধও থাকবে, ততদিন কোনো শক্তিশালী বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর গঠনমূলক কাজ কি করা উচিৎ, সে বিষয়ে আপনার মুখে কিছু শুনতে চাই?

ভারতে বহু ধর্ম ও সম্প্রদায় আছে। এইগুলি সমস্বার্থে এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত করাই হবে বড় কাজ। হিন্দুদের মধ্যে যেমন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি বহু ভেদ থাকা সত্বেও তারা এক হিন্দু জাতি; ঠিক এই আদর্শেই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সব একজাতি। সে জাতির নাম হবে মহান্ ভারত জাতি। তাদের মধ্যে থাকবে না কোনো স্বার্থের বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। এই যদি সম্ভব হয়, তবে আর সমস্ত উন্নতি সহজ হয়ে যাবে। এর জন্য প্রয়োজন অসাম্প্রদায়িক উচ্চশিক্ষা, ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগতে পারে এমন সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন ভারতের বুক হ'তে নিঃশেষে মুছে ফেলা। এই জন্যই আপনার সাথে প্রথম সাক্ষাতের দিন কাশী বিশ্বনাথের মন্দির, প্রভৃতির মসজিদ সেজে থাকার বিপদের কথা বলেছিলাম।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় যদি সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া পার্শ্ববর্তী মুসলীম রাষ্ট্রে কেমন হবে?

আমি গত চারবছর পশ্চিমের সমস্ত মুসলীম রাজ্যগুলি ঘুরে তিন মাস হল দেশে ফিরেছি। আমি যা বুঝে এসেছি, তাতে ঐ সমস্ত দেশের জনসাধারণ ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। তার কারণ, ঐ সমস্ত দেশে বৃটিশস্বার্থ সুদৃঢ় রাখার জন্য ইংরেজ ভারতীয় মুসলমান সৈন্য তাদের ঘাঁটিগুলিতে মোতায়েন রাখে। ও সব দেশে ভারতীয় হিন্দুদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। যদি সে প্রকার দুর্দিন সত্যই আসে, তবে তার প্রতিক্রিয়া ঐ সমস্ত রাষ্ট্রে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যাবে না।

আপনি ও আপনাদের ফকির সম্প্রদায় হিন্দুমুসলমানে মিলন ঘটাতে চেষ্টা করুন না কেন?

সে চেষ্টা আমরা সম্রাট আকবরের সময় হতেই করে আসছি। বর্তমানে মুসলমান সমাজে আকবর হয়েছেন 'কাফের,' আর আওরঙ্গজেব

হয়েছেন 'গাজী'। মুসলমান মোল্লা-মৌলবিরা আমাদের ফকির সম্প্রদায়টিকে মুসলমান বলে স্বীকার করতেই অনিচ্ছুক। আজই পত্র পেলাম, জৌনপুরে পীরসাহেবের দরগায় কয়েকজন মৌলবি কতকগুলি স্কুল-কলেজের ছাত্র নিয়ে হাঙ্গামা করছে। আগামীকাল জৌনপুর যাব। দেখি ছেলেগুলোকে বুঝিয়ে কিছু করতে পারি কিনা।

* * *

ফকির সাহেবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে মঠে এসে কথাগুলি সব লিখে রাখলাম। ফকির সাহেবের নাম আলম ফকির। সারা উত্তর ভারতেই তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। তাঁর সাথে আমার আর দেখা হয় নি। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আজমীড়-সরিফে তাঁর খোঁজ করে জানতে পাই, তিনি ১৯৪৭-এর হত্যাকাণ্ডের সময় লাহোরে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা থামাতে যেয়ে নিহত হয়েছেন।

বাংলার হিন্দু মুসলমান।

ফকির সাহেব চলে গেলে তাঁর অভাবটা মনে বড়ই লেগেছিল। মাত্র পাঁচ দিনের আলাপ পরিচয়, কিন্তু তাতেই তিনি আমার আপন জন হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গগুণে পূর্বের সেই মানসিক অশান্তিটাও অনেকটা শান্ত হয়ে ভাবতে আরম্ভ করলাম, হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা।

ফরিদপুর জেলার পল্লী পাংসা আমার জন্মস্থান। জ্ঞান হয়ে দেখে এসেছি মুসলমানদের সাথে আমাদের মেলামেশা। সে মেলামেশায়

যেটুকু ভেদ সেটুকু কোনো সময়ে মনের ওপরে রেখাপাত করত না। আমাদের জমির বর্গাদার হিন্দু ও মুসলমান এসে বৈঠকখানায় বসত বেঞ্চে বা চট পেতে। খানসাহেব চৌধুরীসাহেবরা এসে বসতেন ফরাসে চৌধুরীসাহেব খানসাহেবদের বাড়ীতে যেয়েও দেখেছি, ঐ একই ব্যবস্থা। আভিজাত্যের পার্থক্য সব ধর্মেই সমান।

প্রথম পড়াশুনা আরম্ভে কাদের মিঞা ছিলেন আমার গৃহশিক্ষক। তাঁর হাতে যথেষ্ট মার, কানমলা খেয়েছি। তিনি মেরে কানমলে শিক্ষার যে বনিয়াদ গেঁথে দিয়েছিলেন, তাব ওপরে আর কিছু গাঁথতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠে শিক্ষক পেলাম ইয়াকুব আলী চৌধুরী। তিনি যেমন সুন্দব পড়াতেন, তেমনি আমার অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগাতে চেষ্টা করতেন। চৌধুরী সাহেবই প্রথম হাতে লিখে দ্বিজেন রায়ের —'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ'—গান আমাকে দিয়ে মুখস্ত করিয়েছিলেন।

আমি মহানন্দ ব্রহ্মচারীব সাথে ঢাকা গিয়েছিলাম শুনে, চৌধুরী সাহেব ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে বহু তিরস্কার করেছিলেন। এক বংসের এক ছেলে, তাবপর বিয়ে করেছি, এ অবস্থায় ও সব দলের সাথে মেলামেশা উচিৎ নয়। মহানন্দ ব্রহ্মচারীকেও মাস্টারসাহেব কড়া কথা শুনেয়েছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমার এক সহপাঠীর সাথে পূজার ছুটিতে বিক্রমপুর যাই। সাথে ছিলেন বন্ধুর বাবা, মা, অনেকে। গোয়ালন্দ ঘাট হয়ে ষ্টীমারে বেলা দশটায় তারপাশা পৌছলাম। ষ্টীমার হতে নামতেই বহু নৌকার মাঝি এসে ঘিরে ধরল। এমন সময় এক মাঝি এসে সকলকে ধমক দিয়ে বলল,—তোরা সরে যা, ইনি আমাদের গাঁয়ের বাবু।

গাঁয়ের বাবুকে আর কিছুই বলতে বা করতে হল না। গাঁয়ের মাঝি দু'জন সব মালপত্র যত্ন করে নৌকায় তুলে কাকীমা ও দিদিমণিদের সাবধানে তুলে নিল।

আমরা সকলে নৌকায় উঠলে নৌকা ছাড়তে যেয়ে মাঝি বলল,—বাবু, দু'টো টাকা দিন তো, মাছ নিয়ে আসি। একখান চাঁদিজালের নৌকা ঘাটে ভিড়ল! তাজা ইলিস পাওয়া যাবে।

কর্তাবাবু টাকা দিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে দু'টা তাজা বড ইলিস নিয়ে ফিরে এসে মাঝি আট আনা ফেরৎ দিল।

বাড়ী পৌছতে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগল। সারা পথ মাঝি আর কর্তাবাবু আলাপ করলেন—গ্রামে কে কেমন আছে, কার ছেলেমেযের কোথায বিয়ে হয়েছে, তাদের কুটুম্ব কেমন, বিযের খরচপত্র কেমন হল, কে মরেছে, কার ছেলে হয়েছে, কে কার সাথে মামলা বাধিযেছে, কার ব্যবসা কেমন চলছে, পূজোয এবার কোন বাড়ী কেমন আযোজন চলেছে।'—মাঝি সব জানে।

বাড়ীর ঘাটে এসে কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন,—

কত দেব করিম ভাই?

বাবু, এপর্যন্ত ছেলে মেযেদের পূজোর কাপড় কিনতে পারি নি। বউটা ভাদ্রমাসে অসুখে পড়ে দেনা বাধিযে দিয়েছে।

কর্তাবাবু একখানা দশ টাকাব নোট দিলেন। ভাড়াব বেট কিন্তু দেড় টাকা। নোটখানা ও দু'টো ইলিস মাছ নিয়ে সেলাম কবে করিম মাঝি চলে গেল। লক্ষ্য কবে দেখলাম। গ্রামের কর্তাবাবুরা বহুদিন পরে পূজার ছুটিতে বাড়ী এলে তাঁদের ওপরে করিম মাঝির মত গ্রামের শ্রমজীবীদের দাবী যেমন সবল ও স্বাভাবিক, দাবী পূরণও তেমনি স্বাভাবিক ও সরল। মাছ দু'টো যে নিয়ে গেল, তার জন্য করিম মাঝি একবার জিজ্ঞাসাও করল না—কটা নেব, বা কোন দু'টো নেব। সবই যেন নিজের মত পূর্বেই ঠিক করা আছে।

আমার বন্ধুর বাবা বেশ অবস্থাপন্ন। বাড়ীতে পূজা হয়। আমরা এসেছি শুনে বন্ধুর গ্রামের স্কুলের বহু সহপাঠী হিন্দু-মুসলমান ছেলে এসে আড্ডা জমাল। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বন্ধুই বেশী। পূজার দু'রাত হবে কবিগান, এক রাত হবে থিয়েটার। লক্ষ্মীপূজোর রাতেও

থিয়েটার হবে। অভিনেতারা বেশীর ভাগই মুসলমান। বই হবে 'বভ্রুবাহন' আর 'সাজাহান'।

সারাদিন আড্ডা চলে। বিকালে ঘণ্টা দুই হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের বাড়ী ঘোরা, আর খালে ধানের মাঠে নৌকায় বাইচ খেলা, রাত্রে হয় রিহার্সেল।

মুসলমান বন্ধুরা দিনে দু'একবার বাড়ী ঘুরে আসে, রাত্রে বড় কেউ যায় না। চার বেলা খাওয়া আমার বন্ধুর বাড়ীতেই হয়, সেজন্য বন্ধুর বাবা বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন।

সপ্তমী ও নবমীর রাত্রে হল কবি-গান। দুই দল কবির পাল্লা চলল। দু'দলই মুসলমান। কবির সরকার আসরে এসে প্রথমে চমৎকার ছড়াকেটে মুর্শীদ, শিব দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, পীর, পয়গম্বরের বন্দনা করে কবি আরম্ভ করলেন। পালার বিষয়বস্তু প্রায় সবই হিন্দুর পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী ও সিদ্ধান্ত। শ্রোতা চোদ্দআনাই মুসলমান।

বিজয়ার পরদিন হতে লক্ষ্মী পূর্ণিমা পর্যন্ত চলল বিজয়ার কোলাকুলি। বহু মিঞাসাহেব, খাঁসাহেব, সদাগরসাহেব এসে কর্তাবাবুর সাথে কোলাকুলি করে লুচি, হালুয়া, নারকেল নাড়ু খেয়ে গেলেন। আমরা আমাদের মুসলমান বন্ধুদের বাড়ী যেয়ে অমৃতসাগর কলা, আনারস, নারকেল, মোয়া-মুড়কি খেয়ে বিজয়া করলাম।

বিদায়ের দিন মুসলমান বন্ধুরা আমাদের সাথে এলেন তারপাশা। ষ্টীমারে উঠে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, করিম মাঝি ও আমাদের মুসলমান বন্ধুরা বেদনা ভরা চোখে আমাদের বিদায় দিচ্ছে।

আজ কোথায় গেল সে মধুর বাংলা! আমরা বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান এমন কি পাপ করেছিলাম, যার জন্য এমন মধু বিষ হয়ে বাঙ্গালীর বুকে এত বড় হাহাকার তুলেছে !! এত চোখের জল পড়ছে !!! এর কি কোনো প্রতিকার নেই? ভগবান নাকি ক্ষমা-সুন্দর !!!

কুরুক্ষেত্র।

ফকির যাওয়ার পর ক'দিন আর ও দিকে বেড়াতে যাই নে, যাই কুরুক্ষেত্রে। থানেশ্বর মঠ হতে কুরুক্ষেত্র দু'মাইলের বেশী।

শীত এসে পড়েছে। পাঞ্জাবী শীত। আমাদের মত বাঙ্গালীর সন্ধ্যা লাগতেই ঘরে ঢুকতে হয়। যে দিন বেড়াতে যাই, সে দিন আর মঠের অপরাহ্ন সভায় যোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

ছেলেবেলা থেকেই স্বভাব হয়েছে, কোনো কিছুই একঘেয়ে ভাল লাগে না। মঠের সভায় প্রতিদিনই নতুন নতুন বিষয় আলোচনা হয়, কিন্তু তাতে আমার প্রয়োজনবোধ না থাকায় আগ্রহের অভাব। যা শুনি তাও মনে থাকে না।

ধর্মকথা শোনার ব্যাপারে এ অবস্থা যে কেবল আমার, তা মনে করার কোনো হেতু নেই, আর সেজন্য আমার লজ্জাও নেই। শ্রীধাম বৃন্দাবন, কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থস্থানে শ্রীমদভাগবত পাঠ-সভায় বহু ভক্ত শ্রোতার সমাবেশ হয়। সেই সব শ্রোতাভক্তদের সাথে আলাপ করে যা বুঝেছি, তা একটা গল্পে বুঝাই।—

এক পাঠকের সভায় পাঠ শুনতে আসেন এক বৃদ্ধা। একদিন তিনি তাঁর পুত্রবধূকে পাঠ শোনাতে সাথে এনেছেন। সেদিন পাঠের বিষয় ছিল 'সুরভীমাহাত্ম্য'। সুরভী স্বর্গীয় গাই। পাঠক ব্যাখ্যা করে বুঝালেন,—সুরভীর সর্বাঙ্গে তেত্রিশকোটি দেবতা বাস করেন। তাঁর লেজে অনন্তনাগ, পিঠে শিব-দুর্গা, ককুদে লক্ষ্মীনারায়ণ, দুই শিঙে রুদ্র ও অগ্নি, দুই চোখে চন্দ্র ও সূর্য—এই রকম সারা গায়ে সব ঠাকুর।

পাঠক শেষে শুনালেন—এই যে আমাদের সব গরু দেখেন, এঁরা সুরভীর বংশধর। এঁদের সেবা করলে সব দেবতার সেবা করা হয়, সব দেবতা সন্তুষ্ট হন। অতএব আপনারা সকলে কায়মনোবাক্যে গো সেবা করুন। গো সেবা দেব-দেবতা পূজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

পাঠ শেষ হলে বৃদ্ধা ও তাঁর পুত্রবধু পাঠককে প্রণাম করে গেলেন বাড়ী। তার পরেরদিন বৃদ্ধা গিয়েছেন গঙ্গায় স্নান করতে। বাড়ীর উঠানে রোদে দেওয়া ছিল পিঠে করার জন্য চালের গুঁড়া, ডাল, অনেক কিছু। একটা হৃষ্টপুষ্ট গাই বাড়ীতে ঢুকে উঠানের সেগুলো খেতে আরম্ভ করল। বউটি ব্যাপার দেখে পরমানন্দে ঘর হতে ধূপ-ধুনা, প্রদীপ জ্বেলে এনে গাইটার সম্মুখে রেখে, এক গামলা জল দিয়ে, ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে জোড় হাতে বসে থাকলেন।

এমন সময় বৃদ্ধা গঙ্গা-স্নান সেরে বাড়ী এসে ব্যাপার দেখে অবাক! বার দরজা বন্ধ কারর যে কাঠখানা ছিল, তাই নিয়ে বসিয়ে দিলেন সুরভী দেবীর পিঠে এক ঘা।

পুত্রবধূ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন,—করলেন কি! করলেন কি! একেবারে সর্বনাশ করে ফেললেন! আমরা একটা দেবতা পূজো করে ভোগ দিতে কত টাকা খরচ করি। আর এই মা সুরভীর দেহে বসে তেত্রিশ কোটি দেবতা সেবা নিচ্ছিলেন, আপনি কিনা তাঁকে মারলেন !!

পুত্রবধুর কথা শুনে বৃদ্ধা একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন,—আঃ রে আমার পোড়া কপাল! তুই ঐ হাভাতে পাঠকের কথাগুলো আবার বাড়ী পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এসেছিস! তা তোরই বা দোষ কি, দোষ আমার। তোকে পাঠ শুনতে নিয়ে গেলাম, কিন্তু মনের ভুলে ফেরার মন্তরটা শিখিয়ে দেইনি। পাঠ শেষ হলে প্রণাম করে বলতে হয়—ঠাকুর, যা এখানে শুনলাম, তা তোমাকেই নিবেদন করে দিয়ে কেবল পূণ্যিটুকু নিয়ে যাচ্ছি। তোমার কথাগুলো যেন সাথে যেয়ে বাড়ীতে কাজে কর্মে গণ্ডগোল না বাধায়।

এই বৃদ্ধার পাঠ শোনার মত আমরা অনেকেই ধর্মোপদেশ শুনি, কিন্তু প্রায় কিছুই মনে রাখি নে। কারণ—ও সব উপদেশে কোনো প্রয়োজন বোধের অভাব।

অনেকের বলতে শুনি,—সাধন-ভজন, মন্ত্রজপ, পূজা-অর্চনা নিয়ে

তো বসি, কিন্তু মন এত চঞ্চল হয় যে, কিছুতেই একাগ্রতা আসে না। এর উপায় কি বলুন তো ?

এ প্রশ্নের সোজা উত্তর—ভজন সাধনে প্রয়োজন বোধ নেই, কাজেই মন বসে না। সংসারে টাকার প্রয়োজন আমাদের সকলেরই আছে। টাকা উপার্জনের জন্য যে যে কাজ করি, তাতেই বেশ মনের একাগ্রতা আসে। যখন ভগবান প্রয়োজনীয় বস্তু হবেন, তখন ভজন সাধনে একাগ্রতা আসবে।

আমার ভগবানে কোনো প্রয়োজন বোধ নেই, সে জন্য মহাজ্ঞানী মহান্ত মহারাজের অমন সুন্দর শাস্ত্রালোচনায় মন বসে না। মাঝে মাঝে সভায় যোগ দিই। প্রায়ই বিকালে ঘুরে বেড়াই থানেশ্বর-তিরৌণী কুরুক্ষেত্রের ঐতিহাসিক মাঠে মাঠে।

থানেশ্বর, তিরৌণীর যুদ্ধক্ষেত্র ও থানেশ্বরের প্রাচীন মন্দির মনে যে উত্তেজনা জাগিয়েছিল, তার দোষগুলি ফকিরের সঙ্গগুণে দূর হয়েছে। মন আবার খুঁজছে নতুন কিছু। কুরুক্ষেত্রে সে নতুনের অভাব কিছুটা মিটল।

মহাভারতের মহারাজা কুরু যে স্থানে এক শ' অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, সেই অঞ্চলটার নাম কুরুক্ষেত্র। সেই যজ্ঞ-কুণ্ড এখনও আছে, প্রায় চার শ' গজ দীর্ঘ, দু'শ' গজ প্রস্থ একটা দিঘির মত, চারধারে পাথর দিয়ে বাঁধানো গ্যালারী। এই গ্যালারীর ধাপে বসে দর্শনার্থীরা যজ্ঞ দেখতেন।

আমার যতটুকু জানা আছে তাতে পৃথিবীতে কুরুক্ষেত্রের এই যজ্ঞকুণ্ড অপেক্ষা প্রাচীন ও বড় গ্যালারী বা 'স্টেডিয়াম' আর নেই। খুব কম করে হিসাব করলেও এই যজ্ঞকুণ্ডের নির্মাণকাল চার হাজার বছর পূর্বে হবে। অশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশের ভ্রমণকারীরা রোমের 'কলোসিয়াম' দেখে তার কোষ্ঠী বিচারে পঞ্চমুখ। কিন্তু নিজের দেশের এই অপূর্ব কীর্তি সম্পর্কে সে রকম কোনো তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ এ পর্যন্ত (১৯৫৯) আমার চোখে পড়েনি।

যজ্ঞকুণ্ডে পূব ও দক্ষিণের গ্যালারী এখন আর নেই। উত্তর পশ্চিমে লাল পাথরে বাঁধানো গ্যালারী এখনও অটুট আছে। দিঘির মত যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যস্থলে প্রায় চার বিঘা পরিমাণ উঁচু জমি যজ্ঞবেদী। এই যজ্ঞবেদীর ওপরে এখন হরিতকী, আমলকী, প্রভৃতি গাছের তলায় একটা ছোট শিবমন্দির আর সাধু সন্ন্যাসীদের বাসের জন্য কয়েকখানা পাকা কুঠি আছে। এই যজ্ঞবেদী ছাড়া দিঘির মত যজ্ঞক্ষেত্রটা দু'তিন ফুট গভীর জল, আর জলজ ঘাসে ভরা। বর্ষাকালে জল আরও বেশী হয়।

যজ্ঞবেদীতে যাতায়াতের জন্য উত্তর দিকে পাথরের খিলান করে গাঁথা পুলের মত রাস্তা আছে। এই রাস্তাটা অবশ্য পরবর্তীকালে প্রস্তুত হয়েছে। শোনা যায়, এই পথটা মহারাজা জন্মেজয় নির্মাণ করেছিলেন।

উত্তর ধারে 'গীতাভবন' নামে একটা সুন্দর প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে। গীতাভবনের সম্পাদকের সাথে আলাপ করে শুনলাম, পৃথিবীর যেখানে যত গীতা, গীতার অনুবাদ, টীকা, টিপ্পনী, ও সমালোচনা ছাপা হয়েছে বা হচ্ছে, তা সংগ্রহ করে এখানে রাখার ব্যবস্থা করাই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। কাশীধামের প্রাতঃস্মরণীয় মদনমোহন মালব্য, কলকাতার আশুতোষ মুখার্জী, প্রভৃতি সর্বভারতীয় সুধীবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটির উদ্‌যোক্তা। আর রাজা জমিদার ধনীরা পৃষ্ঠপোষক।

যজ্ঞক্ষেত্র হতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটা টিলার মত উঁচু জায়গা 'জ্যোতীশ্বর'। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই টিলার ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর সখা পাণ্ডব-সেনাপতি অর্জুনকে কৌরবপক্ষের সৈন্যসমাবেশ দেখিয়েছিলেন, এবং ভীত অর্জুনকে গীতা উপদেশ করেছিলেন।

জ্যোতীশ্বরের দু'মাইল দক্ষিণে কর্ণবধের স্থান। স্থানটি দেখলেই বোঝা যায়, কর্ণের রথচক্র পৃথিবী কি প্রকারে গ্রাস করেছিলেন। ঐখানে টাঙ্গাগাড়ী যেতে চায়না, স্থানটা বালিয়াড়ী। কৌশলী শ্রীকৃষ্ণ

মহাবীর কর্ণকে এই বালিয়াড়ীতে এনে তাঁর রথ অচল ক'রে অর্জুনকে কর্ণবধের সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। এখান হতে তিন মাইল পূবে ভীষ্মের শরশয্যা গ্রহণের স্থান। এইখানে একটা ছোট কুণ্ড আছে। ভীষ্মদেবের জলপানের জন্য অর্জুন এক বাণাঘাতে এই কুণ্ড খনন করেছিলেন।

গীতাভবনের সম্পাদক মহাশয়ের সাথে বেশ আলাপ জমে উঠল। ভদ্রলোক লক্ষ্ণৌ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মুখে থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র সম্পর্কে শুনলাম, মহারাজা কুরুর যজ্ঞক্ষেত্রের পূবদিকের গ্যালারী ছিল কষ্টিপাথর দিয়ে বাঁধানো। তাতে বসতেন মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা। দক্ষিণ ধারটা ছিল শ্বেতপাথরে বাঁধানো—রাজা, মহারাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য। উত্তর ও পশ্চিম দু'ধারের লাল পাথরের গ্যালাবী অপব সাধারণ দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই গ্যালারীগুলি বৌদ্ধযুগেও অক্ষত ছিল। পরে কষ্টিপাথর ও শ্বেতপাথরগুলি অপসারিত হয়েছে। এখনও দক্ষিণধারে বহু শ্বেত পাথরের টালির ভাঙ্গা টুকরো পাওয়া যায়। কষ্টিপাথরের টুকরোও কদাচিৎ পাওয়া যায়।

হিন্দু আমলে মহারাজা কুরুর শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ভস্মরাশিও সুরক্ষিত ছিল। ভস্মের অন্তরালে প্রচুর ধনরত্ন পাওয়ার আশায় বিদেশী লুণ্ঠনকারীরা সে পবিত্র ভস্মও ধ্বংস করেছে।

সম্পাদক মহাশয়ের কথা শুনে প্রশ্ন করলাম—আপনি যা বলেছেন, এর কোনও লিখিত প্রমাণ আছে কি? আমার তো মনে হয়, কোনো ইতিহাসের বইতে এ সমস্ত কথা লেখা নেই।

আমার কথার উত্তরে সম্পাদক বললেন—যে উপাদান অবলম্বন করে বর্তমান ইতিহাস লিখিত হয়েছে বা হচ্ছে, সেই উপাদানের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন না। সবদেশেই দেখা যায়, সমসাময়িক ইতিহাস লেখকগণ রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত অথবা রাজানুগ্রহপ্রার্থী। কোনো কোনোও লেখক একেবারে রাজার সভাসদ বা

রাজকর্মচারী। এই সমস্ত লেখকদের পক্ষে নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখা কখনই সম্ভব নয়। বরং কালোটাকে সাদা আর সাদাটাকে কালো করে দেখানোর জন্য তাঁদের যথেষ্ট কলমের কারসাজি করতে হয়। ফলে যাঁরা রাজশক্তিতে শক্তিমান, তাঁদের সৎকর্ম-উয়ের ঢিবিটা ঐতিহাসিকের লিপিচাতুর্যে হয়ে ওঠে পর্বতপ্রমাণ ; আর অপকর্মের এঁদো পুকুরটা হয়ে পড়ে গোষ্পদ।—

এই সমস্ত ইতিহাস লেখকরা কেবল যে, যে রাজ্যে বাস করতেন সেই রাজ্যের রাজশক্তির অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন, এমনও নয়। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শক্তিমানদের নিকট হতেও প্রাপ্তির আশা এঁদের যথেষ্ট ছিল। এর জন্য অন্যান্য রাজ্য সম্পর্কেও নিরপেক্ষ লেখা এই সমস্ত ঐতিহাসিকদের নিকটে আশা করা যায় না।--

এ ছাড়া যে সমস্ত ঐতিহাসিকেব বিজেতা-বিজিত মনোভাব ও ধর্মান্ধতা থাকার সম্ভাবনা আছে, তাঁদের লেখায় পরাজিত ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইতিহাস বিকৃত হওয়ার ঘটনা যথেষ্ট দেখা যায়। আপনাদের কলকাতায় অন্ধকূপ হত্যার মত ঘটনা ইংরেজ ঐতিহাসিক ফলাও করে লিখেছেন। প্রত্যেকটি স্কুলের ছাত্র পঞ্চম শ্রেণী হতেই সে ঘটনা পড়ে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ কর্তৃক ‘পাণ্ডে-হত্যা’র মত অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ইতিহাস একেবারে নীরব। দেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ তো দূরের কথা, উচ্চ শিক্ষিতদের অধিকাংশই পাণ্ডেহত্যার ইতিহাস জানেন না। আরও একটা বিরাট হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যায়। যে হত্যাকাণ্ডের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীর, গান্ধার, উত্তরকুরু, কেকয় প্রভৃতি রাজ্যগুলির সমস্ত অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষের রক্তে রঞ্জিত হয়ে গন্ধমাদন (?) পর্বত হিন্দুকুশ অর্থাৎ হিন্দুর বধ্যভূমি নামে এখনও মানচিত্রে আমরা দেখি। ফার্শি ‘কুশ’ শব্দের অর্থ বধ্যভূমি। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডের আদ্যোপান্ত কাহিনী ভারতের প্রচলিত ইতিহাসে নেই কেন? ভারতের রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক, সমাজ ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে এ হত্যাকাণ্ডের গুরুত্ব তো অসাধারণ !

আমাদের প্রাচীন পুরাণাদির কাহিনী কি ঐতিহাসিক ঘটনারূপে গ্রহণ করা যায় ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

হাঁ, ওগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা। তবে ওর অলৌকিকত্ব ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা বাদ দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। তারপর আরও একটা বিষয় বিচার্য—পুরাণাদি গ্রন্থে বহু প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে।

পুরাণের লেখক ব্যাস-ঋষিগণ তো নিরপেক্ষ ছিলেন বলেই শোনা যায়। তাঁরা কেন ওপ্রকার অতিরঞ্জন এবং অলৌকিকত্ব মিশিয়ে কাহিনীগুলি লিখেছেন ?

ঋষিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিহাস লেখা নয়। তাঁরা বেদের অধ্যাত্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও সদাচার জনসমাজে প্রচার করার জন্যই পুরাণাদি লিখেছেন। সাধারণ জনসমাজে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত তত্ত্বকথা শোনার জন্য আগ্রহান্বিত হয় না। তাদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতির লেখক ঋষিগণ প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে বেদের তত্ত্বগুলি উপস্থিত করেছেন।

তার জন্য অতিরঞ্জন প্রয়োজন হল কেন ?

মানুষ মাত্রেই অতিরঞ্জিত অলৌকিক কথা শুনতে ভালবাসে। রাবণের দশ মাথা কুড়ি হাত, কুম্ভকর্ণের নাকের ভিতরে হাজার হাজার রাক্ষসের প্রবেশ, হনুমানের যোজন পরিমাণ লেজ, মাথায় গন্ধমাদন পর্বত আর বগলে সূয্যি-মামা চিরে-চ্যাপ্টা না হলে ক'জন ভক্ত রামায়ণ পড়ত বা শুনত ? এই প্রকার অতিরঞ্জন ও অলৌকিকত্বের আরোপ যে, কেবলমাত্র আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থেই হয়েছে—তা নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মগ্রন্থে অল্পাধিক এই ব্যাপার দেখা যায়।

এর ফলে তো বুদ্ধিমান চিন্তাশীল ব্যক্তি-বিশেষের ধর্মশাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা আসতে পারে ?

না, তা আসবে না। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা ব্যাপারটা অনায়াসেই

বোঝেন। হিন্দুধর্ম-তত্ত্ব কোনো ব্যক্তি বিশেষের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। এর প্রতিষ্ঠা দার্শনিক যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপরে। যুক্তি ও প্রমাণ বহির্ভূত কোনও কথাই অধ্যাত্ম-বিষয়ে হিন্দু মনিষিগণ গ্রাহ্য করেন না। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, অথবা আমাদের মত একটা মানুষ, কিংবা শ্রীকৃষ্ণ নামে কোনো ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন কিনা, থাকলেও তিনিই গীতার বক্তা কিনা, এ সমস্ত বিষয় নিয়ে হিন্দু মনিষিগণ আদৌ মাথা ঘামান না। তাঁদের বক্তব্য—গীতায় যা উপদেশ আছে, তা প্রমাণ ও যুক্তিসঙ্গত কিনা, তাই পরীক্ষা করে দেখা হোক। যে ধর্মশাস্ত্র কোনো ব্যক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই ধর্মশাস্ত্রের অনুবর্তিগণ ঐ ব্যক্তির ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। এ নিয়ে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে বহু রক্তপাত ঘটেছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুর দেব-দেবী, হিন্দুর অবতার-পুরুষ প্রভৃতি নিয়ে ঘরে বাইরে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়; তাতে হিন্দু সমাজ কোনো কোনও সময় বিরক্তি প্রকাশ করলেও সমালোচনাকারীকে হত্যা করে ধার্মিক সমাজে ধর্মবীরের সম্মান লাভের কথা চিন্তা করতে পারে না। হিন্দুর এই সহনশীলতার হেতু—তাদের ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছে অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করে যুক্তিবাদী হতে। এই জন্যই ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে, হিন্দু তার শাস্ত্রের অবান্তর, অতিরঞ্জিত, অলৌকিক বর্ণনার তাৎপর্য বুঝে, তা পরিত্যাগ করে শুদ্ধ ধর্মতত্ত্বেরই সমাদর করেন। ভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থে যে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত কথা আছে তা স্বীকার করতে, বা ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা করতে হিন্দু সব সময়েই তৎপর।

পুরাণে বর্ণিত ঘটনাগুলি কি লেখক-ঋষি প্রত্যক্ষ দেখে লিখেছেন, না শোনা কথা লিখেছেন?

সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখে লেখা কখনই সম্ভব নয়। লোকপরম্পরা শুনেই লেখা। আমি আপনাকে কুরুক্ষেত্র সম্পর্কে যা বললাম তা এখানে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে শুনেছি।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান

একদিন সম্পাদক মহাশয়ের সাথে গেলাম দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে বেড়াতে। প্রাচীনকালে দ্বৈপায়ন হ্রদ অনেক বড় ছিল। এখন আমাদের বাংলাদেশের হাজামজা একটা বড় পুষ্করিণীর মত। জলে যথেষ্ট মাছ আর কাছিম আছে। ওদেশে সমস্ত প্রাকৃতিক হ্রদে দেখেছি সরপুঁটিমাছ প্রচুর। সরপুঁটিগুলো আমাদের বাংলাদেশের সরপুঁটি অপেক্ষা অনেক বড় এক একটা দু'সের ওজনেরও দেখা যায়। রুই-কাতলা কিন্তু বেশী বড় হয় না। রুই বড়জোর তিন সের সাড়ে তিন সের, আর কাতলা পাঁচ-সাত সের হয়। রুই মাছগুলো দুই রকমের দেখা যায়, এক ঘোর লাল, আর এক জাত একেবারে কালো রং। এই সমস্ত হ্রদের মাছ, কাছিম, সকলেই নির্ভীক। কারণ—মাছ, কাছিম কেউ কখনো ধরে না।

দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে বসে আমার সঙ্গী সম্পাদক মহাশয় আরম্ভ করলেন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা। তিনি বললেন—

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু-বধ নিয়ে আমরা কথায়, কাব্যে, গানে, কত না সমবেদনা প্রকাশ করি। কৌরব পক্ষের নৃশংসতায় আমাদের অন্তর ঘৃণা ও বেদনায় ভরে ওঠে। কিন্তু প্রাচীন আর্য-যুদ্ধনীতি অনুযায়ী বিচার করলে দেখা যাবে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রধান মন্ত্রী অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডব পক্ষের দ্বারা প্রথম অন্যায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়েছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় মহাবীরগণের বিনাশ সাধনে, পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণের যে উপায় অবলম্বিত হয়েছিল, তাকে শঠতা ছাড়া আর কোনও প্রকারেই ব্যাখ্যা করা যায় না—

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে এযাবৎ যত বিভিন্ন সমালোচনা হয়েছে, তত সমালোচনা বোধ হয় আর কাউকে কেন্দ্র করে

হয় নি। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে স্বীকার করেন না, তাঁদের কথা বাদ দিয়ে, অপর সকলের সমালোচনা পড়লে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ এঁদের সকলের সম্মুখেই একটা অতি বড় বিস্ময় বা ধাঁধা। মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র—সকলেই বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। ভাগবত বলেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলছেন "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ" অর্থাৎ উপনিষদে কথিত ব্রহ্মতত্ত্ব, যাকে অমৃত ও অব্যয় বলা হয়েছে, তার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রমাণ এই আমি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি।" এইপ্রকার কথা গীতায় আরও বহু বলেছেন। হিন্দু মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে পূজা করেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ-মনন তাঁদের সাধন-ভজনের একটা প্রধান অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছেন। এতৎ সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণ এজগতে এসে যা করে গিয়েছেন, তাঁর সেই আচরণ কিন্তু কেউ সমগ্র ভাবে গ্রহণ করেন না। বরং তাঁর বহু আচরণ মানবসমাজনীতি বিগর্হিত বলে ত্যাগ করতেই উপদেশ পাওয়া যায়।

এ জগতে আর যত অবতার বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা সকলেই জনসমাজে যা উপদেশ দিয়েছেন, তা নিজেদের জীবনেও আদর্শরূপে পালন করেছেন। কখনও নিন্দিত কর্ম তাঁরা করেন নি। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে দেখা যায় সৎ, অসৎ, কোনো কর্মেই তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। প্রয়োজন হলে কার্যসিদ্ধির জন্য যে উপায় উপযুক্ত মনে করেছেন, তাই অবলম্বন করেছেন। অথচ এই শ্রীকৃষ্ণই গীতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে আমাদের সৎ হতেই উপদেশ দিয়েছেন!

এর জন্য এক শ্রেণীর কৃষ্ণভক্ত সমালোচক নানা রকম সুন্দর যুক্তি-তর্কের সাহায্যে, শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত অপকর্মগুলো ছেঁটে কেটে বেশ মানানসই ভদ্র ভগবান সাজিয়ে, আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রসমাজের বৈঠকখানা বা ক্লাবে উপস্থিত করতে যথেষ্ট চেষ্টা করে থাকেন। এই সমস্ত সমালোচকদের মূল্যবান প্রবন্ধ পড়ে অসুবিধা হয় এই যে, তাঁদের

যুক্তিতর্ক-কাঁচির ছাঁটে পড়ে যে ভদ্র ভগবান কৃষ্ণ বেরিয়ে আসেন, তিনি আর বেদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম' থাকেন না। এই ভদ্র ভগবান যদি বৈদান্তিক-দার্শনিক সভায় উপস্থিত হতে চান, তবে তাঁর সাথে একটা 'শয়তান' নিয়ে যেতে হবে, নচেৎ এজগতের অসতের প্রতিনিধিত্ব করবে কে?—

এই সমস্ত আধুনিক উচ্চশিক্ষিত মার্জিতরুচি কৃষ্ণভক্ত সমালোচকদের মনে নানাকারণ বশত ঈশ্বর তত্ত্ব 'নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্বদোষ পরিবর্জিত' এই প্রকার একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। সৃষ্ট জগতে কিন্তু দেখা যায় সৎ ও অসৎ দুইই বর্তমান। যদি ঈশ্বর নির্ভেজাল সৎই হন, তবে তো তিনি আর সমস্ত দুঃখ ও দোষের আকর অসৎ সৃষ্টি করতে পারেন না। অতএব অসৎ সৃষ্টির জন্য সৎ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী আর একজন নিশ্চয়ই আছেন। অনেক শাস্ত্রেই এই প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান দিয়েছেন। সে প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন মহাশক্তিমান দুর্দ্ধর্ষ 'শয়তান' যিনি সর্বনষ্টের গোড়া।—

এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটু বিচার করলেই দেখা যাবে, তাঁদের এই নির্ভেজাল সৎ ঈশ্বরের হাজার হাজার নিঃস্বার্থ ভক্ত-প্রচারক, মাইনেকরা প্রচারক, ঈশ্বরের খাওয়া-পরার ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা বা প্রণামী আদায়কারী প্রচারক, এবং ঈশ্বরের মহামহিমা-জ্ঞাপক লক্ষ লক্ষ ছাপানো পুঁথি, পুস্তক, প্রবন্ধ দৈনিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও, অবস্থাটা তাঁর পক্ষে বড় সুবিধেজনক বলে তো মনে হয়না।—

অপরদিকে শয়তানের পক্ষে মাইনে করা প্রচারক তো দূরের কথা, কোনও কালে একপাতার একখানা বিজ্ঞাপন ছাপিয়েও বিলি করা হয় না। অথচ আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই অজস্র শয়তানের ভক্তের সাক্ষাৎ পাই। ভগবদ্‌ভক্ত বহু চেষ্টা করে খুঁজে বের করতে হয়। এ অবস্থায়ও যদি সন্দেহ ওঠে, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কে বড়, কার শক্তি বেশী; তবে আধুনিক গণতন্ত্র সম্মত 'ব্যালট' প্রথায় গণভোট

গ্রহণ করে এর মীমাংসা করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে নিছক সৎ ঈশ্বর সম্মত হবেন কিনা সন্দেহ। জেনে শুনে জামিন বাজেয়াপ্ত হওয়ার মত অপমান, কোনও বুদ্ধিমান ভদ্রলোক ভোগ করতে রাজি হন না।—

এখন এই সমস্ত কথা চিন্তা করে উক্ত সমালোচকদের লেখা বই, প্রবন্ধাদি পড়লে মনে হয়, এ যেন একটা যুবতী মেয়েকে মাত্র একখানা আট-হাতী শাড়ী পরানোর চেষ্টা। এদিক টানলে ওদিক হয় না, ওদিক টানলে এদিক হয় না।—

আমাদের বেদ-উপনিষদ বলেন—

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥ ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।২।১॥ হে সোম্য, এই সৃষ্টিব পূর্বে একটি সৎ ছিলেন। সেই সৎটি এক ও অদ্বিতীয (ব্রহ্ম)।

ততো বৈ সদজাযত। তদাত্মানং স্বযমকুরুত॥ তৈত্তিরীয উপনিষৎ। ২৭॥ সেই 'সৎ' হইতে এই অস্তিত্ববিশিষ্ট বিশ্ব উৎপন্ন হইযাছে। সেই সৎব্রহ্ম নিজেই নিজেকে বিশ্ব রূপে পরিণত করিয়াছেন।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। যজুর্বেদীয় শান্তিমন্ত্র।

বিশ্বরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়াও সেই ব্রহ্ম তাঁর শুদ্ধ স্বরূপে পূর্ণ ই আছেন। বিশ্বস্রষ্টা পূর্ণব্রহ্ম হইতে এই কার্যব্রহ্ম বিশ্ব পূর্ণরূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছেন। পূর্ণ কারণ-ব্রহ্ম হইতে এই পূর্ণ কার্যব্রহ্ম অভিব্যক্ত হইয়াও কাবণব্রহ্ম পূর্ণ ও শুদ্ধই থাকিলেন।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি॥ ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ৩।১৪।১॥ এই যাহা কিছু সব ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেই ইহার উৎপত্তি, ব্রহ্মই ইহার আশ্রয় বা নিয়ন্তা। শেষে সমস্তই সেই ব্রহ্মে লয় হয়॥

তথাঽক্ষরাৎ বিবিধা ভাবা প্রজায়ন্তে॥ মুণ্ডক উপনিষৎ॥ সেই প্রকারে হে সোম্য অক্ষরব্রহ্ম হইতে (দয়া, স্নেহ প্রভৃতি সৎভাব ও ক্রোধ, অসূয়া, প্রভৃতি অসৎ ভাব)—বিবিধ ভাব সমূহ প্রকৃষ্টরূপে জাত হইয়াছে।

ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক কিছু দেখা যায় না।

এই যদি আমাদের বেদাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্ম হন, আর সেই ব্রহ্মের পূর্ণতম অভিব্যক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণ হন, তবে শ্রীকৃষ্ণে ভাল মন্দ সবই থাকবে। বরং অপরাপর সব অপেক্ষা বেশী থাকবে।—

এখন এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা— যা ভাগবত ও মহাভারতে বর্ণনা করা হয়েছে—তা দেখি, তবে তাঁর সম্পর্কে কোনো সংশয় উঠতে পারে না।—

আমরা একদল কৃষ্ণভক্ত এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন-পরমেশ্বর ও ঐতিহাসিক পরমপুরুষ বলে মেনে নিয়েছি।

আমাদের দৃষ্টিতে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রকাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব মন্ত্রী ও অর্জুনসারথি হয়ে, যে নীতি অবলম্বন করে, কৌরব পক্ষের তুলনায় বহু দুর্বল পাণ্ডব পক্ষকে জয়ী করলেন, সেই কার্যকরী নীতিটি তিনি যুদ্ধের প্রারম্ভে গীতায় অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন। সেই নীতি বাক্যটি হল—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ গীতা ১।১১॥

যারা আমার সাথে যে প্রকার ব্যবহার করে, তাদের সাথে আমিও সেই প্রকার ব্যবহার করি। আমার এই নীতি মানুষে সর্বত্র সবক্ষেত্রেই অনুসরণ করে থাকে।'—

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির ব্যাখ্যা গীতার পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক ভাষ্যকারেরা যে প্রকারই করুন না কেন, যদি শ্রীকৃষ্ণ ও গীতার ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা হয়, তবে এই উক্তির কার্যকর তাৎপর্য—কৃষ্ণ তাঁর সখা ভীত র্জুনকে বলছেন,—

"হে সখা, আমাদের সম্মুখে এই বিরাট কৌরব-শক্তি-সমাবেশ দেখে তুমি ভয় করনা। তুমি জান আমি ঈশ্বর, বিশ্বে যে কোনো বিষয়ে আমার সমানও কেউ নেই, আমার চাইতে বড়ও কেউ নেই। যদিও আমি এ যুদ্ধে নিজে অস্ত্রধারণ করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তথাপি তোমাদের

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমার নীতি হচ্ছে— যে আমার সাথে যেমন ব্যবহার করবে, আমিও তার সাথে তেমনি ব্যবহার করব। সৎ-ব্যবহার করলে সৎ-ব্যবহার পাবে, অসৎ ব্যবহার করলে অসৎ-ব্যবহারই পাবে।—

"তোমরা তো এ যাবৎ কৌরবদের সাথে সদ্‌ব্যবহারই করেছ, তাতে কি কোনো সুফল হয়েছে? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কি ঠেকাতে পারলে? দুষ্ট স্বভাব যার, সে সাধুর সদ্‌ব্যবহার বোঝে না। ন্যায়, নীতি, চুক্তির দ্বারা নিজের স্বার্থ যতটুকু সিদ্ধ হয় ততটুকুই দুষ্টের দল মানে, অপরের স্বার্থ তারা দেখে না। দুষ্টেরা সাধুর সহনশীলতা ও সদ্‌ব্যবহারকে দুর্বলতা মনে ক'রে আরও বেশী অত্যাচারী হয়ে ওঠে। কাজেই অসতের সাথে ব্যবহারে প্রয়োজন হলে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতিই খাটাতে হবে।—

"হে অর্জুন, আমি সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, কূটকৌশল ও শঠতায়ও আমার সমান কেউ নেই, আমার চাইতে বড়ও কেউ নেই। হোক না কেন কৌরব পক্ষ তোমাদের চাইতে সামরিক শক্তিতে অধিক শক্তিশালী, তাতে কোনো ভয় নেই। আমি এবার তোমাদের মন্ত্রী হয়েছি। আমি এ যুদ্ধে ওদের নীতি অনুসরণ করেই ওদের ঘায়েল করব। এতদিন দুর্যোধনেরা তোমাদের সাথে করেছে শঠতা, তোমরা করেছ ওদের সাথে সরল ব্যবহার। তাতে যখন ওদের নষ্টামি দূর হল না, তখন এইবার ওরা যে ব্যবহারের যোগ্য, যে নীতি বোঝে, যে শঠতা এতদিন তোমাদের সাথে করেছে, তাই সুদে আসলে ফিরিয়ে দেব।"—

এইবার ভেবে দেখুন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কেন শাঠ্য-নীতি অবলম্বন করেছিলেন। যদি তিনি ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের মত নীতিবাগীশ হতেন, তবে পাণ্ডব পক্ষের জয় কখনোই সম্ভব হত না। রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি হবে দেশ ও দশের মঙ্গলের নীতি। সেই দিক হতেই ও দু'টো নীতির সৎ ও অসৎ বিচার করতে হবে।

মহারাজ পৃথ্বীরাজ ছিলেন ধার্মিক বীর। তিনি আক্রমণকারী মহম্মদঘোরীর সাথে বীরত্বপূর্ণ সদ্‌ব্যবহারই করেছিলেন। কিন্তু কই,

পৃথ্বীরাজের ধর্ম, বীরত্ব, শত্রুর সাথে সদ্‌ব্যবহার, থানেশ্বরের পতন তো ঠেকাতে পারে নি? কাজেই বলতে হবে ও প্রকার বীরত্ব বীরত্বই নয়, ও প্রকার সদ্‌ব্যবহার ব্যবহারই নয়। বরং দেশ ও দশের নিরাপত্তার ভার যাঁদের ওপরে আছে, তাঁরা যদি দেশ ও সমাজের শত্রুদের স্বার্থপরতার সম্মুখে অহিংসা, সহনশীলতা ও ক্ষমা নীতির বুলি কপচিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন তবে বুঝতে হবে জনসাধারণের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়েছে।

প্রকৃত রাজনীতি হবে 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজমাহম্।' আর যুদ্ধ ও আত্মরক্ষার নীতি হবে 'শঠে শাঠ্যং সমাচারেৎ।' এ নীতির প্রয়োগ এবং তার সুফল শ্রীকৃষ্ণ হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রত্যেক উন্নতিশীল রাষ্ট্রে শ্রীকৃষ্ণের এই নীতি অতি সুনিপুণ ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনলাম অধ্যাপক মহাশয়ের কথাগুলি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, উঠতে হল। ভাবতে ভাবতে পথ চলেছি। থানেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরের পাশ দিয়ে চলতে হঠাৎ যেন কানে ভেসে এল কারা মৃদুকণ্ঠে বলছে।—

পৃথ্বীরাজ যদি গীতার ঐ বাণী মেনে চলতেন, তবে তোমার পায়ের তলের মাটি সহস্র ব্রাহ্মণরক্তে সিক্ত হত না, তুমিও আজ এই মন্দিরে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হতে না। তোমরা সাবধান হও।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।'

নাগা সন্ন্যাসী ও মধুসূদন সরস্বতী

থানেশ্বর মঠে ক'মাস কেটে মাঘমাস এসে গেল। লক্ষ্ণৌ হতে কোনো সংবাদ পেলাম না। গীতাভবনের সম্পাদকের নিকটে সংবাদপত্র পাই। তাতে দেখি, কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলা নির্বিঘ্নে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। দেশে ধরপাকড় একটু কমেছে। প্রায় সংবাদপত্রেই সহিংস বিপ্লবীদের নিন্দা ক'রে উত্তম উত্তম প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে। সভায় বক্তৃতা ক'রে সর্বসম্মত নিন্দাপ্রস্তাব পাস হচ্ছে। বিলেতের পার্লামেন্টে শ্রমিকদল ভারতে অহিংস নেতা—যাঁরা জেলে বা অন্তরীণে আছেন, তাঁদের সুখসুবিধে আরও বৃদ্ধি করার জন্য বৃটিশসরকারের ওপরে চাপ দিচ্ছেন। নতুন কোনও বিপ্লবপ্রচেষ্টা বা বিপ্লবীদের কোনো কার্যকলাপের সংবাদ নেই।

মাঘমাসে কুরুক্ষেত্রে সাধুসন্ন্যাসীর মেলা আরম্ভ হয়েছে। সাধুদের মধ্যে বহু নাগাসন্ন্যাসী এসেছে। নাগা সন্ন্যাসীরা দুর্ধর্ষ স্বাধীন প্রকৃতির শক্তিশালী সন্ন্যাসী। ক্ষেতের ছোলা-মটর লুটে খায়। মাঠে দুধেল গাই বা মোষ পেলে, বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খেয়ে নেয়। কেউ কিছু বলে না। নাগাদের সকলেই ভয়-ভক্তি করে।

এই নাগা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদি সংগঠনকর্তা—কিন্তু একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণবপণ্ডিত সন্ন্যাসী। সে বাঙ্গালীটি হচ্ছেন—ভারত প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক 'অদ্বৈত সিদ্ধি' গ্রন্থ প্রণেতা গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী।

শ্রীপাদ মধুসূদন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া গ্রামে বিখ্যাত পণ্ডিতব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রমোদনপুরন্দর ভট্টাচার্য পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। পিতার টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়নরত বালক মধুসূদন শুনতে পান, নবদ্বীপের কিশোর পণ্ডিত শ্রীনিমাইচাঁদের অপূর্ব ব্যাকরণ-পাণ্ডিত্য।

দিন যতই যায় মধুসূদন ততই নিমাইপণ্ডিতের বহু গুণের কথা শোনেন। শেষে একদিন মধুসূদন তাঁর পিতামাতার আশীর্বাদ-অনুমতি নিয়ে চললেন নবদ্বীপে শ্রীনিমাইপণ্ডিতের ছাত্র হওয়ার উচ্চাশা বুকে নিয়ে।

সুদূর কোটালীপাড়া হতে নবদ্বীপের পথ ছিল তখন সুদুর্গম। সে পথের সমস্ত ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে কিশোর মধুসূদন যখন নবদ্বীপে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রীনিমাইপণ্ডিত ভগবদ্‌প্রেমোন্মাদ অবস্থায় সন্ন্যাসী হয়ে নীলাচলে চলে গিয়েছেন।

সংবাদ পেয়ে হাতাশায় কেঁদে ফেলেছিলেন পথশ্রান্ত বালক। সে ক্রন্দন, সে আকুলতা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিমাইপণ্ডিতের পরোক্ষ কৃপা আকর্ষণ করল। নবদ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক অধ্যাপক শ্রীল মথুরানাথ ন্যায়াচার্য পথ হতে বালক মধুসূদনকে কুড়িয়ে নিয়ে, তাঁর নিজস্ব ছাত্র হওয়ার সুযোগ দিলেন।

অসাধারণ মেধাবী ছাত্র মধুসূদন ন্যায়দর্শনের সমস্ত বিভাগে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করে, অধ্যাপকের স্নেহ-আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, বেদান্ত ও পূর্ব মীমাংসা দর্শন অধ্যয়নের জন্য গেলেন বেদান্ত অধ্যাপনার পীঠস্থান কাশী।

কাশীধামে মধুসূদন সর্বপ্রধান বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামতীর্থের শিষ্যত্বলাভ করেন। এই সময়ে কাশীতে কর্মবাদী পূর্বমীমাংসা দর্শনের বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। প্রায়ই বৈদান্তিক পণ্ডিতদের সাথে মীমাংসক পণ্ডিতদের শাস্ত্রবিচার হত। সে বিচারে 'শাঙ্করমায়াবাদী' বৈদান্তিক পণ্ডিত সমাজ বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারতেন না। এই প্রকার এক বিচার সভায় মধুসূদনের অধ্যাপক শ্রীপাদ রামতীর্থ পরাজিত হয়ে অপমানিত হলেন। এই ঘটনায় ছাত্র মধুসূদন অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পান। তিনি তাঁর অধ্যাপকের অনুমতি নিয়ে শ্রীপাদ মাধব সরস্বতীর নিকটে পূর্বমীমাংসা দর্শন অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে উভয় দর্শনে অপূর্ব পাণ্ডিত্য লাভ করে, যখন ন্যায় দর্শনের সাহায্যে বেদান্ত মত রক্ষায় মধুসূদন অগ্রসর হলেন, তখন অতি অল্পদিনের মধ্যেই

কাশী ও অপর সমস্ত স্থানে কর্মমীমাংসক পণ্ডিত সমাজে তিনি হলেন একটা অসাধারণ ভীতির পাত্র। বাঙ্গালী পণ্ডিত মধুসূদন হলেন ভারতের সমস্ত বৈদান্তিক সমাজের আশ্রয়। সমস্ত কুযুক্তি খণ্ডন করে বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠার জন্য লিখলেন 'অদ্বৈত সিদ্ধি' নামক মহাগ্রন্থ—যা আজও শুদ্ধাদ্বৈতবাদী পণ্ডিত সমাজে সর্বাপেক্ষা অদরণীয়।

এর কিছুদিন পরে মধুসূদন শ্রীপাদ বিশ্বেশ্বব সরস্বতীব নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, নির্জনে সাধন করাব উদ্দেশ্যে, প্রযাগের গঙ্গার অপর পারে ছোট একখানা কুটির নির্মাণ ক'রে বাস আরম্ভ করেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট আকবর কিছুকাল এলাহাবাদ-দুর্গে বাস কবতে আসেন। সম্রাটের এক প্রিযতমা বেগম শূলবোগে আক্রান্ত হয়ে, বহু চিকিৎসাযও কোনো ফল না হওয়ায় জীবনে হতাশ হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় বেগম সাহেবা একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন —তিনি গঙ্গার অপর পাবে এক সন্ন্যাসী দর্শনে যেযে, তাঁকে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী বেগম সাহেবাকে আশীর্বাদ করলেন, আর তাতেই তাঁর শূলরোগ সেরে গেল।

স্বপ্নের কথা বেগমসাহেবা বাদশাহকে বললেন। সম্রাট আকবর স্বভাবতই সমস্ত ধর্মের সাধুসন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা করতেন। ধর্মমত নিয়ে তাঁর কোনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল না। তিনি চর পাঠিয়ে অনুসন্ধান ক'রে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর সংবাদ পেলেন। তারপর একদিন বেগমসাহেবাকে সাথে নিয়ে সম্রাট ছদ্মবেশে শ্রীপাদের কুটিরে উপস্থিত হলেন।

বেগমসাহেবা দেখেই চিনলেন, এই তাঁর স্বপ্ন-দৃষ্ট মহাপুরুষ। ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী মহাপুরুষ করলেন আশীর্বাদ। রোগ দূর হল। সুস্থ শরীরে বেগমসাহেবা সম্রাটের সাথে গৃহে ফিরলেন।

আরও কিছুদিন অতিবাহিত হলে যখন রোগের আর পুনরাক্রমণ দেখা গেল না, তখন আর একদিন সম্রাট ছদ্মবেশে উপস্থিত

হলেন সন্ন্যাসীর কুটিরে। এ সমস্ত ব্যাপারে সম্রাট আকবর ছিলেন মুক্তহস্ত দাতা, কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি দিতে চাইলেন বহু ভূসম্পত্তি, ধন রত্ন। সন্ন্যাসী কিছুই গ্রহণে সম্মত হলেন না। সম্রাট তখন আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন—ভবিষ্যতে যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয়, তবে তা জানালে, সে বিষয়ে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। এবং যদি কিছু করতে পারেন, তবে তাঁর ঋণ মুক্ত হল বলে মনে করবেন।

তৎকালে সেই কুটির সমীপে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দ্বারা মুখে মুখে এ কাহিনী প্রচার হয়ে গেল। কাশীধামে শ্রীপাদ রামতীর্থ, শ্রীপাদ মাধবসরস্বতী, শ্রীপাদ বিশ্বেশ্বর সরস্বতী, প্রমুখ সন্ন্যাসী মহাতমারাও কথাটা শুনলেন। তাঁরা সকলে পরামর্শ করে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীকে কাশীধামে ডেকে পাঠালেন।

এই সময়ে কাশী, মথুরা, প্রভৃতি তীর্থস্থানে মুসলমান মোল্লারা দলবদ্ধ হয়ে মধ্যে মধ্যে অতর্কিতে আক্রমণ করে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হত্যা করত। এক একবার সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণের রক্তে গঙ্গা-যমুনার জল লাল হয়ে যেত। এই হত্যাকাণ্ডের কোনো প্রতিকার ছিল না। কারণ মুসলমান রাজত্বে মুসলমান মোল্লা-মৌলবিদের ধর্মীয় ব্যাপারে শাসনের অধিকার, মুসলমানী আইন অনুসারে দেশের রাজ শক্তির নেই। বরং অপর কোনো অমুসলমান যদি মোল্লাদের এই সমস্ত কার্যে বাধা দিত, তবে আইন অনু-সারে তাকেই দণ্ডভোগ করতে হত।

এই অত্যাচারের প্রতিকার করা যায় কিনা, তার জন্য কাশী-ধামের সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা পাঠালেন শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীকে দিল্লীর দরবারে। দিল্লী যেয়ে তিনি সম্রাটের হিন্দুমন্ত্রী টোডরমলের সাথে দেখা করলেন। রাজা টোডরমল শ্রীপাদ সরস্বতীর আগমন সংবাদ সম্রাটকে জানাতেই তিনি মহাসমাদরে দরবারে আহূত হলেন।

সম্রাটের দরবারে শ্রীপাদ শুনালেন নানা প্রকার শাস্ত্রীয় আলোচনা। দিনের পর দিন সে আলোচনা শুনে দরবারের সকলেই মুগ্ধ হলেন। তারপব একদিন সুযোগমত শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী সমস্ত সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের পক্ষ থেকে সম্রাট সমীপে পেশ করলেন তাঁদের আবেদন পত্র।

সম্রাট এ হত্যাকাণ্ডের কথা পূর্বেই জানতেন। শ্রীপাদ সরস্বতীর মুখে সমস্ত শুনে দুঃখিত হয়ে বললেন—মুসলমান আইনে মোল্লা-মৌলবিদের এই রকম কোনো কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার সম্রাটের নেই। এ অবস্থায় যদি তিনি অত্যাচারের প্রতিকার করতে যান, তবে এমন বিদ্রোহ উপস্থিত হবে যে, যার ফলে তাঁর রাজ্যচ্যুতি এমনকি জীবন নাশেব সম্ভাবনা আছে। তথাপি এই আবেদন অনুযায়ী কিছু করা যায় কিনা, তা ভেবে দেখে পরে জানাবেন।

কয়েকদিন পবে বাদশা জানালেন, তিনি তাঁব সাম্রাজ্যের সর্বত্র এই মর্মে এক ফর্মান জাবি করে দিচ্ছেন—কোনো অমুসলমান সংসার-ত্যাগী সাধুসন্ন্যাসীর কোনো কাজে রাজসরকার থেকে আর বাধা দেওয়া হবে না, এবং কোনো বিচারালয়ে সাধুসন্ন্যাসীর কোনো বিচার করার অধিকারও থাকবেনা। আইনের দৃষ্টিতে অমুসলমান সন্ন্যাসীরাও সর্ববিষয়ে মুসলমান মোল্লাদের মত স্বাধীন বলে গণ্য হবেন।

বাঙ্গালী-বৈষ্ণব-বৈদান্তিক-সন্ন্যাসী মধুসূদন দিল্লীর রাজপুত রাজাদের সহায়তায় সংগ্রহ করলেন, কয়েকজন ভাল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষক। তাদের নিয়ে কাশী ফেবার পথে মথুরা, প্রযাগ, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থ-স্থান ঘুরে সমস্ত সন্ন্যাসীসম্প্রদায় থেকে বেছে নিলেন কয়েক শ' সাহসী বলবান যুবক সন্ন্যাসী। শিক্ষা দিলেন তাদের যুদ্ধ বিদ্যা। বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রস্তুত হল প্রথম একদল মৃত্যুঞ্জয়ী নাগা সন্ন্যাসী।

তারপর একদিন যখন কাশীর গঙ্গাঘাট ও রাজপথ নিরীহ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণের রক্তে লাল হ'তে আরম্ভ ক'রেছে, গৃহস্থেরা আতঙ্কে বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দুর্গানাম জপ করছে, যুবতী মেয়ে বউ চোরাকুঠরীতে লুকিয়ে লাঞ্ছনার অপেক্ষায় কাঁপছে, তখন হঠাৎ দিগন্ত প্রকম্পিত ক'রে বজ্রগম্ভীর ধ্বনি উঠল,—'হর হর মহাদেও'। সেদিন প্রথম দেখা দিল কাশীর দশাশ্বমেধঘাটের পথে তীক্ষ্ণ বর্শা ও শানিত কুঠার হস্তে দুর্ধর্ষ মহাভৈরব উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসীর দল।

মুহূর্তে থেমে গেল পরধর্মবিদ্বেষী হিংস্র ধর্মোন্মাদের হত্যানন্দ-কোলাহল। কালবৈশাখী-ঝড়ের মুখে শুক্‌নো বাঁশপাতার মত উড়ে গেল সমস্ত লম্বাদাড়ি। সেইদিন হতে সমগ্র উত্তর-পশ্চিমভারতে হাজামের (নাপিতের) কদর বেড়ে গেল। সে কদর আজও কমেনি। ধর্মপ্রাণ নরনারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। (Fighting Sects of India.—by Dr. Ferkuhar, and John Rayland's Library Buletin Vol. 9. July 1925)

সেই থেকে একাল পর্যন্ত নির্ভীক নাগাসন্ন্যাসীদল সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের রক্ষক। বৃটিশ সরকারও এদের সমীহ ক'রে চলতেন।

আমি সেই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে কুরুক্ষেত্রে মাঘ মেলায় প্রথম নাগাসন্ন্যাসী দেখি। তারপর হরিদ্বার কুম্ভমেলায় এবং আরও বহুস্থানে এদের দেখেছি। সাধারণত প্রতি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েই কিছু সংখ্যক নাগা থাকে। তা ছাড়া কেবল নাগা সন্ন্যাসীর বহু ছোট ছোট দল সারাভারতে ছড়িয়ে আছে। শরীর চর্চা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা এদের ধর্মের অঙ্গ। এখনও সে শিক্ষা সমানেই চলছে। তবে সে শিক্ষা আধুনিক অস্ত্রবিদ্যা নয়, সেই সেকেলে লাঠি, তলোয়ার বর্শা মাত্র।

গত ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা হাঙ্গামায় যদি নাগা সন্ন্যাসীদের ওপরে রাইফেল ও মেশিনগানের গুলি না চলত, তবে আরও কয়েক হাজার নরনারী রক্ষা পেত। সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব হতে একটি নাগাও ফিরে আসে নি। তাদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের বহু কাহিনী দিল্লী কুরুক্ষেত্র ও

হরিদ্বারে উদ্বাস্তুদের মুখে শুনেছি। কিন্তু সে সব বীরত্ব, সে সব আত্মত্যাগের কথা ভারতের ইতিহাসে কি স্থান পাবে? দুর্ধর্ষ মৃত্যুঞ্জয়ী নাগা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শ্রষ্টা বাঙ্গালী মধুসূদন সরস্বতীই কি ভারতের ইতিহাসে—ভারতের জনচিত্তে যোগ্য স্থান পেয়েছেন? জয়ন্তী মুখরিত বাংলাদেশে বাঙ্গালী সমাজেই কি বাঙ্গালী মধুসূদন তাঁর যোগ্যস্থান পেয়েছেন? ক'জন শিক্ষিত বাঙ্গালী শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর পরিচয় ও কীর্তিকলাপ জানেন?

যাযাবর সন্ন্যাসী।

আরও একমাস থানেশ্বর মঠে কেটে গেল। কুরুক্ষেত্রে মাঘ-মেলা বেশ জমে উঠছে। দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত মেলা থাকবে। অপরাহ্ণে প্রায়ই মেলায় বেড়াতে যাই। কত রকমারি সাধু সন্ন্যাসী দেখি। ভারতে এমন অনেক সন্ন্যাসীদল আছে, যারা বছরের বেশীর ভাগ সময়ই দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, দু'এক মাস মাত্র মঠে থাকে। কতকগুলি দল তো একেবারেই যাযাবর, তাদের কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানাই নেই। এদের যা কিছু সব সাথেই থাকে।

এই সমস্ত যাযাবর সন্ন্যাসীদলের কোনো কোনো মহান্ত মহারাজ বেশ বড় রকমের ধনী। কুরুক্ষেত্রে এই প্রকার এক ধনী মহান্ত-মহারাজের পাল্লায় প'ড়ে আমি থানেশ্বর মঠ ত্যাগ করি।

থানেশ্বর মঠে কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু আমার স্বভাবের মধ্যে, যে যাযাবর ভাবটা ক'বছর ধরে বেশ দানাবেঁধে উঠেছে, সেটা মেলায় যাযাবর সন্ন্যাসীদের দেখে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। স্বভাব-যাযাবর

আমি, আমাকে এক জায়াগায় আবদ্ধ রাখতে হলে এমন একটা কিছু প্রয়োজন, যাতে ডুবে থাকতে পারি। সে রকম কিছু দেবার মত লোক ছিলেন কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারী দাদা। এত বিভিন্ন বিষয় দিয়ে তিনি আমার মন ও বুদ্ধি ব্যস্ত করে রাখতেন যে, কাজের অভাবে হাঁপিয়ে উঠতে পারতাম না। এখানে যে অবস্থায় আছি তাতে, প্রভাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠেই বলে দেওয়া যায়, দিনটা কেমন করে কাটবে।

মঠে যাঁরা সাধন ভজন নিয়ে আছেন, তাঁদের কোনো অসুবিধা নেই। বরং এইপ্রকার নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রাই তাঁদের সিদ্ধিলাভের অনুকূল। কিন্তু পৃথিবীর এই দু'শ' আশী কোটি মানুষের মধ্যে ক'জন আর সত্যিকারের সাধনভজন নিয়ে থাকেন? সেই মুষ্টিমেয় ক'জনকে বাদ দিয়ে আর সকলেই প্রায় আমার মত 'কাজ না থাকলে খুড়োর নামে এক নম্বর মামলা রুজু করার প্রবৃত্তি'—নিয়েই চলেন। কারণ, এটা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ ব্যাপার। মানুষ কখনও বেকার বসে থাকতে পারে না। বাইরে যদি কাজ না থাকে, মনে মনে নানা কাজের চিন্তা করবে।

সংস্কৃতে একটা প্রবাদ আছে, 'যাদৃশীর্ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশীঃ।' প্রবাদটা ফলে গেল, আমার আকাঙ্ক্ষিত নূতনত্বের সন্ধান পেলাম।

কুরুক্ষেত্র মেলায় একদল সাধু দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকটে ছাউনি করেছে। একটা বড় তাঁবু, তার পাশে আর পাঁচটা ছোট তাঁবু, গাই, বলদ, ঘোড়া, উট, বলদের গাড়ী, উটের গাড়ী, প্রভৃতি নিয়ে দলটা বেশ বড়। বড় তাঁবুতে মহান্ত-মহারাজের দরবার। একদিন দরবারে উপস্থিত হলাম।

রাজারাজড়ার রাজসিক বিলাসবৈভব এর পূর্বে কোনোদিন দেখি নি। কাজেই তুলনা করে কিছু বুঝাতে পারব না। সন্ন্যাসী মহান্ত-মহারাজের দরবারে প্রবেশ করে যে ঐশ্বর্য দেখলাম, সেটা রাজ-ঐশ্বর্য কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য, সে বিচার না করেও তখনকার মত বেশ একটু চোখ ঝল্‌সে গিয়েছিল—এ কথা সত্য। সোনা-রূপার আসবাবপত্র, মূল্যবান গালিচা, সোনার ঝালর দেওয়া পর্দা, প্রভৃতি সংখ্যা ও আকারের তুলনায় অল্পপরিসর তাঁবুর মধ্যে গাদাগাদি জড়াজড়ি করছে।

সাধু সন্ন্যাসীদের তাঁবুতে এ রকম সোনা-রূপার ছড়াছড়ি পরে আরও বহু জায়গায় দেখেছি। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার পব হরিদ্বার ও প্রযাগে তিনটে কুম্ভমেলা ঘুরেও, আব সেরকম দেখি নি। বোধ হয় আয়কর ফাঁকি দেওয়া ও কালোবাজারী টাকায় কেনা সোনার মত সাধুমহান্তদের সোনাও ভারতের কোনো কোনো জায়গায় মাটিব তলে সোনার খনি সৃষ্টি করছে।

সে দিন সেই তাঁবুর মধ্যে দেখলাম মহান্ত-মহারাজ সোনায় মোড়া গদীতে বসে উপস্থিত ভক্তবৃন্দেব ওপবে উপদেশামৃত বর্ষণ করছেন। ভক্তদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল, মহারাজের বাজার চলতি শস্তা উপদেশামৃত পান করা অপেক্ষা, মহান্ত-মহাবাজের মত আধ্যাত্মিক পথযাত্রী হতে পারলে, কি রকম সুখ-ঐশ্বর্য এই সংসারেই ভোগ সম্ভব, তাই তাঁরা মনে মনে বিচার-বিশ্লেষণ কবে বুঝতে চেষ্টা করছেন। আমিও নিঃশব্দে একপাশে ভক্তদেব মধ্যে বসে গেলাম।

যদিও সকলের পিছনেই ছিলাম, তথাপি বুঝলাম, আমার প্রথম প্রবেশ হতেই মহান্ত ও তাঁর পার্শ্বস্থ মহারাজ আমাকে লক্ষ্য করছেন। অল্পক্ষণ পরেই সেদিনের মত দরবার শেষ হল। আমিও যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু যাওযা হল না। সেই দ্বিতীয় মহারাজ এসে সবিনয়ে জানালেন—মহান্ত-মহাবাজ আমার পরিচয় পেলে খুশী হবেন।

গদীর সম্মুখে একখানা মূল্যবান আসনে বসে আমার চলতি পরিচয়টা দিলাম। আমি যে একজন বাঙ্গালী ভবঘুরে সাধু, কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় বা মঠের সাথে সম্বন্ধ নেই, তা বুঝে মহান্ত মহারাজ বেশ খুশী হলেন বলে মনে হল। পরিচয় নেওয়া দেওয়া শেষ হলে মহান্ত মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—আংরেজীতে বাৎচিৎ করতে পারি কিনা। আমিও জানালাম—থোরা থোরা পারি। শুনে সাগ্রহে পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন। ভোজন যদিও মধ্যাহ্নে, কিন্তু আসতে হবে বেলা আটটা-ন'টার মধ্যে—একথা ছোটে মহারাজ বিশেষ করে বলে দিলেন। আমিও নূতনত্বের মোহে স্বীকৃত হলাম।

পরদিন বেলা আটটায় যাযাবর মহান্ত-মহারাজের অনুচর এক সন্ন্যাসী টাঙ্গা গাড়ী ভাড়া করে, মঠে উপস্থিত হলেন। প্রাতে মঠের উপাসনা শেষ হলে যাত্রা করে নয়টায় তাঁবুতে উপস্থিত হলাম। সে দিন দেখলাম দরবারের জৌলুষ আরও বেড়েছে।

দরবারে মাত্র একজন সাহেবী পোষাক পরা পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ছাড়া আর কোনো বাইরের ভক্ত দেখলাম না। প্রথানুযায়ী নমস্কার করে বসতেই পাঞ্জাবীটি আমার সাথে ইংরেজীতে আলাপ আরম্ভ করলেন।

পাঞ্জাবী সাহেবের পরিচয় পেলাম—তিনি বি, এ, পাস করে এক বিখ্যাত ইনসিওরেন্স কোম্পানির অরগ্যানাইজার হয়েছেন। মহান্ত মহারাজের অসীম কৃপায় তাঁর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আশা আছে, আর একটু কৃপা পেলেই তিনি কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হতে পারবেন। সেই কৃপাটুকু পাওয়ার আশায় সুযোগ পেলেই এই অদ্ভুত, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের চরণ দর্শন করতে আসেন। সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ প্রণামীও দিয়ে থাকেন।

এইপ্রকার আলাপে প্রায় একঘণ্টা কাটিয়ে পাঞ্জাবী সাহেব বিদায় হলেন। বিদায়ের সময় মহান্ত মহারাজকে যা কিছু বললেন তার একবর্ণও আমি বুঝলাম না, কারণ ভাষাটা বোধহয় পশ্চিম পাঞ্জাবী 'পুস্তু'। আমার সাথে সাহেব কিন্তু আগাগোড়াই ইংরেজীতে আলাপ করেছিলেন।

মহান্ত মহারাজের সম্মুখে এই ইংরেজীতে আলাপের যে বিশেষ একটা তাৎপর্য ছিল, তা তখন না বুঝলেও পরে বুঝেছিলাম। ওটা আমার ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা হল। সে পরীক্ষায় আমি পাস করেছি।

তারপর আলাপ আরম্ভ হল সেই দ্বিতীয় মহারাজের সাথে। এই দ্বিতীয় মহারাজ বা ছোটে মহারাজ হ'চ্ছেন মহান্ত মহারাজের প্রধান চেলা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার, রিক্রুটিং অফিসার —একাধারে সব কিছু।

ভোজনের পূর্বে ও পরে প্রায় তিনঘণ্টা আলাপ আলোচনা করে ছোটে মহারাজ আমাকে যা বুঝালেন তার সারমর্ম হচ্ছে,—

অনেক বাঙ্গালীবাবু ইংরেজী লেখাপড়া শেষকরে নিখরচায় দেশভ্রমণের মতলবে মাথা নেড়া করে গেরুয়া পড়ে ঘুরে বেড়ায়। এই সমস্ত সখের বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগ্যগুণে কোনো শক্তিশালী সিদ্ধ মহাতমার সাক্ষাৎ ও কৃপা লাভ করে নানাদিক থেকে বিখ্যাত হয়ে থাকে।—

আমিও ঐপ্রকার একজন সখের সন্ন্যাসী। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, এমন একজন মহাশক্তিমান মহাতমার সাক্ষাৎ পেযেছি, যাঁর তুলনা বর্তমানে এই ভূভারতে আব নেই। এখন আমি ইচ্ছা করলেই ইহলোকে চবম উন্নতি, ও পবলোকে মোক্ষ বা স্বর্গলাভের পথ অনায়াসে সুগম করে নিতে পারি। তবে এই প্রথম বযসে একটু ভাল ক'রে সংসাব ভোগ কবাই উচিৎ, শেয বযসে মোক্ষের পথ ধরলেই চলবে। এই সিদ্ধ মহাতমার কৃপা হলে, এই সংসারে ভোগের পথ ও শেযে মোক্ষের পথ—উভয পথই একেবাবে পবিষ্কার ঝবঝরে হযে যাবে।—

এখন এই সিদ্ধ মহাপুরুষেব সম্যক্ প্রসন্নতার জন্য তাঁর কিছু সেবা অবশ্যই করা উচিত। সে সেবাও আমার মত ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুর পক্ষে এমন কিছু কঠিন নয।—

একালে যে সমস্ত সাধুসন্ন্যাসী, অবতার বা পবমহংস বলে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের সেই বিখ্যাতির মূলে আছে একমাত্র ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুদের অপূর্ব প্রচার-কৌশল। অবাঙ্গালী রাজা, জমিদার, ধনী শেঠেরা টাকা খরচ ক'রে সাধুবাবাদের মঠ, আশ্রম, তপোবন, সোনার পালকি, হাতির দাঁতের খাট ইত্যাদি অনেক কিছু করে দেয় বটে, কিন্তু সিদ্ধ মহাতমার ওপরে প্রমোশন দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। সে ক্ষমতা একমাত্র বাঙ্গালী বাবুদেরই আছে।—

এই যে মহাতমা এখানে বসে আছেন, ইনি একজন অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপণ্ডিত মহাপুরুষ, অবতার বলে গণ্য হওয়ার অতি উপযুক্ত ব্যক্তি। এঁর অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের সাধুবাবাও বাঙ্গালী বাবুদের প্রচার-গুণে অবতারত্ব বা পরমহংসত্ব লাভ করেছেন। কিন্তু

দু’-দু’বার কলকাতা যেয়ে চেষ্টাকরেও কোনো উপযুক্ত বাঙ্গালী বাবু পাকড়াও করা যায়নি। ফলে এমন একজন যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত প্রমোশন স্থগিত হয়ে আছে। এখন আমাকে পেয়ে একটা আশার আলো দেখা দিয়েছে।

তাঁদের এই প্রস্তাবে সম্মত হলে আমাকে কি করতে হবে, সে বিষয়ে মোটামুটি একটা পরিকল্পনাও শোনালেন। পরিকল্পনাটা নাকি ছোটে মহারাজের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা।

আপাতত আমাকে কিছুদিন মহান্ত মহারাজের যাযাবর ক্যাম্পের সম্মানিত মেম্বার হয়ে, তাঁর অলৌকিক শক্তিসামর্থ্যের কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে হবে। ঐগুলো ভবিষ্যতে প্রচার-কার্যের উপাদান হিসাবে কাজে লাগবে। তারপর কলকাতা যেয়ে সুবিধামত একখানা ভাল বাড়ী ভাড়া করে থেকে, দৈনিক ও সাময়িক সংবাদপত্রে এই মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তি ও অদ্ভুত তপস্যা সম্পর্কে বহু প্রতক্ষদর্শীর নানাপ্রকার কাহিনী ছাপাতে হবে। ক্রমে জনসাধারণের কিছু দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে, মহাতমা একবার অল্প দু’তিন দিনের জন্য কলকাতা যাবেন। সে সময় যাতে দশ-বিশজন গণ্যমান্য ব্যক্তি মহাতমা দর্শনে আসেন, সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হ’বে।—

এই সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা পূর্বেই কোনো সাধুবাবার কবলে পড়েছেন, তাঁদের অন্য কোনো সাধুবাবার কাছে ভিড়ানো খুবই কঠিন। কারণ তাঁদের সেই কর্ণধার সাধুবাবাটি তাঁর শিকার ছুটে যাওয়ার ভয়ে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকেন। যাঁরা কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর খপ্পরে পড়েন নি, তাঁরা এ বিষয়ে এতই উদাসীন যে, কাগজে কলমে প্রচার কার্য চালিয়ে বা সরাসরি তাঁদের সাথে দেখা করেও বিশেষ কোনো ফল হবে না।—

যেমন কুন্‌কী-হাতির সাহায্যে বুনো দাঁতাল হাতি ধরতে হয়, সেইরকম ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য নিযুক্ত ক’রতে হবে কয়েকটি বিশেষ ধরণের শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। তাঁরা ঐ সমস্ত গণ্যমান্য ধনী ভদ্র

মহোদয়দের অন্দরমহলে অথবা ড্রইংরুমে প্রবেশ করে প্রথমে বাগাবেন গিন্নী বা 'বেটার হাফ্'-টিকে। ঐটিকে বাগাতে পারলেই কর্তাটি ওঁর পিছনে সুরসুর করে এসে যাবেন। তাঁদের কোনো কর্ণধার সাধুবাবা থাকলেও তিনি কিছু ক'রে উঠতে পারবেন না। বাঙ্গালী সমাজের ওপর-মহলে হালফ্যাসানের ধর্মশীলা মহিলাবা ধর্ম বিষযে নূতনত্বের পক্ষপাতী।—

এই প্রকাবে কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে মহান্ত মহারাজের সম্মুখে একবার উপস্থিত করতে পারলেই কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। এই মহাতমার এমন সমস্ত আলৌকিক যোগৈশ্বর্য আছে যে, যে কোনো ব্যক্তির মাথা ঘুলিযে দিতে পারেন। যাঁরা একবার এঁর সম্মুখে আসবেন, আর তাঁদের ওপরে যদি এঁর কৃপা হয়, তবে তাঁবা আব এঁকে ছাড়তে পারবেন না। তখন দেখা যাবে সেই সমস্ত কৃপাপ্রাপ্ত শিক্ষিত ভদ্র-মহোদয়েরাই তাঁদের বন্ধুবান্ধব ধরে এনে, মহাতমার চরণতলে শরণ গ্রহণ করাবেন, এবং অবতারত্বে প্রমোশন দেওযার জন্য সর্বপ্রকারে সহযোগিতা ক'রবেন।—

প্রথমবার কলকাতায় দর্শন দানের পর প্রচার কার্যে আরও জোর দিতে হবে। ভাল ভাল নামকরা লেখক দিযে মহাতমার জীবনী, কার্যকলাপ, সাধনভজন ও উপদেশামৃত সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়ে, সংবাদ-পত্রে ছাপাতে হবে। বৎসরে দু'টো উৎসব করতে হবে। একটা আবির্ভাব-উৎসব, আর একটা সন্ন্যাস গ্রহণোৎসব। উৎসবের দিন এমনভাবে স্থির করতে হবে, যাতে সেদিন সরকারী ছুটি থাকে। উৎসবে নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ও ভাল খানাপিনার ব্যবস্থা করতে হবে। গান, কবিতা, প্রবন্ধ, সব মহাতমার মহিমা সম্পর্কে বিখ্যাত কবি ও লেখকদের রচনা হওয়া চাই। নাচ গানের জন্য ভালরকম প্রাইজ ঘোষণা করলে স্কুল-কলেজের ভাল ভাল লেড়কী পাওয়া যাবে।—

এই সমস্ত কাজ চালাতে যত টাকা লাগে লাগুক। পাঁচ-দশলাখ খরচ হলেও কুছপরোয়া নেই। সাধুবাবা যদি একবার অবতারত্ব—

নিতান্ত পক্ষে ১০০০৮ শ্রীপরমহংসত্ব লাভ করে তপোবনে বসতে পারেন, তবে সমস্ত ব্যয় সার্থক হয়ে যাবে।

ম্যানেজার ছোটে মহারাজের পরিকল্পনা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। চমৎকার পরিকল্পনা! ততোধিক চমৎকার তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অভিজ্ঞতা! এ প্রকার ধুরন্ধর চেলা না জুটলে কি আর এই ঘোর কলিকালে কোনো সাধু সন্ন্যাসী উন্নতি করতে পারেন!! এই পরিকল্পনাটা হয়েছিল ইংরেজ আমলে, কাজেই একটা ত্রুটি থেকে গেছে। উৎসবের দ্বারোদ্ঘাটন ও সভাপতিত্ব করার জন্য কোনো মন্ত্রী যোগাড় করার কথা বলেন নি।

আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ম্যানেজার একটা চমৎকার ছবি এঁকে দিলেন। মৃত্যুর পর যমযন্ত্রণা এড়িয়ে স্বর্গ বা মোক্ষের যে কোনো একটা খুশিমত ইনসিওর হ'য়ে তো থাকবেই, অধিকন্তু আমার পক্ষ হ'তে সাধন-ভজনের প্রিমিয়ামটাও মহাত্মাই চালিয়ে দেবেন। এই মিথ্যা সংসারে যেমন আছি তেমনি থাকতে চাইলে, অর্থাৎ মাথা নেড়া করে গেরুয়ালুঙ্গি পরেই কাটাতে চাইলে, নেড়ামাথায় যাতে রোদ-বৃষ্টি না লাগে তার জন্য জুড়িগাড়ী, গাড়ীবারান্দাওয়ালা আশ্রম, গরদের গেরুয়া, সব হয়ে যাবে। তার সাথে বাঙ্গালী সাধুবাবাদের ভোগে আর যা সমস্ত লাগে তাও প্রচুর মিলবে। আর যদি সাদী করে গৃহী হই, তবে সবচাইতে ভাল হয়। কারণ ইংরেজীওয়ালা বাঙ্গালীবাবুর মুখে ও লেখায়, সাধুসন্ন্যাসীর অলৌকিক কাহিনী প্রচার কার্যের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। ইত্যাদি।

প্রস্তাবে আমি মনে মনে সম্মত হয়ে গেলাম। মোক্ষ বা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য আমার কোনো কালেই মাথাব্যথা নেই। আমার মতলব—এই সুযোগে যদি আখেরটা গুছিয়ে নিতে পারি। ব্যাপার যা বুঝলাম তাতে, অবতারত্ব লাভের জন্য এরা বিশ-পঁচিশ লাখ টাকা অনায়াসে খরচ করতে প্রস্তুত, আর সে টাকা আমার হাত দিয়েই খরচ হবে। এককালে আমাদের পূর্বপুরুষ তাঁদের অপূর্ব বুদ্ধিবলে তের টাকা মাইনের মুৎসুদ্দিগিরি করে, কলকাতায় প্রাসাদ নির্মাণ করে লাখ লাখ টাকার কোম্পানির

কাগজ রেখে যেতেন। মফঃস্বলে পাঁচ টাকা মাইনের নায়েবমশাই বাড়ীতে দোতলা তুলে বারমাসে তেরপার্বণে ধুমধাম করে বিখ্যাত হতেন। যদিও আজ আমাদের ভাগ্যদোষে সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকৌশল বাঙ্গালীকে ত্যাগ করে রাজপুতনার মরুভূমি ও আরব সমুদ্রের পূর্ব-উপকূলে গিয়ে ভিন্ন রূপ ধরেছে, তথাপি তার কিছুই কি আমার মধ্যে নেই? নিশ্চয়ই আছে। আমার হাত দিয়ে যদি মহান্তবাবার বিশ লাখ টাকা খরচ হয়, তবে তা থেকে দশ লাখ না হ'লেও পাঁচ লাখ যে মেরে দিতে পারব, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। মহান্ত মহারাজকে অবতারত্বে ঠেলে তোলা? তা আমি পারব। এই ক'মাস সাধুগিরি করেই অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তারপর যদি প্রয়োজন হয়, তবে এ ব্যাপারে বড় বিশেষজ্ঞ শ্রীমৎ সদানন্দ অবধূত আছেন। তাঁর সুপরামর্শ চাইলেই পাব, এ ভরসা আমার আছে।

কালীশঙ্কর দাদার টাকা নেই নি, কারণ—সে টাকা তিনি দেশের কাজেই লাগাবেন। জেলেদের স্বেচ্ছার দান গ্রহণ করি নি, কারণ—তখন বিবেকে বেধেছিল। জমিদার মনিবের চাকরির আশা ত্যাগ করলাম, কারণ—তাতে নিরীহ জেলেদের ওপরে উৎপীড়ন ও শোষণ চালাতে হত। কিন্তু এই ধনী মহান্তবাবার টাকা মেরে দেবার মৎলবে সে সময়েও আমার মন পরিষ্কার ছিল, এখনও পরিষ্কার আছে। এই শ্রেণীর সাধুবাবারা হাজার হাজার সরলবিশ্বাসী নরনারীকে অহরহ প্রতারণা করে শোষণ ক'রছেন। এই প্রতারকদের একটার ট্যাঁক আমি যদি কিছুটা ফাঁক করি, আর তার জন্য যদি যমরাজার দরবারে সত্যিই কোনো দিন কৈফিয়ত দিতে হয়, তবে এমন আরগুমেণ্ট করব যে, যমরাজা তাঁর আইন সংশোধন করতে বাধ্য হবেন।

অপরাহ্ণে বিদায়ের সময় চেলামহারাজকে তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে জানালাম,—আমি বিষয়টা ভেবে দেখার জন্য কিছুদিন সময় চাই।

চেলামহারাজ তার উত্তরে জানালেন—আট দিন পরে দোল পূর্ণিমা। দোল শেষ হলেই এখানে সাধুমেলা শেষ হবে। মহান্তমহারাজের

ডেরা দ্বিতীয়া তিথিতে ভেঙ্গে দিল্লীর পথে যাত্রা করবে। অন্তত পাঁচদিনের মধ্যে তাঁরা আমার মতামত জানতে চান। আমি সম্মতি জানিয়ে বিদায় হলাম।

সময় নিলাম তার কারণ, ওদের নিকটে আরও একটু কদর বাড়ানো। নচেৎ তখন আর আমার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। কাকোরীমামলা শেষ হয়ে রায় বেরিয়েছে। রামপ্রসাদ বিস্মিল, ঠাকুর রোশনলাল, অক্‌ফাসউল্লা, রাজেন লাহিড়ী—চারজনের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। এদের জন্য কিছুই করা সম্ভব হয় নি। বুঝলাম পরাধীনতার পাহাড় তলে মরণসাগরে এ চারটি বজ্রও সামান্য একটু আলোড়ন দিয়ে ডুবে যাবে।

তা যায় যাক্‌, এর জন্য দুঃখ নেই। দুঃখ হত—এদের জীবন রক্ষার জন্য যে সমস্ত বিখ্যাত নেতা চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের মন্তব্য সংবাদপত্রে পড়ে।

আমার সেই মারাঠী সন্ন্যাসী বন্ধুকে সমস্ত বললাম। তিনি এ কাজে যেতে নিষেধ করলেন। আমার কিন্তু দারুণ ঝোঁক চেপে গেছে। বন্ধুর পরামর্শ সঙ্গত হলেও গ্রহণ করলাম না। পাঁচদিনের দিন যেয়ে ম্যানেজার মহারাজকে আমার সম্মতি জানিয়ে এলাম। যাত্রার পূর্বদিনে, সেই প্রথম মঠে এলে যে বৃদ্ধ মহাতমা আমাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, তাঁর সাথে দেখা ক'রে অকপটে সমস্ত বলে, বিদায়ের অনুমতি চাইলাম।

সমস্ত শুনে অতিপ্রশান্ত মুখে মহাতমা বললেন—জীবনে তোমার বহু অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজন আছে। পরমাত্মার ইচ্ছায় এও একটা সুযোগ। বেশ, তুমি যেতে পার। পরমাত্মাই তোমাকে রক্ষা করবেন।

যদিও এই যাযাবর সন্ন্যাসী দলে যোগ দেওয়া সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত ছিলাম, তথাপি মনের কোণে বেশ একটু অস্বস্তিও ছিল। কাজটা যে ভাল হচ্ছেনা, তাও বুঝি। এই মহাপুরুষের আশীর্বাদের

পব মনেব ভাব একেবাবে পরিবর্তিত হযে গেল। আগে ছিল মহান্তেব তবিল মেরে বড়লোক হওযাব চিন্তা। সে নেংবাভাব কেটে যেযে মনে জাগল এক নতুন অ্যাড্‌ভেঞ্চাবেব লোভ। আব তার সাথে দৃঢ় বিশ্বাস এল—এই সৎমহাপুরুষ যখন আশীর্বাদ কবে অনুমতি দিযেছেন, তখন এ অভিযানে আমাব কোনো বিপদ হবে না, অধঃপাতেও যাব না।

পথের ধারে একটি গ্রাম।

নির্দিষ্ট দিনে যাযাবব সন্নাসী-ক্যারাভানে যোগ দিলাম। সেবারের মত মহান্ত মহাবাজেব কুরুক্ষেত্র লীলা শেষ হযে সন্ধ্যায ক্যারাভান চলল গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক বোড ধরে দিল্লীব পথে। আমাবও আর একটা অভিনব যাত্রা হল সুরু।

সন্ন্যাসী দলে যোগ দিযে কযেক ঘণ্টাব মধ্যেই বুঝলাম, একমাত্র মহান্ত মহারাজ ও তাঁর ম্যানেজার ছোটে মহাবাজ ছাড়া অপব সন্ন্যাসীরা দলের গতিবিধি, ক্রিয়াকলাপ, আযব্যয প্রভৃতিসম্পর্কে কোনো খোঁজ রাখে না, রাখার নিয়মও নেই।

একালে ক্রীতদাস-প্রথা নেই। সেজন্য ক্রীতদাসের অবস্থা কি ছিল, তা বই-পুস্তক প'ড়ে কিছুটা ধারণা করি মাত্র। সে ধারণার মাপকাঠি দিয়ে মেপে দেখলে এই সব সন্ন্যাসী মহান্ত-মহারাজদের অধীনস্থ সাধারণ চেলাসন্ন্যাসীদের অবস্থা বিশেষ উন্নত নয়।

বাংলাদেশেও দেখেছি বহু মঠ, আশ্রম ও গোস্বামী প্রভুদের শ্রীপাটে, মোক্ষলাভ অথবা ব্রজপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়ে সরল প্রকৃতির নরনারীদের গুরুসেবা—তথা গুরুর সংসার সেবায় নিযুক্ত করা হয়।

স্বাধীনতা বলে তাদের কিছু নেই। নিজস্ব সাধন-ভজনও প্রায় কিছুই নেই। গুরুবাবারা শুনান,—গুরুসেবাতেই চতুর্বর্গলাভ হবে। কিন্তু যদি কেউ গুরুবাবাদের জিজ্ঞাসা করেন—তাঁরা কেমন গুরু-সেবা করেছেন? তবে অনেক বাবাজীরই চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠবে।

আমাদের ক্যারাভানে পাঁচখানা দোতলা উটের গাড়ী, আর সাতখানা বলদের গাড়ী বোঝাই হয়ে মালপত্র ও ছত্রিশজন সন্ন্যাসী চলেছি। এ ছাড়া তিনটে ঘোড়া ও বারোটা গাইগরু বাছুর সমেত দলে আছে।

গাড়ী সব চার চাকার। উটের গাড়ী দোতলা, বলদের একতলা। বলদের গাড়ী একতলা হলেও বাংলাদেশের গাড়ী অপেক্ষা অনেক বড়। যে বলদে সে গাড়ী টানে, তার ধারণা না দেখে আমরা করতে পারি নে। তবে যাঁরা কলকাতা-বড়বাজারে সমস্ত প্রচলিত আইন শৃঙ্খলার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ—থুড়ি, পুচ্ছপ্রদর্শন পূর্বক স্বচ্ছন্দ-বিচরণশীল বৃষমহারাজ ও মা-ভগবতী-গাভীকুল দেখেছেন, তাঁরা সিন্ধী ও পাঞ্জাবী গরুর আকার কতকটা বুঝবেন। এই বলদগুলো যেমন মাল টানে, তেমনি চলে ঘণ্টায় চার মাইল।

চৈত্রমাস, দিনে গরম রাতে শীত। শীত বাত ন'টার পর পশ্চিমে হাওয়ার সাথে দেখা দেয়। সন্ধ্যার প্রায় দু'ঘণ্টা পূর্বে আমাদের যাত্রা সুরু হয়েছে। একখানা দোতলা উটের গাড়ীর ওপরতলায় গদীর ওপরে বড় তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছি। সাথে আছে চোদ্দ-পনরো বছর বয়সের এক বাচ্চা সন্ন্যাসী। আমি নিজে ম্যানেজার ছোটেমহারাজকে বলে ছেলেটিকে সাথে নিয়েছি।

ছেলেটির নাম বিট্‌ঠল দাস। প্রাতে থানেশ্বর মঠ হতে এসে এই সন্ন্যাসীদলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই ছেলেটি সময় ও সুযোগ পেলে আমার কাছে আসে; আমার দু'একটা ফাইফরমাশ পেলে, তা করে যেন বেশ খুশী হয়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। গাড়ীর ওপরে বসে দেখছি সম্মুখে আমাদের দলবল, আর রাস্তার দু'ধারে খেজুরগাছের ফাঁক দিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ।

মাঠের এখানে ওখানে দু'একখানা গ্রামও চোখে পড়ে। সে গ্রাম বাংলামায়ের শ্যামলী শাড়ীর আঁচল-ঢাকা চড়াই, শালিক, দোয়েলের কাকলি কূজিত কুঞ্জ-কুটির-পল্লী নয়। এ অঞ্চলে গ্রামের চেহারা দূর হতে বাঙ্গালীর চোখে খোলা-খাপরার স্তূপ, বা ভাঙ্গা ইটের পাঁজা বলেই মনে হবে। মাঝে মাঝে এমন গ্রাম দেখা যায়, যাকে এক একটা ছোট দুর্গ বললেই ঠিক পরিচয় হয়।

ইংরেজ আমলের পূর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মারাত্মক ডাকাতের উপদ্রব ছিল। এই ডাকাতেরা ভারতের পশ্চিম-উত্তর সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী। এরা বড় বড় দলে ঘোড়া ও উটে চ'ড়ে এসে গ্রামকে গ্রাম লুঠ ক'রে যুবতী মেয়েগুলি ধরে নিযে যেত। এই ডাকাতদের ঐতিহ্যই বহন ক'রে চলেছে বর্তমানে বিখ্যাত 'হুড় দস্যু' দল। আশ্চর্যের বিষয় হাজার বছর পূবে ঐ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলই অতিশয় উন্নত সুসভ্য গান্ধার, কেকয়, উত্তর কুরু, প্রভৃতি নামে বিখ্যাত ছিল।

ইংরেজ সরকার ঐ সীমান্তে 'ডুরাণ্ডলাইন' করে, হুড় ডাকাতের উপদ্রব অনেকটা কমিয়েছিলেন। ইংরেজ আমলের পূবে ধনী গ্রামবাসীদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল এইসব গ্রাম্য দুর্গ, তাদের আত্মরক্ষার জন্য।

সূর্য অস্তে যাওয়ার পর বেশ একটু বসন্তের আমেজ লাগছে। একটা গ্রামের পাশ দিয়ে রাস্তা চলেছে। রাস্তায় বা ধারেকাছে একটি প্রাণীও দেখলাম না। গ্রামটা যেন প্রেত পুরী।

বিস্মিত হয়ে অনুসন্ধান করে শুনলাম, গ্রামে জনপ্রাণী নেই। কিছুদিন পূর্বে গ্রামে কয়েকজন প্লেগে মারা গিয়েছে। তাদের মৃত্যুর কারণ প্রকাশ হওয়ামাত্র সমস্ত গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। অন্তত দেড়মাসের মধ্যে ও গ্রামে চোরেও চুরি করতে আসবে না।

এসব দেশের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা মহামারীকে অত্যন্ত ভয় করে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পল্লীগ্রামে, গ্রামের বাইরে একটা জায়গায় অনেকগুলো নিমগাছ থাকে। গ্রামে কারো কলেরা বা বসন্ত

রোগ হলে, তাকে খাটলিতে করে এনে, ঐ নিমগাছের তলায় রাখে। রোগ সারলে আবার গ্রামের মধ্যে বাড়ীতে যায়, নইলে নিমগাছতলা হতেই শ্মশানযাত্রা করতে হয়।

গ্রামে পাঁচ-সাতটা বসন্ত বা কলেরা রোগী দেখা গেলেই সকলে বুঝে নেয়, মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন সকলে গ্রাম ছেড়ে পালায়। অনেক সময় দেখা যায়, নিমগাছতলায় জ্যান্ত রোগী দু'তিনটে পড়ে আছে কিন্তু গ্রামে একটি মানুষও নেই।

প্লেগের আতঙ্ক আরও বেশী। যদি শুনল গ্রামে একটি লোক প্লেগে মরেছে, তবে যে যে অবস্থায় থাকে, সে সেই অবস্থায়ই পালায়।

বাংলাদেশের মহামারীর কাহিনী কিন্তু অন্য প্রকার। যশোর জেলার গদখালী, ফরিদপুর জেলার বেনেবৌ (বানিয়াবহ), মালদহের গৌর, প্রভৃতি মহামারী বিধ্বস্ত গ্রাম ও নগরের কাহিনীতে দেখা যায়—অধিবাসীরা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মহামারী প্রতিরোধের চেষ্টা ক'রে পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটে আগলে থেকে মরেছে, পালায় নি।

বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—যদি বিধর্মীর হাতে তাদের পুরনারীর সম্ভ্রম হানির সম্ভাবনা দেখা না দেয়, তবে তারা কোনো বিপদের সম্মুখেই ভয় পেয়ে পালায় না।

ঐতিহাসিকের অবহেলায় ও কারসাজিতে বাঙ্গালীর যুদ্ধকাহিনী আমরা অতি অল্পই জানতে পাই। যেটুকু জানতে পাই তাতেও দেখি, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের মুখে পলায়ন বাঙ্গালীর কোষ্ঠীতে এপর্যন্ত বিধাতা লেখেন নি।

ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর ভাগ্যে কি ঘটবে তা নিয়ে কিন্তু চিন্তা করার কারণ দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই ক'বছর ধরে অহিংস আন্দোলনে সুপরিপক্ক নেতৃত্বে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক-কিশোরেরা তাদের দাবী পূরণের জন্য যে আন্দোলন-কৌশল প্রয়োগ করছে, তার প্রতিক্রিয়ায় অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী একটা কাপুরুষ জাতিতে পরিণত হতে পারে।

১৯৪২ এর 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের সময় নবদ্বীপে পোড়ামা-তলায় এক বড় জনসভার ওপরে পুলিস লাঠি-চার্জ করে। পাঁচমিনিট পরে দেখা গেল গাড়ীখানেক জুতো পড়ে আছে। বক্তাদের আসনের কাছেও কয়েক পাটি দামী জুতো পাওয়া গিয়েছিল।

কলকাতায়ও 'আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে গদী ছাড়তে হবে' আন্দোলনের শোভাযাত্রায় যদি লাঠিচার্জ বা কাঁদুনে গ্যাসের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে শিশুকোলে ঝাণ্ডাধারিণীদের ফেলে চোঙাওয়ালারা বেমালুম খসে পড়েন। সেই ১৯২৭-এ কিন্তু এ রকম বীরত্বের কথা বাঙ্গালীর চিন্তার বাইরে ছিল।

সে দিন পানিপথের রাস্তায় গাড়ীর ওপরে বসে সেই সন্ধ্যার আলো আঁধারে মৃত্যুবিভীষিকা ঘেরা নিঝুম গ্রাম খানা দেখে, একটা কাহিনী মনে পড়েছিল। কাহিনীটা শুনেছিলাম, পাবনা জেলার রতনগঞ্জ গ্রাম নিবাসী গোবিন্দ চাকীমহাশয়ের মুখে। যখন গল্পটা শুনি, তখন আমার বয়স তের-চোদ্দ, আর চাকীমশাই অতিবৃদ্ধ।

ঘটনার সময় চাকীমহাশয়ের বয়স তিরিশের নীচে। খুব শক্তিশালী সাহসী যুবক। তাঁর সাহসে সাহসী হয়ে, অমাবস্যার রাত্রেও মড়া নিয়ে পিড়েনীতলার ভূতুড়ে শ্মশানে যেতে কেউ ভয় পেত না।

চকীমহাশয়ের মাতুলালয় ফরিদপুর জেলায় রাজবাড়ীর চার মাইল দক্ষিণে বেনেবৌ গ্রামে। গ্রামটা বড়, তৎকালে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। গ্রামটা আমি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দেখেছিলাম। তখনও সে গ্রামে বড় বড় দালানবাড়ী, পুকুর-পুষ্করিনী জঙ্গল হয়ে প'ড়ে আছে।

বেনেবৌ গ্রামে পুষ্করা-মড়ক লেগেছে। সে সংবাদ চাকী-মশাইর কানে পৌঁছল। মামা, মামী, মামাত ভাই-বোনদের খোঁজ নিতে একদিন চাকীমশাই বাড়ী থেকে খাওয়াদাওয়া সেরে যাত্রা করলেন।

মাঝখানে পদ্মানদী পার হতেই পশ্চিম আকাশে সূর্যদেব হয়ে গেলেন। লাল রাজবাড়ী পৌঁছুতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। বেনেবৌ গ্রামের সীমানায় এসে বৈশাখী রাত আটটা হল।

গ্রামে ঢুকে দেখেন, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। কোনও বাড়ীতে প্রদীপের আলো দেখা যায় না। কোনো কোনো বাড়ীর নিকটে ভয়ানক পচাগন্ধ। জায়গায় জায়গায় শিয়ালে কি যেন টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সাহসী চাকীমশাই পথের ক্লান্তি বশতই হোক, অথবা অন্যকারণেই হোক, তখন কিন্তু ও সমস্ত ব্যাপার দেখেও আমল দিলেন না।

মামাবাড়ীর দরজায় পৌঁছে দেখেন সদর দরজা খোলা। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদের আলোয় ভিতরে প্রবেশ করে, মামীমা কেমন আছেন,—বলে চাকীমশাই হাঁক দিলেন।

মামীমা কোনো সাড়া দিলেন না, সাড়া দিলেন বড় ঘরের ভিতর থেকে মামা,—

কে? ওঃ, গোবিন্দ! এস বাবা এস। তোমার মামী কি আর আছে। তার পাঁচটা ছেলে মেয়ে যাত্রা করিয়ে দিয়ে, সেও আজ তিন দিন হল চলে গেছে। বাবা, তুমি এ ঘরে এস না। আমার অবস্থাও ভাল নয়। বাইরে বারান্দায় চক্‌মকি, শোলা, গন্ধকের কাঠি সমস্ত আছে, ভাঁড়ারঘর হ'তে প্রদীপ এনে ধরাও। কূয়োর জল তুলে, হাত মুখ ধুয়ে, একটু বিশ্রাম ক'রে, দুটো রান্না করে খাও। ভাঁড়ার ঘরে সব আছে। বাবা, কিছুরই অভাব এ সংসারে ছিল না, আজ সব শেষ হয়ে গেছে। বাপ-ঠাকুরদাদার সাত-পুরুষের ভিঁটেয় বাতি দিতে আর কেউ থাকল না।—এই বলে মামা অতি দুর্বল কণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন।

চাকীমশাই কিছুক্ষণ অভিভূতের মত বসে থেকে, মামার কথামত হাত পা ধুয়ে প্রদীপ ধরালেন। প্রদীপ নিয়ে ভাঁড়ারে প্রবেশ করে দেখলেন, চাল, ডাল, তেল, ঘি, মশলা, বাসনপত্র, সমস্ত পরিপাটি করে

সাজানো আছে। তার সাথে চোখে পড়ল লক্ষ্মীর আসনের তলায় একটা পিতলের সরায় অন্তত একসের ঘি দিয়ে মোটা সলতেয় ধরানো হয়েছিল দত্তবাড়ীর শেষ বাস্তু-প্রদীপ। সে প্রদীপ জ্বলে নিভে গিয়েছে, তথাপি তখনও সে গৃহের অতীত সুখসৌভাগ্যের স্মৃতি বহন করছে। দেখে চাকীমশাযেব চোখেও জল এল।

ছোট একখানা পিতলেব সরায় খিঁচুড়ি রান্না কবে খেয়ে নিয়ে, চাকীমশাই মামার ঘরের সম্মুখে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি শোবেন কোথায়।

মামা বললেন—বাবা গোবিন্দ, তুমি বহু পথ হেঁটে এসেছ, শ্রান্ত-ক্লান্তও হযেছ—তা বুঝি। কিন্তু এই রাতটা আর ঘুমিও না। বাত্রি বোধ হয় দুপুব হ'তে চলল, অবশিষ্ট রাতটুকু এই বারান্দায বসেই কাটাও। এ ঘরে আর রাত্রে এস না। বুঝতেই তো পারছ বাবা, এঘরেব অবস্থা। রাত প্রভাত হলে, দিনেব আলোয দেখেশুনে যা হয ক'রো। এখন তুমি এই ঘবের দরজার বাইরে বারান্দায় ব'স। তোমার সাথে অনেক কথা আছে। কথাগুলো তোমাকে না বলতে পারলে আব আমার এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই। তুমি সাহসকবে এসে আমাকে বাঁচিয়েছ। আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী সুখী হও।

চাকামশাই মামার ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় দরজা থেকে দূরে বসলেন। দরজার নিকট দিয়ে দু'তিনবার যাতায়াতেই বুঝতে পেরেছেন, মামা কেন ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করছেন। চাকীমশাই মনে মনে স্থির করলেন, কোনো প্রকারে রাত্রিটা কেটে গেলে, দিনের আলোয় দেখে শুনে ঘরটা পরিষ্কার করে, মামার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। আপাতত মামার পরামর্শ মত রাত্রিটা বারান্দায় বসে গল্প করেই কাটিয়ে দেবেন।

চাকীমশাই স্থির হয়ে বসলে মামা তাঁর দুঃখের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

বাবা গোবিন্দ, আর পনরোটা দিন আগেও যদি তুমি আসতে, তবে বোধ হয় ছেলে-মেয়ে ক'টা তোমার সাথে পাঠিয়ে দিয়ে, তাদের বাঁচাতে পারতাম। সবই ভাগ্য। বিধাতা দত্তবাড়ীর বাস্তুপ্রদীপ নিভিয়ে দেবেন, কে তার বাধা দেবে!

এই বলে মামা কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ কেঁদে একটু সুস্থ হয়ে, আবার বলে চললেন—বাবা, গত চৈত্র মাসের শেষে, ভট্‌চাজ্ পাড়ায় প্রথম ওলাউঠা দেখা দেয়। কয়েক-দিনের মধ্যেই সে ব্যায়রাম পুষ্করায় পরিণত হল। যাকে ছোঁয়, সে আর বাঁচে না। বাড়ীকে বাড়ী সাবাড় হতে লাগল। আমাদের পাড়ায় আমরা যতদূর পারি সাবধান হলাম। একদিন প্রাতে দেখা গেল, মিত্তির বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে খানিকটা মড়ার নাড়ীভুঁড়ি পড়ে আছে। সেই দিনই আমাদের পাড়ায় পুষ্কবা লাগল।—

ছেলেপুলেগুলোও সরানো গেল না। একটা যায়, আর একটা বিছানায় থাকে! কা'কে ফেলে কা'কে সরাব? প্রথম গেল ছোট-মেয়েটা মাত্র এক প্রহব ভুগে। তারপর তিন দিনে আর চারটে চ'লে গেল। আশ্চর্য! তারা একটু কাঁদল না, ভয়ও পেল না। কেবল প্রথম বলতো—'পেট ব্যথা করছে'। তারপর একটু বমি করে শুলো, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ ঘুম ঘুমিয়ে পড়ল।

পাঁচটা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন পুষ্করা দেবী বোধহয় ছ'দিনের জন্য এ বাড়ী ত্যাগ করেছিলেন। সে ছ'দিন তোমার মামী প্রায়ই আমাকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে বলত। কিন্তু কি করে পালাই? তোমার মামী তার শ্বশুরের ভিটের প্রদীপ নিভিয়ে পালাবে না। তাকে ফেলে আমিই বা যাই কি করে?—

শেষ ছেলেটা মারা গেলে ছ'দিন কেটে গেল। প্রথম মেয়েটা ও পরে বড় ছেলেটা মারা গেলে তোমার মামী কেঁদেছিল। আর তিনটের বেলায় কাঁদেনি, কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব তার হয়েছিল। ছ'টা দিন এমনি ভাবেই গেল।

ছয়দিনের শেষ রাত্রে তার হাতের ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠে বসতেই আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে জানালো, এবার তার ডাক পড়েছে। কাতরকণ্ঠে মিনতি করে বলল—তুমি আমাকে একা ফেলে যেতে পারবে না, তা আমি বুঝি। কিন্তু এখন আর সে বাধা নেই। আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব ছেড়ে যেতে হবে। দুঃখ ক'রো না, তুমি বেঁচে থাকলে শ্বশুরের ভিটেয় আবার প্রদীপ জ্বলবে পূর্বপুরুষের জল-পিণ্ড লোপ হবে না। তুমি এখনই পালাও। আমার দেহটার জন্য আর অপেক্ষা ক'রো না। পালাও।—

এই বলতে বলতে একটু বমি করেই আমার পায়ের কাছে নেতিয়ে পড়ল। আর কথা বলতে পারল না। দু'চোখ দিয়ে কেবল অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে হাতের ইসারায় আমাকে পালাতে অনুরোধ করেছিল মাত্র, কথা আর বলতে পারল না।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমি, একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। অন্যদিন যেমন প্রভাত হয়, সেদিনও বোধ হয় তেমনি করেই প্রভাত হয়েছে। বোধ হয় তেমনি করেই সূয উঠেছে। সে সূর্যের আলো তেমনি করেই আমার বিছানায় এসে পড়েছে। নীরব নিস্তব্ধ উদাস আমি, যেন হঠাৎ দেখলাম, সে ঘুমিয়ে পড়েছে! বুঝলাম ও ঘুম আর ভাঙ্গবে না।—

উঠতে হল। যাকে একদিন বহু আত্মীয় স্বজনে মিলে বাজি-বাজনা আনন্দ-কোলাহল করে এ বাড়ীতে এনেছিলাম, আজ শেষ দিনে তাকে বিদায় দিতে আছি কেবল আমি। তবুও মনে ভাবলাম, তাকে সাজিয়ে এনেছিলাম, সাজিয়েই বিদায় দেব।—

বাক্স খুলে তার ভাল শাড়ীখানা আর এক সেট গয়না বের করলাম। ভাল ক'রে সব পরিয়ে, কপালে দিলাম সিঁদূর, পায়ে দিলাম আলতা। তারপর নিয়ে গেলাম বুকে তুলে খিড়কি পুকুরের পাড়ে কাঁঠালতলায়; যেখানে মাটির তলায় শুয়ে আছে তারই পাঁচ পাঁচটা কচিঁ ছেলে মেয়ে।—

কোদাল দিয়ে গর্ত করতে অনেক সময় লাগল। পছন্দ মত গভীর গর্ত কাটা যখন শেষ হল, তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়েছেন।—

আর একবার তার কাছে ব'সে, সিঁদূর মাখা শান্ত মুখখানা শেষবারের মত প্রাণভরে দেখে নিয়ে, যে হাতে তার হাত ধরে গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে এনেছিলাম, সেই হাতেই তাকে এই বাড়ীর সীমানার মধ্যে মাটির তলে চিরতরে অদৃশ্য করে দিলাম। একটু চোখের জল পড়ল না, বোধ হয় একটা দীর্ঘশ্বাসও আমার বুক ফেটে তখন বের হয় নি।—

সব শেষ করে, পুকুরে স্নান করলাম। তারপর ভিজে কাপড়েই শূন্য ঘরের বারান্দায় বসে ছিলাম। কিছু করার নেই, কিছু ভাবার নেই। কখন যে সূর্য অস্ত যেয়ে সন্ধ্যা হয়েছে তাও খেয়াল নেই। হঠাৎ যেন মনে হল, আমার পেটে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। প্রথম ভাবলাম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেটে কিছু পড়েনি, তাই বোধহয় পিত্তের প্রকোপ! কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম—এ তা নয়, এবার দত্ত-বাড়ীতে পুষ্করাদেবী তাঁর শেষ বলি গ্রহণ করবেন।—

উঠলাম। কাপড় ছেড়ে গরদের কাপড়খানা পরে সিন্দুক খুললাম। যা কিছু টাকা পয়সা সোনা দানা ছিল, তা একটা পিতলের হাঁড়িতে ভ'রে, পিতলের সরা দিয়ে হাঁড়ির মুখ ভাল করে বন্ধ করলাম। তারপর সেই কাঁঠাল তলায় তোমার মামীর শিয়রের কাছে দু'হাত মাটির তলায় সেটাকে পুঁতে, তার ওপরে চাপিয়ে দিলাম একগাদা ছেঁড়া বিছানা আর কাপড়, যাতে শীঘ্র কেউ ওর নিকটে না যায়। বাবা গোবিন্দ, তুমি কাল দিনের বেলায় ওটা তুলে নিয়ে যেও। যে সমস্ত ছেঁড়া বিছানা ওখানে গাদা দেওয়া আছে, ওগুলো দূষিত নয়।—

গহনা পুঁতে ফিরে এসে, ভাঁড়ার ঘরের গঙ্গাজলের কলসী থেকে গঙ্গা নিয়ে, সমস্ত ঘর-দুয়োরে ছিটিয়ে দিয়ে, তুলসী বেদীর তুলসী গাছে শেষ-বারের মত গঙ্গাজল প্রদীপ দিলাম। তারপর একখানা পিতলের সরা ভ'রে ঘি নিয়ে প্রস্তুত করলাম দত্ত-বাড়ীর ভিটের বাস্তুপ্রদীপ। সেই সাত পুরুষের সোনার মোহরটা সমেত লক্ষ্মীর কৌটাটা বাস্তুলক্ষ্মীর

বেদীর ওপরে রেখে, জ্বেলে দিলাম শেষ প্রদীপ। তারপর প্রণাম করে একটু গঙ্গাজল খেয়ে, এসে শুয়েছি আমার এই শেষ শয্যায়।

মামার কাহিনী শুনতে শুনতে চাকীমশাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এর পর মামা আরও কিছু বলেছিলেন কিনা, তা তিনি শোনেন নি।

যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গল, তখন রৌদ্রে উঠান ভরে গিয়েছে। উঠে মামার ঘরের দরজার কাছে যেয়ে, কয়েকবার মামা মামা বলে ডাকলেন, কোনো সাড়া পেলেন না। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, মামা চাদর গায় দিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর পিঠের কাছে বাড়ীর পোষা বিড়ালটা শুয়ে আছে। মামা গভীর ঘুমে ঘুমিয়েছেন মনে করে, চাকীমশাই আর ডাকলেন না, হাত মুখ ধুতে গেলেন।

হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে চাকীমশাই ঢুকলেন মামার ঘরে। ঘরে খুব দুর্গন্ধ। মামার মাথার ওপরে বহু মাছি বসে আছে। আরও কয়েকবার মামা মামা বলে ডেকেও যখন সাড়া পেলেন না, তখন বিছানার কাছে এগিয়ে যেয়ে, মামার মুখ দেখে ভয়ে ভয়ে গায়ের চাদর-খানা সরিয়ে যা দেখলেন, তাতে চাকীমশায়ের চক্ষুস্থির। বহু মড়া পুড়িয়েছেন চাকীমশাই, মড়া দেখে বলতে পারেন—লোকটা কতক্ষণ মরেছে।

ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি থাকল না। কি করা কর্তব্য একটু ভেবে নিয়ে, চাকীমশাই পাড়ায় বেরুলেন। কোনো বাড়ীতেই বাইরে থেকে ডেকে সাড়া পেলেন না। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে পোষা কুকুর উন্মাদের মত বাধা দেয়। বুঝা গেল, কোনো বাড়ীতেই ডাকে সাড়া দেবার মত মানুষ নেই।

ফিরে এসে মামীর সমাধির পাশে সেই বিছানা-কাপড়ের গাদা সরিয়ে, মাটি খুঁড়ে পেলেন সঞ্চিত ধন। তারপর গর্তটা গভীর করে খুঁড়ে রেখে, গেলেন মামাকে আনতে। ঘরে প্রবেশ করে দেখেন, বিড়ালটা মামার মুখের কাছে বসে কাতর কণ্ঠে ডাকছে, আর মাঝে মাঝে মামার গায়ে থাবা দিচ্ছে, গা ঘষছে। বিড়ালটা বাড়ীর

সকলেরই বড় আদরের, দেখতেও যেমন সুন্দর, তেমনি হৃষ্টপুষ্ট ছিল। সেদিন সে জীর্ণশীর্ণ, যেন শেষ নিশ্বাস নেবার জন্য ধুঁকছে।

চাকীমশাই মামাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে, নিয়ে গেলেন কাঁঠাল-তলায়, বিড়ালটা সাথে সাথে গেল। মামাকে নামিয়ে দিলেন গর্তের মধ্যে, বিড়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়ল মামার পাশে। তারপর চাকীমশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার সে কি ব্যাকুল আর্তনাদ!

উপায় নেই। একটা দড়ি এনে বিড়ালটাকে কাঁঠাল গাছের সাথে বেঁধে রেখে চাকীমশাই মামার শেষ কৃত্য করলেন। স্নান করে বিড়ালটা নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে যেয়ে খুঁজে চিড়েমুড়ি বের করে তাকে খেতে দিলেন—খেল না।

মামার সেই সঞ্চিত ধন আর লক্ষ্মীর কৌটাটা চাকীমশাই পোঁটলা বাঁধলেন। ঘিয়ের ভাঁড়ে আর যেটুকু ঘি ছিল, তা দিয়ে আর একবার দত্তবাড়ীর বাস্তুপ্রদীপ ধরালেন। বাস্তুলক্ষ্মীর বেদীমূলে প্রদীপ দিয়ে, প্রণাম করে, পোঁটলা আর বিড়ালটা নিয়ে যাত্রা করলেন চাকীমশাই।

বাড়ীর বাইরে আসতেই বিড়ালটা ভয়ানক বিদ্রোহী হল, কোনো প্রকারেই তাকে সংযত করা গেল না। ছেড়ে দিতেই পুনরায় তার প্রিয়জনের লীলাভূমি মৃত্যু-বিভীষিকা ঘেরা সেই বাড়ীতেই প্রবেশ করল। একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল চাকীমশায়ের অন্তরের অন্তস্তল থেকে। তিনি বাড়ীর পথ ধরলেন।

পানিপথের পথে।

আমাদের ক্যারাভান চলেছে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধ'রে। পানিপথে পৌঁছে রাত্রের বিশ্রাম হবে। পথে ডাকাতের ভয় আছে, সে জন্য চেলা সন্ন্যাসীরা সকলেই সশস্ত্র হয়ে চলেছে। সন্ন্যাসীদের যদিও বন্দুক নেই, কিন্তু একটা মারাত্মক জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে গুলতি। ছোট ছোট লোহাব গুলতি ধনুকের সাহায্যে চোড়া হয়। আর এক প্রকার দড়িব ফাঁসের সাহায্যে চোড়ে বড় গুলতি। এই বড় গুলতি এমন সাংঘাতিক যে, একশ'গজ দূর থেকে একটা বড় ঘোড়া বা উটের পক্ষে একটা গুলতিই যথেষ্ট।

বাত্রি দশটার মধ্যেই পানিপথে পৌঁছে যাব বলে শুনলাম। গাড়ীর ওপবে আরামে বসে নানা কথা ভাবছি। মনের মধ্যে কে যেন সুনিশ্চিত ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে—এ সন্ন্যাসীদলে বেশীদিন থাকা চলবে না। ফলে মহান্তবাবাকে অবতার-বাবা তৈরী কবে আমার আখের গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ যখন হবে না, তখন ও বিষযে পরিকল্পনা প্রস্তুত করার চেষ্টা নেই। মন বেশ ফাঁকা। পাড়াগাঁয় যাত্রাগানের পূর্বে ফাঁকা আসরে, যেমন পাড়ার চঞ্চল ছেলে মেয়ে গুলো হুটোপুটি মাতামাতি করে, আমার মনেও সেই রকম নানা আজেবাজে চিন্তা জড়াজড়ি করতে লাগল। যা দেখছি, তাই নিয়েই একটু ভাবি। পথের ধারে অজস্র খেজুরগাছ, সে খেজুর গাছও খানিকটে ভাবিয়ে দিল।

বাঙ্গলার বাইরে বহুদেশেই খেজুর ও তাল গাছ আছে। তাল ও খেজুর গাছে রস পাওয়া যায়—এ সন্ধান সকলেই জানে। আশ্চর্যের বিষয় এক বাংলাদেশে বাঙ্গালী ভিন্ন আর কোথাও কেউ তাল-খেজুরের রসে দেব-ভোগ্য নলেন গুড়-পাটালি তৈরী করে না। অবাঙ্গালীরাও তাল-খেজুরের রস খায়—বরং বাঙ্গালীদের চাইতে বেশীই খায়, আর তার জন্য লাইসেন্স ট্যাক্স প্রভৃতিতে বেশ পয়সাও খরচ করে। কিন্তু সে রস বাঙ্গালীর মন মাতানো 'তাতারসী' বা জিরেন কাটের খেজুর রস

নয়। তারা যে রস খায়, তার গন্ধে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের নাকে কাপড় দিতে হয়।

তাল-খেজুরের রস-তাড়ি যারা খায়, তারাও অবশ্য এতে যথেষ্ট আনন্দ পায়, নইলে তাড়ির পিছনে এত পয়সা খরচ করবে কেন? সেই জন্যই মনে হয়, এই ভারতেরই একটি প্রদেশ বাংলা, আর সেই বাংলার বাঙ্গালীদের রুচির সাথে অপরাপর সকলের কোথায় যেন একটা অমিল আছে।

ধর্মকে নেপথ্যে সরিয়ে রেখে, এক জাতি, এক সমাজ, এক ভাষা, এক সভ্যতা গড়ে তোলার যে চেষ্টা ভারতে চলছে, তাতে যদি সত্যই কোনো দিন উৎসাহী নেতাদের উচ্চকণ্ঠ ও মূল্যবান প্রবন্ধস্তূপ হতে সেই অপূর্ব খিঁচুড়ি বাস্তবরূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে, তবে আমরা বাঙ্গালী—যুগধর্মবশত সংখ্যা-গরিষ্ঠের দাবী মেনে নিয়ে, নলেন গুড়-তাতারসী ছেড়ে, তাড়ি খেয়ে আনন্দে রাস্তায় গড়াগড়ি দেব কিনা? অথবা বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালীর গৌরব নলেন গুড়পাটালির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে, অবাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠের দুয়োরে দুয়োরে ফিরি করেও তাদের ঐতিহ্য—তাড়ি ছাড়িয়ে, আমাদের ঐতিহ্য—তাতারসী, নলেন গুড়-পাটালি ধরাতে পারব কি না? এটা একটু ভেবে দেখা নেতাদের পক্ষে বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

এ সম্পর্কে একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা লক্ষ্য করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেস হতে মাদকবর্জন-প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়ে, নিজহাতে কুড়াল ধরে, মাদক-তাড়ি উৎপাদক তাল-খেজুর গাছকাটা ব্রতের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন, তখন কিন্তু তিনি তাল-খেজুরের তাড়ি না ক'রে, বাংলাদেশের বাঙ্গালীর আদর্শে সুগন্ধি সুখাদ্য নলেন গুড়-পাটালি ক'রে খেতে উপদেশ দেন নি। বাংলাদেশের বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্য 'জাতির জনকের' জানা না থাকার কথা তো নয়!!

এই রকম নানা কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি। বিট্‌ঠল দাস ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটা সারাদিন খাটে। দলের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা অল্প

বয়সী। সকলের আদেশই তাকে পালন করতে হয়। সে দিন কুরুক্ষেত্রে ডেরা ভাঙ্গতে খুবই খাটতে হয়েছে। আমার গাড়ীতে আসার পর তাকে আর কেউ ডাকে নি। অবকাশ পেয়ে পরিশ্রান্ত বালক অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার ধারের খেজুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে এক এক ঝলক্ চাঁদের আলো স্নেহময়ী মায়ের আঁচলের মত ছেলেটার মুখে বুলিয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত কচি মুখ, সরলতা পবিত্রতা মাখা।

এই কচি বালক কেন সন্ন্যাসী হল? ছেলেটার কি মা-বাপ নেই? এই সন্ন্যাসীদলে এ কি করে এল? যে সংসারের কিছুই জানে না, সে সন্ন্যাসের তাৎপর্য কি বুঝবে! এক দিনেই লক্ষ্য করেছি, আর পাঁচটা ছেলের মত এও একটু মিষ্টিমুখ, একটু স্নেহ-মমতার কাঙ্গাল। সে স্নেহ-মমতা-মিষ্টিমুখ এই স্বভাবরুক্ষ যাযাবর সন্ন্যাসীর দলে পাবে কি করে? আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা দূরে থাক, একদিনেই যা দেখলাম তাতে দলের সকলেই ছেলেটাকে নিরীহ পশুর মত খাটায়, কাজে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেই তিরস্কার করে, বোধ হয় মারেও। এ অবস্থায় এই বালকের ভবিষ্যৎ কি?

দলের মালিক মহান্ত মহারাজের চরম লক্ষ্য—অবতারত্ব লাভ। প্রধান চেলা ছোটেমহারাজের লক্ষ্য—গুরুজীর দেহান্তে তাঁর গদীর অধিকারী হওয়া। এই দু'জন বাদে অপর চেলা-সন্ন্যাসীদের যে কি লক্ষ্য, তা বুঝা দুষ্কর। তাদের পক্ষে একের পর একে গদীতে বসা সম্ভব নয়; কারণ—একজন ম'রে গদী ফাঁকা হলে তবে তো আর একজনের স্থান হবে। সে দিক হতে অনেকেরই পরমায়ুতে কুলবে না। মোক্ষলাভের কথা এরা মুখে বলে বটে, কিন্তু মোক্ষ ব্যাপারটা যে কি, তা কেউ বোঝে কিনা সন্দেহ।

সাথে থেকে এই সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজন যা দেখেছি, তাতে বারোমাস শেষ রাতে উঠে স্নান করে, প্রায় আধঘণ্টা হিন্দী অথবা গুরুমুখী ভাষায় ছড়া-পাঁচালীর মত কতকগুলি নীতি কথা আবৃত্তি করে। সে নীতিকথার অর্থ-তাৎপর্য যে কি, তাও এদের অনেকে ঠিকমত

জানে না। রাত্রে যোগাসন করতে দেখেছি। সে আসন-অভ্যাস প্রায়ই কতকগুলো কঠিন কসরতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'প্রাণায়াম' বলতে যা বুঝায়, তা খুব অল্পই করতে দেখেছি। যা করে, তাও এমন কিছু নয় যাতে মোক্ষ লাভ হতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে আমার জ্ঞান বই-পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এই সব যাযাবর সন্ন্যাসীদের কতকগুলি বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে। নারী ঘটিত কোনো কলঙ্ক এদের কারও নেই। যদি কারো সে প্রকার পদস্খলন হয়, তবে গুরুজী তাকে তুষানলে প্রাণদণ্ড দেন। ও-প্রকার অপরাধ ক'রে এদের কেউ কোনো প্রকারেই রক্ষা পায় না।

প্রতিষ্ঠিত মঠ, আশ্রম, আখড়া প্রভৃতির মহান্ত বা গুরুজীর গদী দখলের জন্য প্রায়ই দেখা যায়, সাধুবাবারা দলপাকানো, ষড়যন্ত্র, মামলা, মোকদ্দমা—কোনো কিছুতেই পিছ্-পা হন না। কিন্তু এই যাযাবর সন্ন্যাসীদলে ওসব ব্যাপার একেবারেই নেই। এরা সরল, নির্ভীক ও সব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। আগামীকাল কি হবে তা নিয়ে সাধারণ চেলা-সন্ন্যাসীরা একটুও মাথা ঘামায় না, মহান্ত ও তাঁর প্রধান চেলা-মহারাজের নির্দেশ অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে চলে। এই সাধারণ সন্ন্যাসীদের কোনো বিষয়ে কৌতূহলও দেখি নি। নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ঝগড়া বিবাদ এরা কখনো করে না।

এই গুণগুলির ফলে যদি মোক্ষলাভ সম্ভব হয়, তবে এই যাযাবর সন্ন্যাসীদলের মহান্ত ও তাঁর উত্তরাধিকারী চেলা-মহারাজ বাদে, দলের আর সব সন্ন্যাসীরা নিঃসন্দেহে মোক্ষের অধিকারী।

একবার মনে করলাম, বিট্‌ঠল দাসকে জাগিয়ে তার পূর্বাশ্রমের কথা শুনি। পরক্ষণেই স্মরণ হল, সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করা ও বলা দুই-ই অপরাধ। যদি কেউ এ নিয়ম ভঙ্গ ক'রে পূর্বপরিচয় বলে, তবে গুরু কঠোর দণ্ড দেন। আমাদের বাঙ্গালী সন্ন্যাসীরা বড় বেশী এ নিয়ম মেনে চলেন না। বরং বিপরীত ব্যাপারই দেখা যায়। অনেক বাঙ্গালী সন্ন্যাসীই পূর্বাশ্রমের গৌরবে গৌরবান্বিত। কেউ বা আবার

ভক্তের বেনামীতে নিজের জীবন-চরিত রচনা ক'রে ছাপিয়ে প্রচার করেন। অবাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসীরা প্রায় সকলেই আধুনিক শিক্ষাবর্জিত, সেইজন্যই বর্তমান কলিযুগোপযোগী প্রচার মহিমা এঁরা জানেন না।

আমাদের ক্যারাভান পানিপথের নিকটবর্তী হয়েছে। দূরে পানিপথের আলোকমালা দেখা যাচ্ছে। আমার গাড়ীর চালক সন্ন্যাসী জানতে চাইল—রাত্রে গাড়ীতেই থাকব, না কি তাবু খাটাতে হবে। আমি জানালাম—গাড়ীতে থাকতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। তার মুখেই শুনলাম এ প্রকার যাত্রাপথে যদি কোথাও দু'এক দিন থাকতে হয়, তবে একমাত্র মহান্ত-মহারাজের নিজস্ব ছোট তাঁবু, আর প্রয়োজন হলে দরবারী বড় তাঁবু খাটানো হয়। চেলা সন্ন্যাসীরা গাড়ীর ভিতরে নীচে, গাছতলায়—যে যেখানে পাবে শুয়ে রাত কাটায়। আমার বেলায় স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হবে। আমি আদেশ করলেই তাবু খাটানো হবে। আর একটা সুসংবাদ পেলাম, বিট্‌ঠল দাস একমাত্র আমার সেবায়ই নিযুক্ত থাকবে। তাকে আর কারও হুকুম তামিল করতে হবেনা।

পানিপথে।

ক্যারাভান পানিপথে এসে থেমে গেল। রাত্রি দশটা বেজে এগারটার কাছাকাছি। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পূবে ঘন বসতিপূর্ণ ছোট সহরের মত গ্রাম পানিপথ, ইলেকট্রিক লাইট আছে। পাঞ্জাবে নদীর জলে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন ক'রে সস্তায় সহরে ও বড় বড় গ্রামে সরবরাহ করা হয়। রাত্রে আর জায়গাটা সম্পর্কে বেশী কিছু বুঝা গেল না। রাস্তার ধারে বড় বড় বর্ধাতি গাছের তলায় আমাদের

অস্থায়ী ডেরা হল। নিকটেই রাস্তার দু'ধারে অনেকগুলো দোকান। সেই রাতেও বহুলোক সাধু দেখতে এল। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই মহান্তমহারাজের মূল্যবান ছোট তাঁবুটা খাটানো হল। গ্রামবাসীরাও মহা উৎসাহে যথাসাধ্য সাহায্য করছে। ডেরার জায়গাটা তারাই পরিষ্কার করে দিল। তাদের কথায় বুঝলাম—গ্রামে সাধু সমাগম গ্রামবাসীর সৌভাগ্যের বিষয়।

পাঞ্জাবে জ্বালানী কাঠের অভাব। গরু-মহিষের গোবর দিয়ে বড় বড় চাপড়া করে শুকিয়ে, তাই জ্বালানীরূপে ব্যবহার হয়। দেশ-ভাষায় এই চাপড়াকে 'কাণ্ডা' বলে। সেই রাত্রেই প্রায় দশ বোঝা কাণ্ডা এসে গেল। এইটি হ'চ্ছে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে সাধুসেবার প্রথম অর্ঘ্য।

দ্বিতীয় অর্ঘ্য হচ্ছে জল। পানিপথে কিন্তু পানির খুবই অভাব। শুনলাম—আট দশ হাজার অধিবাসীর জন্য মাত্র আটটা ইঁদারা আছে। তার পাঁচটা সমাজহিতৈষী পুণ্যার্থীর দানে প্রস্তুত। দু'টো মুসলমান আমলে ও একটা ইংরেজ আমলে কাটা হ'য়েছে। এই সমস্ত দেশে একটা ইঁদারা কাটতে যে খরচ হয়, তা দিয়ে বাংলাদেশে বিশ বিঘে জলার একটা দিঘি কাটা যায়। এদেশে দশ-বারোহাত মাটির নীচেই পাথর। সেই পাথর কেটে দু'তিন শ' হাত নীচে জল পাওয়া যায়।

ইংরেজ আমলে হরিজনদের গ্রামের বাইরে বসতির ব্যবস্থা ক'রে, সেখানে একটা সরকারী ইঁদারা করা হয়েছে। পাঞ্জাবে কিন্তু বাংলার মতই অস্পৃশ্যতা নিয়ে মাতামাতি নেই। কেবল মাত্র ইঁদারার দড়ি বালতি লোটা কলসী পৃথক থাকলেই জাত বেঁচে যায়। তা সত্ত্বেও সদাশয় ইংরেজ সরকার গ্রাম থেকে সমস্ত হরিজনদের বেরক'রে এনে, উচ্চবর্ণের স্পর্শবর্জিত হরিজন পল্লী স্থাপন করেছেন। মানব-প্রেমিক খৃষ্টান পাদরী সাহেবরা হরিজনপল্লীতে গীর্জা ও মিশন-স্কুল খুলে, হরিজন বালক বালিকাদের মানবপ্রেম ও ধর্মের আলোক প্রদান করছেন। আমরা হিন্দু কেবল তাকিয়ে দেখছি। ভারতের সর্বত্রই এই ব্যাপার, এবং এটা এখনও একই ভাবে চলছে।

পানিপথের দুষ্প্রাপ্য পানিও সে রাত্রে গ্রামবাসীরাই এনে দিল। সন্ন্যাসীরা চাপাটি ও ডাল পাকাতে লেগে গেলেন। সাথের গাই ক'টার পাঁচটা দোহাল, তাদের দুইয়ে আধমন-পঁচিশ সের মত দুধ হল। রাত্রি একটার মধ্যেই ডাল রোটি দুধ খেয়ে, গাড়ীর মধ্যে শয্যায় আশ্রয় নিলাম। বিটঠল দাসকে আমার বিছানার পাশেই শোবার জায়গা ক রে দিলাম, সে ভারী খুশি।

এই প্রকারে যাযাবর সন্ন্যাসীদলে আমার নতুন জীবনযাত্রার প্রথম দিন কেটে গেল।

পরদিন প্রভাতে ঘুমভেঙ্গে বিটঠল দাসকে গাড়ীতে দেখলাম না। গাড়ী থেকে নেমে অপরাপব সন্ন্যাসীদেরও দেখলাম না। মহান্ত-মহারাজের তাঁবুর দিকে যেতেই ম্যানেজার মহারাজের দেখা পেলাম। তিনি তখন লোটাহাতে দাঁতনে নিরত। তিনি বললেন—সন্ন্যাসীরা স্নানে গিয়েছে। এখানে জল দুষ্প্রাপ্য। তিনি শ' হাত গভীর ইদারা হতে জল তুলতে হয়। আপনার স্নানের জল বিটঠল দাস এখানেই এনে দেবে। বিটঠল দাসকে আপনার নিজস্ব সেবক বলেই মনে করবেন। যা কিছু প্রয়োজন তাকে বললেই সে করবে। তাঁবুটা সন্ন্যাসীবা এসে খাটিয়ে দেবে। আমাদের নিযমকানুন সবটাই আপনাকে মানতে হবে না। আপনার রুচিমত আপনি চলবেন। তবে একটা নিয়ম মেনে চলবেন, কারও আহ্বানে কোনো গৃহস্থের বাড়ীর ভিতরে যাবেন না। এদেশে বহু 'কুন্তী-মাদ্রী' আছে।

কথাটা পূর্বেও শুনেছি। ম্যানেজারকে বললাম—সে দিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপাতত আমার একটা অনুরোধ, আপনাদের ঘোড়ায় যদি আমাকে চড়তে অনুমতি দেন, তবে ও বিদ্যেটা শিখে নিতাম।

ম্যানেজার হেসে বললেন—আপনার যখন খুশি ঘোড়ায় চড়বেন। তবে সাবধান, যেন প'ড়ে হাত পা না ভাঙ্গেন। এ সমস্ত ঘোড়া পাকা সওয়ার না হলে পিঠে নিতে চায় না। বরং আপনি যখন

ঘোড়ায় চড়তে যাবেন, তখন আমাদের দলের সন্ন্যাসী দু'একজন সাথে নেবেন। তারা আনন্দের সাথে আপনাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাবে। আর একটা কথা, ঘোড়ার কিন্তু জিন নেই। যা একটা আছে, সেটা বহু মূল্যবান্। আর তাতে ব'সে ঘোড়া ছুটানোও যায় না। কোনো সাধুমেলার মিছিলে মহান্ত-মহারাজের জন্য ওটা বেরকরা হয় মাত্র। সন্ন্যাসীরা ঘোড়ার খালি পিঠেই চড়ে।

ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ীর কাছে এসে দেখি, বিটঠল দাস বড় এক কলসী জল নিয়ে অপেক্ষা করছে! তাকে ঘোড়ায় চড়ার কথা বলতেই মহা উৎসাহে বলল, সে নিজেই আমাকে ঘোড়ায় চড়া শিখাবে। সে নাকি পাকা ঘোড়সওয়ার।

ছেলে বেলায় যশোর জেলায় ঝিনাইদহ মহকুমায় আমাদের সাবেক বাড়ীতে কিছুদিন ছিলাম। তখন ঐ অঞ্চলে অনেকেরই চড়ার ঘোড়া ছিল। পাড়ার ডানপিটে ছেলেদের দলে মিশে দুপুরে মাঠে যেয়ে ঘোড়া ধরে চড়তাম। মাসখানেকের মধ্যে গোটাদশেক আছাড় খেয়ে তখনকার মত ঘোড়ায় চড়া একপ্রকার রপ্ত হয়েছিল। যশোর জেলার কই মাছের নামডাক কলকাতায় যথেষ্ট থাকলেও যশুরে গরু ঘোড়ার খ্যাতি কোথাও শুনি নি! ওদেশের অধিকাংশ গরু ঘোড়া মাঠে ও বনে চরে যে ক'দিন বাঁচতে পারে বাঁচে, মালিক তাদের জন্য পয়সা খরচ করে না।

আমার সেই যশুরে বিদ্যের জোরে এই সন্ন্যাসীদের 'সিন্ধীতাজী' ঘোড়ায় চড়া যাবে না, তা জানি। আমার আসল মতলব, এই অজুহাতে বিটঠল দাসকে মাঠে নিয়ে যেয়ে একান্তে তার জীবন কাহিনী শুনা। আর যদি সম্ভব হয় তবে ঘোড়ায় চড়েও দেখব, পারি কিনা। তবে সে সিন্ধী-তাজীতে নয়, ঐ 'হিসারী' টাট্টুটায়।

প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করতেই এক লোটা সফেন কাঁচা দুধ নিয়ে এল বিটঠল দাস। প্রাতে গাই দুইয়ে প্রায় দেড় মণ দুধ হয়। সের দশেক দুধ যায় মহান্ত-মহারাজের সেবার রাবড়ি ইত্যাদির জন্য, আর সবটাই

সন্ন্যাসীরা কাঁচাই খেয়ে নেয়। আমিও কাঁচা দুধ খেলাম। তারপর বিটঠল দাসকে ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে ঘোড়া আনতে বললাম।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পূবে পানিপথ গ্রাম, পশ্চিমে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। দু'টো ঘোড়া নিয়ে আমি আর বিটঠল দাস এসে দাঁড়ালাম সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে। সেদিন পানিপথের ইতিহাস বিখ্যাত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে মনে ভেসে উঠেছিল ইতিহাসে পড়া তিন-তিনটে যুদ্ধের কাহিনী। আর সেই সাথে কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারী দাদার কথা।

ব্রহ্মচারী দাদা একদিন ইতিহাস ও অর্থনীতি আলোচনায় বলেছিলেন, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাশক্তি ধ্বংশ ও দিল্লীর মুসলীম শক্তি দুর্বল হওয়ায়, ইংরাজ-রাজত্ব স্থাপনের পথ সুগম হয়। পানিপথের তিনটে যুদ্ধই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই তিনটে যুদ্ধের ফলাফল বিচার করলে মনে হয়, ১৭৬১ সালের যুদ্ধ ভারতের পক্ষে বিধাতার আশীর্বাদ। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে—একথা সত্য, কিন্তু কা'রা শোষিত হয়েছে? দেশের হাজারের মধ্যে বললেও ঠিক বলা হবে না, লক্ষের মধ্যে যারা নিরেনব্বই হাজার নয়শ' নিরেনব্বই জন, সেই সাধারণ গৃহস্থ কৃষক শ্রমিক—এরা শোষিত হয়েছে কি? ইংরেজ আমলের পূর্বে এদেশের সাধারণ গৃহস্থের অবস্থা কি ছিল?

লোকের মুখে শোনা যায়, প্রবন্ধ পুস্তকাদিতেও পড়া যায়—ইংরেজ আমলের পূর্বে ভারত নাকি সমৃদ্ধভারত, আর বাংলা সোনারবাংলা ছিল। কিন্তু সে সমৃদ্ধি, সে সোনা কা'দের ঘরে ছিল? ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে আরম্ভ করে, প্রায় দুই শতাব্দী কাল যাবৎ ভারতের যে সমৃদ্ধির পরিচয় আমরা ইতিহাসের পাতায় পাই, তা দিল্লী-আগরা প্রভৃতি স্থানের রাজপ্রাসাদের জৌলুষের ইতিহাস। যারা ঐ সমস্ত প্রাসাদের জৌলুষ যুগিয়েছে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মর্মরপ্রাসাদ তৈরী করেছে, সেই প্রজাসাধারণের অবস্থা বুঝতে হলে দৃষ্টিভঙ্গী একটু ভিন্নরকম করতে হবে।—

যে সমস্ত ভারতীয় মজুর ও স্থপতি দিল্লী আগরা প্রভৃতি স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, তৎকালে তাদের পারিশ্রমিক ছিল দৈনিক এক পয়সা থেকে দুই আনার মধ্যে। কৃষক বেচত তার চাল এক টাকায় আটমণ পর্যন্ত। যে সময়ে ইবানী-খোরসানী নাচওয়ালীদের দালাল, 'সোনার ভারত' হতে বস্তা বস্তা সোনার মোহর উটের পিঠে চাপিয়ে, ভারতের পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে যেত, সেই সময়েই ধাতুমুদ্রার অভাবে জনসাধারণ কড়ি দিয়ে কেনাবেচা করত। যারা একতোলা রূপোর একটা 'তঙ্কার' বিনিময়ে আটমণ চাল বেচত, যারা দৈনিক আট দশ ঘণ্টা খেটে এক পয়সা বা দুই পয়সা রোজগার করত, যেকালে জনসাধারণ কড়ি দিয়ে হাটবাজার করত, সেইকালে সেই জনসাধারণের ঘরে সোনাদানা মসলিনের ছড়াছড়ি হওয়া কখনই সম্ভব নয়। বরং তৎকালে অগণিত নরনারীকে শোষণ ক'রে, মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুগ্রহ ভাজন ভাগ্যবানদের প্রাসাদেই দেশের সমস্ত ধনরত্ন পুঞ্জীভূত হয়েছিল। প্রজাসাধারণের মনোবল এতই ভেঙ্গে গিয়েছিল যে, তারা স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, জমিজমার খাজনা দিতে না পেরে, পুরনারীর লাঞ্ছনা ও প্রাণের ভয়ে দলে দলে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। এই যদি প্রাক্ ইংরেজ যুগের অবস্থা হয়, তবে তৎকালে 'সমৃদ্ধভারত' ও 'সোনারবাংলা' ছিল—একথা ডাহা মিথ্যা, ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।—

ইংরেজ আমলে এদেশে অত্যাচার হয়েছে সত্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কয়েকটা বড় লাভও হয়েছে। যে আত্মচেতনা ও এক ভারতীয়ত্ব বোধ ভারতবাসী হিন্দু বহু শতাব্দী যাবৎ হারিয়ে ফেলেছিল, তা আবার ফিরে পেয়েছে। তার সাথে বুঝেছে, এ দেশ কেবল মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠী ও তাদের অনুগ্রহপুষ্টদেরই নয়, এ দেশ দেশবাসী জনসাধারণের। ইংরেজ জাতির আর একটা বড় দান—ভারতের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অনুসন্ধান। ভারতের শাসনভার ইংরাজের হাতে যাওয়ার পর হতে, তাঁদের জ্ঞাতসারে ভারতের প্রাচীন কীর্তি, এমন কি একখানা পুরাতন

পুঁথির পাতাও নষ্ট হয়নি। ধর্মের নাম করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ধর্মস্থান ধ্বংস, ইত্যাদি বন্ধ হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে প্রজা সাধারণের আর্থিক অবস্থা বহুগুণ উন্নত ও নিরাপদ হয়েছে।

এই কথাগুলি বলেছিলেন কালীশঙ্কর দাদা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বকসা ক্যাম্পে। বর্তমান ১৯৪১ সালে দেশ খাদ্য-সমস্যা নিয়ে যে অবস্থার সন্মুখীন হ'য়েছে, তার একটা বড় কারণ বোধ হয় ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যা। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় বাংলার জনসংখ্যা ৬২৭৫৪৭৬২। ১৯২১-এ ছিল ৪৭৫৯৯২৩৩। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ—সিংভূম, মানভূম, পূর্ণিয়া ও শ্রীহট্ট জেলা সমেত লোকসংখ্যা ছিল ৩৪৬৯১৭৯৯। মুসলমান রাজত্বে যে, বাংলার জনসংখ্যা আরও কম ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই তৎকালে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য স্বাভাবিক। ঐ প্রকার খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বুঝা বোধ হয় ভুল।

ইতিহাস বিখ্যাত পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রের পূব প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেদিন অনেক কথাই ভেবেছিলাম। সে ভাবনায় বাধা দিল বিট্‌ঠল দাস। সে এরই মধ্যে বড় তাজীটায় উঠে মাইল চারেক এক চক্র দিয়ে এসেছে। মতলবটা—সে যে কেমন পাকা সওয়ার, তাই আমাকে দেখানো। যদিও আমি বাহাদুরীটা লক্ষ্য করিনি, তথাপি তার ঘোড়ায় চড়ার তারিফ করলাম। সে খুশি হয়ে বাবলা গাছে বাঁধা টাট্টুটা খুলে এনে লাগাম আমার হাতে দিল। আমিও দুর্গা নাম স্মরণ ক'রে এক লাফে চেপে বসলাম। তারপর ঘোড়া ছুটল। আগে চলল বিট্‌ঠল দাসের তাজী, পিছনে আমার টাট্টু। শিক্ষিত ঘোড়া ঠিকমত তাজীর পিছনে একচক্র মেরে এল। আমি টাট্টুর পিঠে আমার অস্তিত্ব বজায় রাখতেই ব্যস্ত ছিলাম, ঘোড়া কেমন চলছে, তা দেখার মত মনের অবস্থা ছিল না।

ঘোড়া এসে বাবলা তলায় থামলে, নেমে বিঠল দাস বলল—মহারাজ আপনি তো ভাল সওয়ার! তবে যে বললেন ঘোড়ায় চড়তে জানেন না?

পরম বিজ্ঞের মত মুখের ভাব করে বললাম—আমি বাঙ্গালী কিনা, তাই সব কিছুই অল্প স্বল্প জানি।

শুনে বিটঠল দাস বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—আপনি বন্দুক নিয়ে লড়াই করতে পারেন? আমার বাবা পারতেন। তিনি ইংরেজের সাথে যুদ্ধে যেয়ে লড়াই করেছেন। বাবা ইংরাজ সরকারের ফৌজী সিপাই ছিলেন।

হঁা, আমি ভাল বন্দুক চালাতে জানি। যদিও তোমার বাবার মত ইংরেজ সরকারের সিপাই হয়ে যুদ্ধে যাই নি, তবুও বন্দুক হাতে পেলে তোমাকে দেখাতে পারি, আমার হাত কেমন নিশান-সই। আচ্ছা বিটঠল, তুমি এই সন্ন্যাসীর দলে এসে সন্ন্যাসী হলে কেন? তোমার কি মা-বাবা নেই?

আমার প্রশ্নের সাথে সাথে বালকের প্রফুল্ল মুখখানা বর্ষনোন্মুখ কালো মেঘের মত হয়ে গেল। একটু ভেবে নিয়ে ব'লল—আমাদের পূর্বকাহিনী বলা নিষেধ আছে। যদি কেউ বলে তবে গুরুজী শাস্তি দেন।

কি রকম শাস্তি দেন?

শাস্তি নানা রকম আছে। দুপুর রোদে চারপাশে চাবটে কাণ্ডার স্তূপে আগুন ধরিয়ে, তার মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়। শীতকালে রাত্রে গলাজলে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কোমরে মোটা শিকল পরিয়ে, তার সাথে বড় বড় কাঠের টুক্‌রো গেঁথে দেওয়া হয়, তাতে শুয়ে ঘুমানো যায় না। এই প্রকার আরও অনেক রকমারি শাস্তি আছে।

যারা পূর্বাশ্রমের কথা বলে, তাদেরই কি এই প্রকার শাস্তি দেওয়া হয়? না কি অন্য রকম অপরাধেও শাস্তি হয়?

আরও অনেক রকমারি অপরাধ আছে। যেমন কোনো যুবতী মেয়ে বউয়ের সাথে কথা বলা। একাকী কোনো গৃহস্থের বাড়ী যাওয়া। খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু যদি কেউ দেয়, তবে তা গুরুজীকে না জানিয়ে গোপন করা। এই রকম অনেক অপরাধ আছে, যার জন্য শাস্তি পেতে হয়।

কোনো সন্ন্যাসী যদি কোনো অন্যায় কাজ করে, তবে তা গুরুজী জানেন কি ক'রে ?

দলের প্রত্যেক সন্ন্যাসী প্রত্যেকের গতিবিধির ওপরে নজর রাখে। এই প্রকার নজর রাখা সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিয়ম। ছোটখাটো অপরাধে সতর্ক করে ছেড়ে দেয়। বড় রকমের অপরাধ হলে গুরুজীকে জানায়। গুরুজী বিচার কবে শাস্তি দেন।

তা হলে তোমার মা-বাবার কথা আমাকে বলা নিষেধ। যদি বল, আর আমি যদি সে কথা তোমার গুরুজীকে জানাই, তবে তোমার শাস্তি হবে—এই না ?

হাঁ। তবে আপনি যখন শুনতে চাচ্ছেন, তখন সমস্তই বলব। আপনি আমাকে ভালবাসেন। এখন ডেরায় চলুন। ডেরায় ফেরার সময় হয়েছে। বিকালে এদিকে বেড়াতে এসে সমস্ত বলব।

ডেরায় এসে বিটঠল দাস সকলকে জানাল, আমি একজন ভাল ঘোড়-সওয়ার ও পাকা বন্দুকওয়ালা শিকারী। আমিও কথায় হাবভাবে—অবশ্য সবিনয়ে তার কথাবই সমর্থন জানালাম। ফলে ম্যানেজারের নিকটে আমার কদর অনেকখানি বেড়ে গেল। সে বৃদ্ধির পরিমাণটা কয়েক দিন পরে বুঝলাম, যে দিন বিটঠল দাস জানতে চাইল—আমি কোন দেশের রাজপুত্র।

সাধু দর্শনের জন্য ডেরায় বেশ লোক সমাগম হচ্ছে। বড় দরবারী তাঁবু খাটানো হয়েছে। তাঁবুর মধ্যে মহান্ত মহারাজ তাঁর ভোগৈশ্বর্যের সাথে বৈরাগ্য সাজিয়ে নিয়ে গদীতে সমাসীন। মহান্ত মহারাজের সম্মুখে একটা ছোট গদীতে ব'সে ম্যানেজার মহারাজ প্রয়োজন মত সমাগত ভক্তবৃন্দের সাথে কথা বলছেন ও কৃপা বিতরণ করছেন। গদীর সম্মুখে একখানা পিতলের বড় পরাতের ওপরে বেলা দশটার মধ্যেই বেশ-কিছু কৃপামূল্য জমে গেছে। ওদিকে দুধ, ঘি, ডাল, আটাও বেশ জমছে।

বেলা দশটার পর দর্শনার্থীর ভিড় কমল। কারণ বোধ হয় অত্যন্ত

রৌদ্র। সে রোদ মাথায় করেও দু'চারজন দর্শনপ্রার্থী আসছে। ভাবে বুঝলাম, এই সব দর্শনার্থী অবস্থাপন্ন। ধনী দর্শনপ্রার্থীরা এত গরমের মধ্যে আসছে কেন, তা তখন বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম। পরের কথা পরেই বলব।

অপরাহ্ণে রোদের তাত কমলে বিটঠল দাসকে নিয়ে চললাম পানিপথের প্রান্তরে। যাওয়ার সময় ম্যানেজারের সাথে দেখা করে বলে গেলাম—আমরা পানিপথের যুদ্ধ-ক্ষেত্রটা একটু বেড়িয়ে দেখব। ফিরতে বিলম্ব হ'তে পারে।

ঘোড়ায় চড়ে দু'জনে মাইল তিনেক যেয়ে একটা পিপুল গাছের তলায় বসলাম। তারপর বিটঠল দাস আরম্ভ করল তার কাহিনী। বুদ্ধিমান বালক যা দেখেছে, যা শুনেছে, তা বেশ গুছিয়েই আমাকে শুনিয়েছিল। সে যে টুক বলতে পারে নি, সেটুক আমি পূরণ করে লিখছি।

——o——

সন্ন্যাসী বিটঠল দাস

উত্তর প্রদেশে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে একটা ছোট গ্রাম বিটঠল দাসের জন্মস্থান। গ্রাম হতে রামনগর রেলস্টেশন অনেক দূর। পিতামহ ঠাকুরসিং ছিলেন কৃষক। যৌবনেই তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। মাহার জাতির মধ্যে বিবাহযোগ্যা মেয়ের দাম অত্যন্ত বেশী। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হলে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করা প্রায় অসম্ভব। সে জন্য ঠাকুর সিং আর বিয়ের চেষ্টা না করে, একমাত্র পুত্র বালক মহারাজসিংকে নিয়ে, অন্য পাঁচজনের মতই গৃহস্থালীর কাজ করতেন।

মহারাজ বাল্যকাল হতেই বেশ স্বাস্থ্যবান ছিলেন। বয়স তাঁর যখন আঠারো বছর, তখন তাঁকে ইংরেজ সরকারের সিপাই করার প্রস্তাব এল দেশের জমিদার মারফৎ।

ঠাকুরসিং একমাত্র পুত্র মহাবাজকে ফৌজী সিপাই হতে সম্মতি দিলেন না। সেজন্য জমিদার ঠাকুর সিংএর সমস্ত চাষের জমি বাজেয়াপ্ত করলেন।

ক'বছর দিনমজুর খেটে শেষে অভাবের তাড়নায় মহারাজসিং পিতার অমতেই সিপাইএর চাকরিতে ভর্তি হন। চাকরিতে ঢুকেও বাজেয়াপ্ত জমির সবটা পাওয়া গেল না, অর্ধেক পাওয়া গেল। বাকী জমি তিন বছর চাকরি হলে পাওয়া যাবে—কথা থাকল।

সিপাই হয়ে মহারাজ যে দিন প্রথম বাড়ী ছেড়ে যাত্রা করেন, সেদিন ঠাকুর সিং বড় কেঁদেছিলেন। ঐ এক ছেলে ছাড়া সংসারে আর তো তাঁর কেউ ছিল না।

সময়ে সবই সহ্য হযে আসে। যখন মানুষ একদিকে নিরাশ হয়, তখন কিছুদিন হা-হুতাশ করে অন্যদিকে আশার আলো খোঁজে। ঠাকুর সিং খুঁজতে আরম্ভ করলেন তাঁর পুত্রের জন্য একটি বধূ। কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে গেলেন আট বছর বয়সের মাতৃহীনা টুকটুকে একটি মেয়ে—লছমী।

এক বছর পরে একমাসেব ছুটি পেয়ে মহারাজ বাড়ী এলেন। ঠাকুরসিং সাধ্যমত ধুমধাম করে ছেলের বিয়ে দিলেন। বিয়ে দিতে হাতে যা ছিল তা, আর একটা দুধেল মোষ বেচতে হল। তাতে দুঃখ নেই, লছমী তো ঘরে এল।

বালিকা পুত্রবধূকে নিয়ে পুরোদমে সংসারের কাজে লেগে গেলেন ঠাকুর সিং। লছমী সত্যিই লক্ষ্মী মেয়ে, ছ'মাস যেতে না যেতেই আবার দু'টো দুধেল মোষ এল। ক্ষেতের আবাদও ভাল হতে লাগল।

ভোরে উঠে ছোট্ট ফুলকাটা হলদে ঘাগরা আর সবুজ ওড়না পরা লছমী ধরে বাছুর, ঠাকুরসিং দোহান মোষ। দু'সের দুধ বাড়ীতে রেখে, আর

দুধ কলসীভরে মাথায় নিয়ে লছমী যায় গোয়ালাকে দিতে, এদিকে ঠাকুর সিং সংসারের কাজ গুছিয়ে প্রস্তুত হন চাষের কাজে মাঠে যাওয়ার জন্য। দুধ দিয়ে লছমী ফিরে এলে দু'জনে ঘরে পাতা দৈ চিড়ে ছাতু পেটভরে খেয়ে, ঠাকুরসিং যান কাঁধে লাঙ্গল বলদ তাড়িয়ে। সাথে যায় লছমী দুপুরের খাবার পুঁটুলি মাথায় ভেড়ার পাল তাড়াতে তাড়াতে।

মাঠে ঠাকুর সিং মাথায় পাগড়ি বেঁধে করেন চাষের কাজ। হাসি খুশি লছমী রংবেরঙের ঘাগরা দুলিয়ে ওড়না উড়িয়ে, ছোটাছুটি ক'রে চড়ায় ভেড়ার পাল।

দুপুরবেলা রোদে যখন দিক্‌দিগন্ত ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন শ্বশুর বেটারবৌ মাঠের মধ্যে ছায়াশীতল গাছতলায় ব'সে একপাত্রেই দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম করেন, গল্প করেন। চঞ্চলা বালিকা লছমীর দুপুরে ঘুম পেলে ঠাকুর সিং গাছতলায় মাথার পাগড়ী পেতে দেন, লছমী ঘুমায়। কোনোদিন ঠাকুরসিংও লছমীর পাশে গামছা পেতে শুয়ে বিশ্রাম করেন।

মাঠের কাজ সেরে বিকালে বাড়ী এসে স্নান ক'রে দু'জনে জল আনেন। সুন্দর পিতলের ছোট কলসী আর লোটা কিনে দিয়েছেন ঠাকুর সিং। লছমী কলসী-লোটা ভরে মাথায় করে জল আনে। গরু, মোষ ভেড়া ও নিজেদের জন্য অনেক জল আনতে হয়। লছমী তার ছোট লোটা কলসীতে আর কতটুক জল আনবে! ঠাকুরসিং বড় কলসীতে জল আনেন, কিন্তু তাঁর সাথে সাথে লছমীরও জল আনা চাই।

সন্ধ্যায় মোষ দুইয়ে, ডাল শাক রোটি পাকিয়ে খেয়ে, নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে, নানাপ্রকার ঠাকুর দেবতার গল্প করতে করতে লছমী ও ঠাকুর সিং ঘুমিয়ে পড়েন।

এমনি করে ছয়টা বছর কেটে গেল। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁদের সে জীবনযাত্রার মধ্যে তেমন কোনো বৈচিত্র্য ছিল না, তথাপি স্নেহ-মমতা-রসে ভরপুর সে ছ'টা বছরের একটা দিনও নিরানন্দের বলে মনে হয় নি।

প্রতি বছরে একমাসের ছুটি পেয়ে মহারাজ সিং বাড়ী আসতেন। তাঁকে দেখে লছমী ওড়নায় ঘোমটা টানত। সে ঘোমটা দমকা হাওয়ায় নোয়ানো কলাপাতার মত একটু পরেই আর থাকতো না। বাড়ী এসে যুবক মহারাজসিং খুব হৈ চৈ করতেন, লছমী বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে ভাবত—লোকটা এসে এত হৈ হুল্লোড় করে কেন! বাপুজী তো কবেন না!

এমনিভাবে ছয় বছরে লছমীর মনের কোনো পরিবর্তন না হলেও প্রকৃতিদেবী তার দেহে ধীরে ধীরে কৈশোরের মাটি লাগিয়ে, যৌবনেব রং ধরিয়ে, সৌন্দর্যের সাজ পরিয়ে চলেছেন।

সেবার মহারাজসিং ছুটিতে বাড়ী এসে বোধ হয় লছমীকে নিয়ে একটু বেশী মাতামাতি কবেছিলেন, ফলে চঞ্চলা লছমী গম্ভীর হয়ে গেল। মহাবাজসিং চলে গেলে লছমী বাপুজীকে জানাল, সে আর মাঠে যাবে না, বাড়ী থেকে সমস্ত কাজ করবে।

শুনে ঠাকুর সিং প্রথম চমকালেন, পরে ব্যাপার বুঝলেন। ঘরের লক্ষ্মী এখন হতে ঘর আলো করে ঘরেই থাকবে। মাঠে ঠাকুরসিং আবার একা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বৃদ্ধের অজ্ঞাতে।

আবার এক বছর পরে মহারাজ ছুটিতে এসে খুব হৈ চৈ করলেন। একমাস ধরে গান গেয়ে, হেসে, লছমীর ওড়না কাড়াকাড়ি করে, বেনী টেনে, ছুটি ফুরোলে ছুটি ডাগর চোখের দিকে ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন কর্ম্মস্থলে।

কর্মস্থলে সিপাই-ব্যারাকে রাত্রে ঘুমিয়ে মহারাজসিং স্বপ্ন দেখেন, বাড়ীতে ছেড়ে আসা ঘাগরা ওড়না বেনী, আর দুটো ডাগর চোখ। সে স্বপ্ন ছিল তাঁর আনন্দ-রসে ভরপুর। ঠিক সেই সময়েই ঠাকুর সিং-এর বাড়ীর পাঁচমাইল দূরে বৃদ্ধজমিদারের দুশ্চরিত্র পুত্রও বোধহয় দুঃস্বপ্নে রাত্রি কাটাত, ঐ ঘাগড়া-ওড়না-বেনীর কথা ভেবে।

একদিন মাঠ হতে ঠাকুর সিং ফিরলে লছমী জানাল—কিছুদিন যাবৎ জমিদার-পুত্রের ঘোড়া বাঁধার নিয়মিত স্থান হয়েছে লছমীদের

বাড়ীর বাইরের আমগাছ তলায়। গাছতলাটার এমনি গুণ যে, জমিদার-নন্দন সেখানে এলেই তাঁর ভয়ানক তৃষ্ণা পায়। লছমী দু'দিন জল দিয়েছে, তৃতীয় দিন হতে সে আর তৃষ্ণার্তের প্রার্থিত জল দেয় না। সে দিন পিপাসিত জমিদারপুত্র পিপাসার জল না পেয়ে বন্ধ দরজার বাইরে একটা ছোট বাক্স রেখে, লছমীকে নিতে অনুরোধ জানিয়ে চলে গিয়েছেন। লছমী বাক্সটার ওপরে এক ঝুড়ি যবের ভুষি ঢেলে রেখেছে। বাপুজী যেয়ে সেটা দেখুন।

লছমীর কথা শুনে গর্জে উঠলেন ঠাকুর সিং। যবের ভুষির গাদায় লাথি মেরে বের করলেন বাক্স। বাক্স হাতে ছুটলেন জমিদার-বাড়ী। একপ্রহর রাত্রিগতে ফিরে এসে বললেন—কুত্তাটাকে খুব ধমকে দেওয়া হয়েছে। জমিদার বেশ ভালমানুষ।

ভালমানুষ জমিদার বুড়ো হয়েছেন। কুত্তার স্বভাব দূর হয় না, সে জন্য প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। ঠাকুর সিং তাঁর যৌবনে পাকানো চার-হাত লাঠিখানায় আবার তেল মাখালেন, বর্শাখানায় ধার দিলেন, ধনুকে ছিলে লাগিয়ে আরও দশ গণ্ডা তীর কামার দোকান হতে তৈরী করে আনলেন। লাঠি বর্শা তীর-ধনুক কাছে নিয়ে রাত্রে লছমীর বাপুজী শুয়ে থাকেন তার ঘরের বারান্দায়।

ঠাকুরসিং-এর প্রস্তুতির সংবাদ কুত্তার কানে গেল। এ শ্রেণীর জীব একমাত্র মুগুরকেই ভয় করে। এরপর হতে লছমীদের আমগাছে ঘোড়া বেঁধে সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম ও লছমীর হাতের জল পানের জন্য কোনো শ্রান্ত ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত কুত্তাই দেখা গেল না।

আরও তিন বছর কেটে গেল। তিন বছর পরে, ফালগুন মাসের এক প্রভাতে ঠাকুরসিং দেখলেন তাঁর লছমীর কোলে গোলাপ ফুলের মত ছোট্ট নাতী। নাতীর ঠাকুরদাদা ঠাকুরসিং মনের আনন্দে গ্রামের সকলকে খাওয়ালেন পেটভরে দহিবড়া লাড্ডু। তারপর সেবার ফসল উঠলে সমস্ত জমি ভাগ-চাষে দিয়ে, বাড়ীর বাইরে আমগাছ তলায় বৃদ্ধ বাঁধলেন একখানা সুন্দর ছোট ঘর। সেই

ঘরে নাতী ও ঠাকুরদাদা সারাদিন আড্ডা জমান। সংসারের সব কাজ করে লছমী।

দিন আনন্দে কেটে যায়। শ্রীবিট্‌ঠল নারাযণের ভক্ত ঠাকুরসিং নাতীর নাম রাখলেন বিট্‌ঠল দাস। মা লছমী ডাকে—আমার বিট্‌ঠু। ছ'মাস বয়সেই বিট্‌ঠু ঠাকুরদাদার সব বিষযেই সঙ্গী হযে উঠল। ঠাকুর-দাদা খেতে বসলে দুষ্টু বিট্‌ঠু তাঁর কোলের ওপরে উপুব হয়ে পাতের দই হাতে তুলে গায মুখে মাখে, হাতের রুটি কেড়ে নিয়ে অদন্ত মুখে কামড়ায়। নাতী-ঠাকুবদাদায তুমুল ঝগড়া বাধে। লছমী দু'জনের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসে, কখনো বা মধ্যস্থতা কবে।

আরও এক বছব আনন্দে কেটে গেল। তাবপর এল সর্বনাশ। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ, প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে গেল। একদিন সংবাদ এল —ইংরেজ সরকার তাঁদের সিপাই মহারাজসিংকে ভারতের বাইরে যুদ্ধে পাঠালেন।

সংবাদ পেযে একদিনেই ঠাকুরসিংএর পিঠের দাঁড়াটা সামনের দিকে অনেক খানি ঝুঁকে পড়ল। তবুও লছমীর বাপুজী হাসিমুখে লছমীকে শুনালেন—আমার মহারাজ এবার বড় চাকুরে হয়ে ফিরে আসবে।

রাত্রে কাজকর্ম সেরে লছমী বসে বাপুজীর পায়ের কাছে। বাপুজী শোনান তাঁর স্নেহেগড়া পুত্রবধূকে সিপাইদের বড়লোক হওয়ার গল্প। সে গল্পের বেশীব ভাগই মিথ্যা। গল্প বলতে যেয়ে গলা ভার হয়ে আসে। সময়ে বুকভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ে। বৃদ্ধ বাপুজী চেষ্টা করেও সাবধান হতে পারেন না।

লছমী সব বোঝে। অন্ধকারে বাপুজীর পায় হাত বুলোতে বুলোতে চোখের জলে ভেসে হাসিখুশি ভরা কণ্ঠে গহনার আবদার পেশ করে।

বছরের পর বছর চলল। ঠাকুরসিং প্রতি সপ্তাহে তিন মাইল দূরে তহশীলদারের বাড়ী যান তাঁর মহারাজের কোনো সংবাদ এসেছে কিনা—জানতে।

সংবাদ আসে ছু'তিন মাস পরে, ছোট একখানা পত্র, সামান্য ছু'চারটে কথা। বাপুজী লছমীকে শুনান মাসে ছু'তিনখানা পত্র। সে পত্রে কত কথা লেখা থাকে। বিশেষ করে লেখা থাকে—যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, তার ত্রিসীমানার মধ্যেও মহারাজসিং থাকে না। সদাশয় ইংরেজ সেনাপতিরা মহারাজকে রসদের ভার দিয়ে যুদ্ধের বাইরে রেখেছেন।

লছমী হাসিমুখে পত্র শোনে। লেখাপড়া না জানলেও সামরিক বিভাগের পুরণো খামখানা সে চেনে। যখন একা থাকে তখন কাঁদে।

রাত্রে ঠাকুরসিং বিট্ঠুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বারান্দায় ঘুমান। কোনো কোনো দিন গভীর রাত্রে শব্দ শুনে লছমী ঘর হতে বেরিযে এসে, বসে বাপুজীর মাথার কাছে। সে রাত্রে আর কেউ কাউকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে পারেন না। নিঃশব্দে লছমী চোখের জলে বুক ভিজায়। বাপুজী ভিজান মাথার বালিশ আর বুকের বিটঠুকে। রাত প্রভাত হযে যায়।

সব ব্যাপারেরই শেষ আছে। ছুঃখের রাত্রিও প্রভাত হয়। চারবছর পরে মহাযুদ্ধও শেষ হল।

যুদ্ধ শেষ হওযার ছ'মাস পরে তিনমাসের ছুটি পেয়ে মহারাজসিং এলেন বাড়ী। বৃদ্ধ ঠাকুরসিংএর নুইয়ে পড়া শিরদাঁড়াটা আবার যেন একটু সোজা হল। লছমীর পাঁশুটে গোলাপী মুখে আবার লাল ধরল। ছ'বছরের বিট্ঠু রামযাত্রার লক্ষ্মণের মত জমকালো পোষাক পরে ঠাকুরদাদার সাথে মেলায় যেয়ে মস্তবড় একটা ছুধেল মোষ কিনে আনল। মোষটা ছু'বেলায় যোল সের ছুধ দেয়।

তিমমাসের ছুটি যে কি করে কখন শেষ হয়ে গেল. তা যেন বুঝাই গেল না। ছুটি ফুরোলে সামরিক সিপাই মহারাজসিং দিন মত যাত্রা করলেন। কিন্তু কি জন্য যেন সেবার তিনি চলে গেলে লছমী ক'দিন ধরে অবকাশ পেলেই কাঁদত। সে কান্না বালক বিট্ঠু দেখেছে।

সুখে দুঃখে আশায় আশায় কেটে গেল আরও এক বছর। বছরান্তে পাওনা ছুটি মহারাজ পেলেন না। ভারত সীমান্তে গোলমাল বেধেছে, দেশের ভিতরেও স্বাধীনতাকামীরা হাঙ্গামা করছে। এ অবস্থায় ইংরেজ সরকার সিপাইদের ছুটি দিতে পারেন না।

সিপাই-সান্ত্রীদের ছুটি না হলেও 'সাহেব সুবোদের' আগের দিন ফিরে এসেছে। দেশ-রক্ষা ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির অযোগ্য ভারতবাসীদের যোগ্য করে তোলার সুকঠিন সাধনব্যস্ত ইংরেজ বড় সাহেবদের কেউ যাচ্ছেন 'হোমে'—লণ্ডনের পবিত্র কলের জলে গায়ের ভারতীয় ময়লা ধুতে। কেউ চলেছেন সিমলা-দার্জিলিংএর মত ঠাণ্ডা জায়গায় মাথা ঠাণ্ডা করতে। যারা বেশী হিসেবী সাহেব, তাঁরা সুবিধে মত একটা 'সুবো' পাকড়িয়ে, তার 'মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে' যাচ্ছেন শিকার পার্টিতে।

সুবোরাও রায় সাহেব্ খান সাহেব থেকে আরম্ভ করে, রাজা নবাব, নাইট হবার আশায়, যে বড়-সাহেব-দেবতা যে ফুলে তুষ্ট, সেই ফুলে অঞ্জলী দিয়ে, বর লাভের সাধনায় লেগে পড়েছেন।

সেকালের বিলেতী সাহেবরা যে হেতু বিদেশী, সে হেতু ভারত মধুবনের সব ফুলের মধুর সন্ধান তাঁরা পান নি। সে জন্য বোধ হয় তখন পূজকদের পূজার উপকরণ রকমারির দিক হতে অল্প হলেও দমে ভারী ছিল। পূজক সুবোরাও কন্ট্রাক্ট, পারমিট, লাইসেন্স প্রভৃতি বাস্তব মূল্যবান বরের কথা জানতেন না। তাঁরা কেবল অবাস্তব উপাধি-বরের জন্যই বড় বড় সাহেব-দেবতার সেবা-পূজা করতেন।

ঠাকুরসিংএর ভালমানুষ জমিদার পরোলোকে চলে গেছেন। তাঁর সেই পুত্র জমিদারী হাতে পেয়ে যুদ্ধের সময় ইংরেজের সিপাই যোগাড় ও চাঁদা আদায় করে উপর মহলে বেশ নাম করেছেন। তবে বাহাদুরের সিকে তখন পর্যন্তও ছেঁড়ে নি। সে জন্য জেলার বড় সাহেব আর এক মিলিটারী জাঁদরেল সাহেব জমিদারের শিকারী নিমন্ত্রণে এসে তাঁবু ফেলেছেন ঠাকুরসিংদের গ্রামের বাইরে পাহাড়ের কাছে।

দু'দিন হল তাঁবু পড়েছে। দু'দিনে হিন্দু-পল্লী হতে গেল দশ-বারোটা ছাগল-ভেড়া আর ঘি-দুধ। মুসলমান-পল্লী হতে গেল কয়েক কুড়ি মুরগী, আর ঝুড়ি ঝুড়ি আণ্ডা। দেশের জমিদার যদি একটা বাহাদুর টাহাদুর হতে পারেন, তবে প্রজাদের ভেড়া মুরগীর যৎসামান্য মূল্য নগণ্য।

শিকার যে তাঁরা সেখানে কি পাবেন তা গ্রামের অধিবাসীরা ভেবে পেল না। তবে অন্য এক রকমের শিকারের মহড়া গ্রামের সকলেই চাক্ষুষ দেখল দ্বিতীয় দিন রাত্রে।

রাত তখন দেড় প্রহর হবে, ঠাকুরসিং বিটঠুকে গল্প শুনিয়ে ঘুমপাড়াতে চেষ্টা করছেন। দুষ্টু বিটঠু আরও গল্প শোনার আশায় ঘুমাচ্ছে না। লছমী সংসারের কাজ সেরে বাপুজীর পায়ের কাছে বসে পা টিপে দিচ্ছে। এমন সময় বাড়ীর বাইরে বহু আলো ও মানুষের গলার অস্বাভাবিক আওয়াজ শোনা গেল।

পল্লীঅঞ্চলে ছোটখাটো কৃষক গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি হয়, ডাকাতি হয় না। সে জন্য নিঃসন্দেহ ঠাকুরসিং খালি হাতে দেখতে গেলেন ব্যাপার কি। সাথে গেল বিটঠু, আর তার পিছনে লছমী।

বাড়ীর সদর দরজা খুলে ঠাকুরসিং দেখলেন, সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং জমিদার, সাথে বহুলোক।

জমিদার বললেন—ঠাকুরসিং, লছমীকে জমিদারের বেগম হতে দাওনি। জমিদারকে বলেছ কুত্তা। এবার কুত্তা বাঘ হয়ে এসেছে। এখন লছমী বড় সাহেবদের বিবি হয়ে নাচবে। দরজা ছাড়ো। হাঃ হাঃ হা, হিঃ হিঃ হি।

হায়নার ডাকের মত আওয়াজ তুলে জমিদার হেসে উঠলেন। সাথের মশালের আলোয় তাঁর বাইশটে দাঁত চক্‌চক্ করে উঠল।

ঠাকুরসিং আর সেই এগারো বছর আগের ঠাকুরসিং নন, বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ। হাতের কব্জিতে আর সে জোর নেই। তবুও দরজা

বন্ধকরা কাঠখানা হাতে করে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁকে কাবু করে বাঁধতে একটু সময় লাগল।

বৃদ্ধ ঠাকুরসিংকে বেঁধে রেখে হায়নার দল ঢুকল বাড়ীর ভিতরে। লছমীর ঘরের দরজা বন্ধ। ভাঙ্গা হল সে দরজা। দরজা ভেঙ্গে মাশালের আলোয় ঘরে যা দেখা গেল, তাতে ছুটে পালাল হায়নার পাল।

ঘরে রক্তের ঢেউ খেলছে। আঠার ইঞ্চি ফলা একখানা কিরিচ-ছোরা লছমীর বুকে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে আছে। এক ইরানী মেয়ের নিকট হতে দশবছর পূর্বে ছোরাখানা কিনেছিল লছমী।

পরদিন যথারীতি দারোগা ও তহশীলদার শিকারী ক্যাম্পে সাহেবদের সাথে দেখা করে ঘটনাস্থলে তদন্তে এলেন। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান মাতব্বররাও এলেন। ঘটনা সকলেই দেখেছেন। ডাকাতদেরও সকলেই চেনেন। পরামর্শ সভা বসল। পরামর্শও স্থির হল। ডাকাতের দল ঠাকুরসিংকে বেঁধে রেখে, লছমীকে খুন করে, হাজার টাকার সোনাদানা লুটে নিয়ে গিয়েছে। গ্রামের কেউ ডাকাতদের চিনতে পারে নি। লাশ সদরে চালান দেবার প্রয়োজন নেই, যত শীঘ্র সম্ভব ওটা জ্বালিয়ে দিতে হবে।

দারোগা ও তহশীলদার ঠাকুরসিংকে বুঝালেন—সে যদি সত্য ঘটনা প্রকাশ করে, তবে তাতে কোনো লাভ হবে না, বরং ফৌজী সিপাই মহারাজের বিপদ হবে। কারণ এই ঘটনার সাথে জেলার বড় সাহেব ও এক মিলিটারী সাহেব জড়িত আছেন।

শোকার্ত ভীত ঠাকুরসিং স্বীকৃত হলেন। পুলিসের কাগজপত্র সই করা হল। ফ্যাসাদ মিটে গেল।

পাহাড়ের কোলে ঝরণার ধারে শ্মশান। চিতার আগুনে সোনার প্রতিমা পুড়ছে। দূরে রাস্তার ধারে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে ঠাকুরসিং বসে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে বিটঠু কাঁদছে।

সন্ধ্যা ঘোর হয়েছে। চিতার আগুন আলো দিচ্ছে। রাস্তা দিয়ে অনেকগুলো গরুরগাড়ী চলেছে। গাড়ীতে নানারকম মাল বোঝাই।

হঠাৎ বিটঠু ভয় পেয়ে ঠাকুরদাদাকে চেপে ধরল। বৃদ্ধ ঠাকুরসিং মাথা তুলে দেখে গর্জন করে উঠলেন। উঠে দাঁড়াতে যেয়ে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

সাহেব সুবোদের শিকারের সখ মিটে তাঁবু ভেঙ্গে মালপত্র গাড়ী বোঝাই হয়ে চলেছে। একখানা গাড়ীর মালের ওপরে বসে আছেন গতরাত্রের সেই হায়না-হাসি জমিদার। হাতে তাঁর বন্দুক।

* * *

সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল। কেঁদে দিন আসে, কেঁদে দিন যায়। দেহ যতদিন আছে, দৈহিক প্রয়োজনও ততদিন থাকবে। সে প্রয়োজন একদিন অস্বীকার করা যায়, দু'দিন অস্বীকার করা যায়, তিন দিনের দিন আর পারা যায় না। কেউ সে প্রয়োজন মেটায় আনন্দে, কেউ মেটায় ভবিষ্যতের আশায়, কেউ মেটায় কেবল তাগিদের তাড়নায়।

যে আনন্দ অবলম্বনে দিন কাটছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন আনন্দের সন্ধান নেই। অদূরভবিষ্যতেও কোনো আনন্দের সম্ভাবনা দেখা যায় না। এমন অবস্থায় মানুষ কেবলমাত্র দেহের প্রয়োজন মিটিয়ে বাঁচতে পারে না। হয় স্বাভাবিক ভাবেই দেহ তাকে ছেড়ে যায়, নয় তো সে নিজেই একদিন অস্বাভাবিক উপায়ে দেহ ছেড়ে চলে যায়। কোনো আইন, ধর্মজ্ঞান, বা উপদেশ তাকে বাঁচাতে পারে না।

বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ ঠাকুর সিং একটা দিনেই আরও দশ বছর পার হয়ে গেলেন। পিঠের হাড় আরও বেঁকে গিঁঠগুলো ঠেলে উপরে উঠেছে, চোখ দু'টো আরও বসে যেয়ে ঘোলা ধরেছে, মাথায় আর একগাছা চুলও কালো নেই, সব সময় দেহ কাঁপে।

ঠাকুর সিংএর চোখের ওপরে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে রাতের আঁধার কালি ছড়ায়, ঘরে প্রদীপ জ্বলে না। প্রভাত ডেকে আনে দিনের আলো, ঘরে ঝাঁট পড়ে না। ডাল আটা ঘরে আছে, কলসীতে জল নেই। মোষ দু'টো তাকিয়ে থাকে বড়ঘরের দরজা পানে, মৃদু কণ্ঠে ডাকে,

অবোধ পশু বুঝতে চায না—তাদেব ডাক শুনে খোল-ভুষিব ঝুড়ি হাতে যে এসে হাসি মুখে দাঁড়াত, সে তাদের ফেলে চিরতরে চলে গেছে।

বাড়ীর বাইবে আম গাছ তলায সেই ছোট ঘর খানায় বসে থাকেন নীরব বৃদ্ধ নীবব নাতিটিকে কাছে নিযে। সে ঘবেব সম্মুখে জলেব কলসী মাথায ঘাগরা দুলিযে আব কেউ এসে দাঁড়াবে না। আব কেউ বলবে না—বাপুজী, বেলা হযে গেল, মোষ দুইবেন কখন ? খেতে চলুন।

তবুও বৃদ্ধেব ঘোলা চোখ দু'টো ইদাবাব পথে চেযে থাকে। সামান্য একটু টুং শব্দে কান উৎকর্ণ হযে ওঠে। মন অসম্ভবকে সম্ভব কবতে চায।

প্রভাত জানায লছমী নেই। সন্ধ্যা জানায লছমী নেই। দুপুর জানায লছমী নেই। সকলেই জানায লছমী নেই। কেবল স্বপ্ন জানায় লছমী আছে।

দিন যায রাত আসে, বাত যায় দিন আসে। সুখ যায দুঃখ আসে। দুঃখ যেযে সুখ আসে কি ?

অনেকে বলেন আসে, অনেকে বলেন আসে না।

যাঁরা বলেন আসে, তাঁদেব যুক্তি বড় একটা বিচারসহ নয়। তাঁদের যুক্তি যদি ঠিক হত, তবে লঙ্কাকাণ্ডের পর অযোধ্যায ফিবে এসে রামচন্দ্র সুখী হতে পারতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর রাজ্য পেযে পাণ্ডবেরাও সুখী হতেন। কিন্তু তা তাঁরা হতে পারেন নি! তাঁদের দুঃখ আরও জমাট বেঁধেছিল!

যাঁরা বলেন দুঃখেব পব সুখ আসে না, তাঁদের যুক্তি—যে সুখ যায় সে সুখ, বা তার মত সুখ আর আসে না। দোষটা সুখভোগ্য বস্তুর নয়। দোষটা বয়সেব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার।

সুখ হারানোর পর দুঃখের ভিতর দিয়ে মানুষের কিছুটা বয়স পার হয়ে যায়। সেই সময়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ্য বস্তুর গুণাগুণ গ্রহণ-ক্ষমতা অনেকটা হারিয়ে ফেলে। তার জন্যই বহু বৃদ্ধের মুখে শোনা যায়—আজ কাল ইলিশমাছ মুগ-মাষকলায়ের ডাল, নলেন গুড়ে পূর্বের মত স্বাদ গন্ধ নেই।

এ ছাড়া সুখের পর দুঃখের দিনে মানুষ তার হারানো সুখের ওপরে কামনার রং ফলিয়ে কল্পনার তুলি দিয়ে চিত্তপটে ভবিষ্যৎ সুখের যে উজ্জ্বল ছবি আঁকে, তার সম্মুখে দুঃখের নিশান্তে সুখের বাস্তব মূর্তি ম্লান হবেই তো। তারপর বয়সের সাথে সাথে মনের রঙিন নেশা রূপ বদলায়, রংও ফিকে হয়ে আসে।

তবুও মানুষ যা পায় তাই সম্বল করে ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে সংসার-পথে চলে। কোনো একটা অবলম্বন না থাকলে এপথে কেউ চলতে পারে না, কেউ বাঁচতেও পারে না।

ঠাকুর সিংএর সুখের দিন লছমীর সাথে হারিয়ে গিয়েছে। দুঃখের রাতে বুকের সম্বল বিট্‌ঠুকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ আবার মাথা তুলতে চান। কিন্তু বাহাত্তর বছরের পুরণো দুর্বল মাথায় বেধে পড়ে লছমীর ফেলে যাওয়া অসংখ্য কর্মের বোঝা। সে ভারী বোঝার সাথে টক্কর খেয়ে আরও বেশী করে মনে পড়ে লছমীর কথা।

বালক বিট্‌ঠুর দিকে তাকিয়ে সব কাজই করেন ঠাকুর সিং। ম্লান-মুখ বিট্‌ঠু থাকে ছায়ার মত সাথে সাথে। করেন সব কাজ, কিন্তু লছমীর মত হয় না। সন্ধ্যা বয়ে গেলে প্রদীপ জ্বলে। পাঁচ-সাতদিন অন্তর উঠান পরিষ্কার হয়। একদিন অন্তর উনুনে আগুন জ্বলে। একদিনের রান্না দু'দিন খান। ক্ষেতের ফসল উঠানে পড়ে থাকে। মোষের দুধ কমে যাচ্ছে। বিট্‌ঠু রোগা হয়ে পড়ছে। কি করা যায়—ভেবে পান না বৃদ্ধ, কেবল বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে হতাশ মনের গহন হতে।

লছমীর বাপুজী ঘরে প্রদীপ জ্বালেন। সে প্রদীপের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে দেওয়ালে টাঙানো ছোরার চক্‌চকে ফলা। বৃদ্ধ বাপুজী তাকিয়ে থাকেন তাঁর লছমীর বুকেবেঁধা ছোরার দিকে। বিট্‌ঠু তিন চার দিন শুনেছে, ছোরার দিকে তাকিয়ে দাদাজী বলছেন—মা, তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোনো ভয় নেই। সে কথা আমি রাখতে পারলাম না। তোমার ধর্ম তোমার সম্মান, তুমি নিজেই

বাঁচিয়ে চলে গেলে। তোমার কেনা ছোরাই তোমাকে পিশাচের হাত হতে রক্ষা করেছে, আমি পারি নি।

গ্রামের বৃদ্ধেরা ঠাকুর সিংকে সান্ত্বনা দিতে আসেন। পুরোহিত পণ্ডিতজী প্রায়ই আসেন। সান্ত্বনা দেন—ভাগ্যই সব।

ভাগ্য তো কর্মফল! আমি এমন কি কুকর্ম করেছি, যার ফলে আমার সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল?—প্রশ্ন তোলেন ঠাকুর সিং।

পণ্ডিতজী উত্তর দেন—এ জন্মে না করলেও পূর্বজন্মে করেছ।

বৃদ্ধ নিরুত্তর হন। পূর্ব জন্মে কি করেছেন, তা তো এ জন্মে জানা যায় না।

একদিন পণ্ডিতজী বললেন—সিংজী, মহারাজের বিয়ের চেষ্টা কর।

শুনে সিংজী তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন, কথা বলতে পারলেন না। মহারাজের আবার বিয়ে! যে ঘরে লছমী ছিল, সেই ঘরে আর একজন আসবে!! এ কথা ঠাকুর সিংএর মনের কোণেও কোনো দিন জাগে নি।

ভাবভঙ্গী দেখে পণ্ডিতজী আর কথা বলতে সাহস করলেন না। নীরবে উঠে গেলেন।

সেই দিন হতে ঠাকুরসিংএর মেজাজ চড়ে গেল। সামান্য কারণে বিটঠুকে বকেন, মোষ দু'টোকে ঠেঙ্গান, জিনিসপত্র আছাড়িয়ে ফেলে দেন, দিনে রাতে পাঁচ-সাতবার লছমীর ঘরের মেঝেয় পড়ে কাঁদেন। তিনি কাঁদলে যে বিটঠুও কাঁদে, তা দেখেন না।

সংসার আর চলে না। লছমীর আদরের বিটঠু ছাড়া-বাড়ীর ফুলগাছের মত শুকিয়ে উঠছে। থন্‌থনে মোষ দু'টোর হাড় বেরিয়ে পড়েছে। বাড়ীঘর আবর্জনায় ভরে উঠেছে। বৃদ্ধের মন ক্রমেই অসহনীয় বিরক্তিতে ভরে উঠল।

অনেকদিন পরে পণ্ডিতজী এসে বসেছেন। একথা সেকথার পর ঠাকুরসিংই প্রথম কথা তুললেন—পণ্ডিতজীর খোঁজে কোনো মেয়ে আছে কিনা।

পণ্ডিতজী জানালেন--মেয়ে তাঁর হাতেই আছে। মেয়েটি বিধবা, তিনটি ছেলের মা। বড় ছেলের বয়স পনরো-ষোল, ছোটটি আট। বিষয় সম্পত্তি কিছু নেই, দিনমজুর খেটে খায়।

শুনে ঠাকুরসিং দমে গেলেন।

মাহার জাতির মধ্যে মেয়ের বড় অভাব। তবে সসন্তান বিধবা বিবাহ প্রচলন থাকায় কতকটা অভাব পূরণ হয়।

আরও দু'মাস কেটে গেল। মহারাজের পত্র এসেছে। সে দু'মাসের ছুটি পেয়ে বাড়ী আসছে।

পত্র পড়ে ঠাকুরসিংএর চোখে বর্ষা নামল। মহারাজ বাড়ী আসবে; আজ ঘরে লছমী নেই।

লছমী নেই, কর্তব্য আছে। সারারাত লছমীর ঘরেব বারান্দায় শুয়ে কেঁদে, প্রভাতে সংসারেব কাজ সেরে, বিট্‌ঠুকে সাথে নিয়ে গেলেন পণ্ডিতজীর বাড়ী। সেখানে বিট্‌ঠুকে বেখে, পণ্ডিতজীর সাথে গেলেন দূরগ্রামে পাত্রী দেখতে।

অনেক রাতে বাড়ীফিরে ঠাকুরদাদা মাযেব ঘরের মেঝেয পড়ে যে প্রকার কান্না কেঁদেছিলেন, সে প্রকার কাঁদতে আর কোনোদিন বিটঠু দেখে নি।

মহারাজ সিং বাড়ী এলেন। লছমীর ঘরে বসে কাঁদলেন। দু'দিন পরে পণ্ডিতজীর মুখে বিয়ের প্রস্তাব শুনে না না করলেন। তারপর একদিন ছোট ছেলেটি সমেত বউ ঘরে আনলেন।

লছমীর বাপুজী বিটঠুকে নিযে বাড়ীর বাইরে আমগাছের তলায় সেই ঘরে বাসা করলেন। দু'জন সেখানেই থাকেন, সেখানে বসেই খান, সেখানে শুয়েই ঘুমান, পারতপক্ষে আর বাড়ীর ভিতরে আসেন না।

ছুটি ফুরোলে মহারাজ সিং চলে গেলেন, ঠাকুর সিংএর নতুন সংসার আরম্ভ হল। নতুন বউ সংসারের কোনো বিষয়ে শ্বশুরের পরামর্শ চায় না, জিজ্ঞাসাও করে না, কিন্তু হুকুম করে। পেট যখন আছে, বিটঠু যখন আছে, তখন লছমীর বাপুজী সে হুকুম তামিল করতে বাধ্য।

প্রাতে ছাতু দই খেয়ে মোষ নিয়ে ঠাকুর সিং যান মাঠে, সাথে যায় বিট্‌ঠু ভেড়ার পাল তাড়িয়ে। দুপুরে মাঠের মধ্যে বটগাছ তলায় ছাতু-লবণ খেয়ে বিট্‌ঠু ঘুমায় দাদাজীর ছেঁড়া পাগড়ি বিছিয়ে। পাশে বসে বৃদ্ধ ভাবেন—পনরো বছর আগে এমনি করেই তো লছমী তাঁর সাথে মাঠে আসত, এমনি করেই ভেড়া চড়াত, এমনি দুপুরে দৈ-চিড়ে-গুড় খেয়ে ঐ তো ঐ জায়গাটাতেই অমনি করে পাগড়ির কাপড় বিছিয়ে সে ঘুমাত।

ভাবতে ভাবতে ঠাকুরসিংএর মন উদাস হয়ে যায়, চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

ঝাঁ ঝাঁ রোদে মাঠের দিগন্তে নেমেছে একটা অদ্ভুত কালো ছায়া। ছায়াটা দেখতে মানুষের মত। প্রতিদিন দুপুরে বটগাছ তলায় বসে ছায়াটা দেখেন ঠাকুর সিং। দেখে ভয় হয়। একদিন বিট্‌ঠুকে ডেকে দেখালেন। বিট্‌ঠু কিছুই দেখে না। সে বলে—দাদাজী, তোমার চোখের দৃষ্টি কমে গেছে।

দাদাজী ভাবেন—হবেও বা। কিন্তু আর কোনো সময় কোথাও তো ওটা দেখি নে!

* * *

মহারাজ সিংএর পত্র এসেছে, তিনি পেনসন পেয়ে বাড়ী আসছেন। পত্র পড়ে বৃদ্ধ ঠাকুর সিংএর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর ভাবনা নেই, ছেলে বাড়ী এসে বাড়ীতেই থাকবে। ঠাকুর সিংএর শেষের দিন ক'টা ছেলের কাছেই কাটবে।

ছেলে বাড়ী আসছে, বুড়ো বাপ খোঁজ করেন—ঘরে ভাল ঘি আছে কিনা, উত্তর পান না। জিজ্ঞাসা করেন—বড় ঘরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে কিনা, উত্তর পান একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। মহারাজের দ্বিতীয় পক্ষ লছমীর ঘরে প্রবেশ করতে ভয় পায়। তার জন্য পৃথক ঘর উঠেছে।

রাত্রে ঠাকুরসিং ঘুমালেন না। রেল স্টেশন বহুদূর হলেও রাত্রে

গাড়ীর শব্দ শোনা যায়। কান পেতে শুনতে চান শেষ রাতের গাড়ীর শব্দ।

শেষ রাতে গাড়ী হতে নেমে বেলা একপ্রহরের মধ্যেই মহারাজ বাড়ী পৌঁছে যান। ভোর হতেই পথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বুড়ো বাপ ঠাকুর সিং। আমতলার ঘরে বসেই পথের অনেক দূর দেখা যায়।

মোষ নিয়ে মাঠে যাওয়ার সময় হল, বুড়ো বাপ উঠলেন না। নিয়মিত সময়ে খাবার এল, বিট্ঠু খেল, ঠাকুর সিং খেলেন না। বাড়ীর ভিতর হতে মোষ, ভেড়া নিয়ে মাঠে যাওয়ার তাগিদ এল, অগ্রাহ্য হল সে তাগিদ। আজ ছেলে বাড়ী আসছে, বুড়ো বাপ কিছুতেই বাড়ী ছেড়ে যাবেন না। আর তিনি কাউকে ভয় করেন না, ছেলে আজ বাড়ী আসছে।

বেলা একপ্রহর হয়ে গেল, দু'প্রহরও পার হয়ে গেল, অভুক্ত বুড়ো বাবা বসে আছেন পথের দিকে তাকিয়ে, ছেলের দেখা নেই।

বেলা তৃতীয় প্রহর যখন শেষ হতে চলেছে, তখন দেখা গেল বহু দূরে একটা লোক আসছে, তার দুই বগলে দুখানা কাঠের পায়া। লোকটার একখানা পা নেই।

এ রকম খোঁড়া তো এ অঞ্চলে কেউ নেই! কে লোকটা?— ভাবেন ঠাকুরসিং।

খোঁড়া মানুষটা এগিয়ে আসছে। তার পিছনে আসছে মাঠে দেখা সেই ভয়ঙ্কর ছায়া মূর্তিটা।

ভয় পেয়ে গেলেন ঠাকুরসিং। পাশেই ঘুমন্ত বিট্ঠুকে জাগিয়ে দেখালেন সেই কালো ছায়া মূর্তি, আর খোঁড়া মানুষটা।

দাদাজী, বাবা আসছেন।— বলেই বিট্ঠু লাফিয়ে ঘর হতে বেরিয়ে পড়ল।

আর সহ্য হল না, পঁচাত্তর বছর বয়সের বুড়ো বাপ ঠাকুরসিং আর একটি কথাও না বলে লুটিয়ে পড়লেন সেই সাধের ছোট ঘরে ছেঁড়া ময়লা বিছানার ওপরে।

রাত্রে দেখা দিল জ্বর। পরদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কেটে গেল। তারপর দিন কথা বলতে আরম্ভ করলেন। সে কথা একমাত্র তাঁর লছমীর সাথে।

সন্ধ্যায় পণ্ডিতজী এসে হাতদেখে বলে গেলেন—আর দেরী নেই, রাত কাটবে না।

সন্ধ্যা হতেই আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় ঘরের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। রোগী ক্রমে স্থির হয়ে আসছে। আঁধার ঘরে রোগীর তু'পাশে বসে আছেন মহারাজসিং আর বিটঠু।

রাত তুপুর পার হয়ে গেল। বাইরে ঝড়ো হাওয়া থেমে আসছে। ঘরে ঠাকুরসিংএর জীবন-প্রদীপের তেলও ফুরিয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বিত্যুতের ঝলকে অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়ে উঠছে। সে আলোয় কে যেন শেষদেখা দেখে নিচ্ছে, পাঁচাত্তর বছরের সুখ-তুঃখের স্মৃতি বিজড়িত পরম প্রিয় মুখখানা।

হঠাৎ আকাশ চিড়ে বিত্যুৎ ঝলক্ দিল। সাথে সাথে ঠাকুরসিং উঠে বসে বললেন—লছমী, টাকা দে। তোর আর বিটঠুর জন্য কাপড় জামা কিনতে মেলায় যাই। টাকা দে।

বলেই দেহটা লুটিয়ে পড়ল মহারাজের কোলের ওপরে।

বৃদ্ধ মাহার কৃষক লছমীর বাপুজী ঠাকুরসিং চলে গেলেন ভগবানের আনন্দ মেলায়, তাঁর হাতে গড়া স্নেহের পুতলী পুত্রবধূ লছমীর ঘাগরা-ওড়নার কাপড় কিনতে। তাঁকে হারিয়ে অশ্রুবৃষ্টিতে বুক-ভাসাতে আরম্ভ করলেন ধরণীদেবী।

* * *

মা চলে গেলে বিটঠুর ছিল দাদাজী। দাদাজী চলে গেলে থাকলেন বাবা। বাবা খোঁড়া মানুষ, কাজকর্মে অক্ষম। দ্বিতীয় পক্ষ পরামর্শ দিলেন, তাঁর প্রথম পক্ষের উপযুক্ত তু'টি ছেলে এ সংসারে এলে আর কোনো অসুবিধে হবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে সম্পত্তির অর্ধেক দ্বিতীয় পক্ষের নামে লিখে

দিয়ে তার ছুই ছেলেকে আনা হল। তারা এসে সমস্ত জমির ভাগচাষ ছাড়িয়ে নিজেরা ধরল লাঙ্গল। সংসার বেশ চালু হল।

সংসার চালু হল, মহারাজসিংকে সংসারের কোনো কাজ করতে হয় না। কিন্তু অল্প ক'মাসের মধ্যেই বোঝা গেল—যদিও মহারাজসিং তখনও সম্পত্তির অর্ধাংশের আইনত মালিক, তথাপি ব্যবহারত নন। পেনশনের টাকা ক'টাও হাতে রাখা সম্ভব হয় না। বিটঠুর ছুর্দশা চরমে উঠল।

একদিন প্রাতে এক কলসী ছুধ মাথায় নিয়ে বিটঠু যাচ্ছিল গোয়াল-বাড়ী। পথে ছু'টো কুকুর জড়াজড়ি করে এসে তার ওপরে পড়ে। ফলে, পড়ে যেয়ে কলসী ভেঙ্গে ছুধ নষ্ট হয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এসে বলতেই সৎমা তাঁর ছুই ছেলেকে হুকুম দিলেন—বেঁধে চাবুক লাগাও।

আদেশ পালিত হল। মোষ তাড়ানো চামড়ার চাবুক এক ঘা মারতেই কেটে রক্ত ছুটল। মহারাজসিং স্থির থাকতে পারলেন না, হা হাকার করে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন লছমীর বুকের ধন, ঠাকুরসিং-এর আদরের ছুলাল বিটঠুকে।

চাবুক আর চলল না। হুকুম হল—বাপ-বেটা ছু'টোকে এক দিন-রাত ঘরে কয়েদ রাখ। এক দিন-রাত খাদ্য পানীয় বন্ধ।

মহারাজ সে হুকুম মেনে নিলেন। ছু'জনে লছমীর ঘরে গেলেন। ঘরের বাইরে দরজায় তালা পড়ল।

পরদিন মুক্ত হয়ে ছু'জনে স্নান করে যা কিছু পেলেন তাই খেলেন। তারপর বাপ-বেটা নীরবে বাড়ী হতে বেরিয়ে মাঠে যেয়ে ধরলেন তাঁদের একটা ছুধেল মোষ।

বিটঠু কিছুই বুঝল না, বুঝতে চায়ও নি ; বাবা যা বলছেন তাই করছে। মোষটা তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন এক মেলায়। সেখানে মোষ বিক্রী করে পাওয়া গেল অনেকগুলো টাকা। ভাড়া করা হল গরুর গাড়ী। গাড়ীতে চড়ে সন্ধ্যায় ছু'জনে পৌছে গেলেন রামনগর রেল স্টেশনে। টিকিট কেটে রেলে চড়ে পরদিন পৌছলেন হরিদ্বারে।

হরিদ্বারে তখন চলছিল বৈশাখী সাধু-মেলা। বহু সাধু-সন্ন্যাসী এসেছেন। মহারাজ ছেলে নিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের ডেরায় ডেরায় ঘোরেন। কোনো কোনো সাধু-ডেরায় সারাদিন বসে কাটান। এমনি করে দশ-বারো দিন গেল।

শেষে একদিন এই মহান্তমহারাজের ডেরায় এসে মহারাজসিং মহান্তমহারাজের চরণ জড়িয়ে ধরলেন—মহারাজ, কৃপা করে আমার বিটঠলদাসকে আপনাদের চরণে আশ্রয় দিন।

অনুরোধ রক্ষিত হল। ছোটে মহারাজের পরামর্শে মহান্ত মহারাজ বিটঠলদাসের ভার নিতে সম্মত হলেন।

তারপর মহারাজসিং এসে দাঁড়ালেন বারোবছরের বালক পুত্র বিটঠল দাসের সম্মুখে।

কিছুক্ষণ নীরবে মাথা নত করে থেকে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে হঠাৎ বিটঠুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন মহারাজসিং।

বাপ বিটঠু, আমি তোমাকে রাখতে পারলাম না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। আমি নিরুপায়। তোমাকে ভগবানের নামে মহান্ত মহারাজের চরণে সঁপে দিয়ে গেলাম। ভগবান বিটঠল নারায়ণ তোমাকে সুখী করুন।

এই বলে মহারাজসিং তাঁর একমাত্র পুত্র বিটঠল দাসকে ত্যাগ করে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন।

বারোবছর বয়সের সরল গ্রাম্য বালক বিটঠলদাস, তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নিক্ষিপ্ত হল এক নতুন জীবন-যাত্রা-পথে। সে পথে দাঁড়ানোর আগে সে কিছুই বুঝতে পারে নি, কিছুই জানত না। যখন জানল, যখন বুঝল—তার একমাত্র আপনজন আশ্রয় বাবা তাকে চিরতরে ত্যাগ করে গেছেন, আর সে তার জন্মপরিচিত গ্রাম, তার বাড়ী, তার মায়ের ঘরখানা দেখতে পাবে না, তখন বালক প্রাণ-খুলে কাঁদার সুযোগও পায় নি। প্রথম দু'তিন দিনের মধ্যে সে ব্যাপারটাই বুঝে উঠতে পারে নি।

তারপর ক্রমে ক্রমে এখন সে বুঝেছে, বাবা তার ভালই করেছেন। এখনও বাবার কথা মনে হয়ে কান্না পায়। খোঁড়া মানুষ বাবা তার কতই না কষ্ট পাচ্ছেন। আজ তিন বছর সে বাবাকে দেখেনি বাবার সংবাদ কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় পায়।

* * *

বিটঠলদাস তার কাহিনী শুনিয়ে কাতর হয়ে অনুরোধ করল,— মহারাজ, আপনি তো আমাদের সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী নন। আপনি দয়া করে আমার বাবার সংবাদ নিয়ে আমাকে জানাবেন? বাবা কেমন আছেন—মাত্র এই সংবাদটুকু আমি জানতে চাই।

বালকের আকুলতায় আমারও চোখে জল এল। মুখে বললাম,— আমি সুযোগ পেলেই তোমার বাবার খোঁজ করে জানাব।

সাধু সন্ন্যাসীর ব্যবসা

দুইদিন পানিপথে থেকে আমাদের ক্যারাভান দিল্লী এসে যমুনার তীরে ছাউনি ফেলল। সম্মুখেই ইতিহাস বিখ্যাত লাল কেল্লা। দলের সমস্ত তাঁবুই খাটানো হ'য়েছে। ম্যানেজার মহারাজের মুখে শুনলাম, দিল্লীতে মহান্ত মহারাজের বহু ভক্ত আছেন, সে জন্য কিছুদিন থাকতে হবে। ম্যানেজার আরও জানালেন, দিল্লীর ভক্তদের মধ্যে নানাদেশের ইংরেজী জানা বড় বড় চাকুরে সাহেব আছেন। তাঁরা এলে আমাকেই দোভাষীর কাজ ক'রতে হবে।

শুনে একটু চিন্তিত হলাম। থানেশ্বর যাওয়ার পথে দিল্লী স্টেশনে যে কাণ্ড ঘটেছিল, তাতে সেখানে যাঁরা আমাকে দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে

যদি কেউ এখানে সাধুদর্শনে এসে আমাকে দেখে চিনে ফেলেন, তবে তাঁদের প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে। অনেক ভেবে চিন্তে ম্যানেজারকে দু'সেট দামী 'বিবেকানন্দী পোষাক' আর একজোড়া রঙিন চশমা যোগাড় ক'রতে বললাম।

ম্যানেজার খুশী হ'য়ে, সেই দিনই এক পার্শী কোম্পানির দোকানে অর্ডার দিয়ে, দু'দিন পরে পোষাক এনে দিলেন। যে দিন প্রথম পোষাক প'রে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, মহান্তমহারাজের আমদরবারে উপস্থিত হলাম, সে দিন আমার সাজগোজ হাবভাব দেখে, দুই মহারাজই বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন।

তাঁদের এই সন্তুষ্টির আসল কারণটা বুঝলাম কয়েকদিন পরে। আমি একজন রাজপুত্র, বিলেতে পড়াশুনা করছিলাম। আমার পূর্বজন্মের গুরু এই মহান্তমহারাজ একদিন বিলেতে ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে, পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, ভারতে এসে সন্ন্যাসী হয়ে পুনবায় সাধন ভজনে মনোনিবেশ করতে উপদেশ দেন। আমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে দেশে এসে, আমার জন্ম জন্মান্তরের গুরু মহান্তমহারাজের চরণাশ্রয় করে মোক্ষের পথ প্রশস্ত করছি।

শুনে বিস্মিত হলাম। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ রকম মিথ্যে প্রচার কেন করা হচ্ছে?

তিনি একটু হেসে বললেন—ও সমস্ত কথা নিয়ে আপনি ব্যস্ত হবেন না। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে, হাঁ না—কিছু বলবেন না। আপনার যাতে ভাল হয়, তা আমরা করব। আপনি কালে বিখ্যাত লোক হবেন। মনে রাখবেন—এটা কলিকাল। কলিকে অস্বীকার করে কেউ মাথা তুলতে পারবে না।

সন্ন্যাসী ম্যানেজার-মহারাজের মুখে সেদিন কলিমহারাজের যে অপার মহিমা শুনলাম, তাতে আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। সে দৃষ্টি আজ এই ১৯৪১ সালেও অব্যাহত আছে। তাতে এপর্যন্ত যা দেখলাম, তা খুলে লিখলে বহু মানহানির মামলায় পড়ে যাব। তবুও আমার চলার পথের

দু'ধারে যা দেখেছি ও শুনেছি, তার অনেক কিছু কাটছাঁট করে লিখছি।

ম্যানেজার ছোটেমহারাজের নির্দেশমত নতুন পোষাকে সেজেগুজে মহান্তমহারাজের রাজাসন পাশে আর একটা মূল্যবান আসনে বসে থাকি। যতকিছু দামী সাজ সজ্জা আসবাবপত্র সবই বোধহয় বেরিয়েছে।

কৌপীন পরিহিত জটাধারী মহান্তমহারাজ বসেন সোনায় মোড়া গদীতে। মুণ্ডিত-মস্তক গেরুয়া-আলখাল্লা ও বর্হিবাস পরিহিত ছোটে মহারাজ গদীর সম্মুখে বসে ম্যানেজারী করেন। আমদরবারের প্রবেশ-পথের দু'ধারে চারটে ধুনি জ্বলে। প্রত্যেক ধুনির পাশে পালা করে এক একজন চেলা-সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন থাকেন।

বেলা দশটা পর্যন্ত এবং অপরাহ্ণ তিনটের পর রাত্রি আটটার মধ্যে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শনার্থী ও কৃপাপ্রার্থীর সমাগম হয়। তাঁরা গদীর সম্মুখে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে একটু বসে মহান্তমহারাজের উপদেশামৃত পান ক'রে চলে যান। কেউবা কিছু বিশেষ প্রণামী দিয়ে ম্যানেজার মহারাজের নিকট হতে কিঞ্চিৎ কৃপা-ভস্ম নিয়ে যান। স্পেশাল কৃপা বিতরণ হয় বেলা দশটা হতে দুটো পর্যন্ত, আর একস্ট্রাস্পেশাল কৃপা রাত ন'টার পরে।

এই ব্যবসার বড় বড় শিকার অতিশয় বুদ্ধিমান কিনা, তাই তাঁরা নির্জনে সাধুসঙ্গ করে স্পেশাল একস্ট্রাস্পেশাল কৃপা সংগ্রহ করেন। একশ্রেণীর জ্যোতিষীদের স্পেশাল মাদুলী ও একস্ট্রাস্পেশাল বাবাদুলীর জন্য যেমন বিশেষ বিশেষ দক্ষিণা দিতে হয়, এই সমস্ত সন্ন্যাসীবাবাদের কৃপার তারতম্য অনুযায়ী ঐপ্রকার বিশেষ বিশেষ প্রণামী দিতে হয়। অবশ্য এই প্রণামীর পরিমাণ নির্ভর করে কৃপাপ্রার্থীর ট্যাঁকের পরিধির ওপরে।

বড় বড় ঘোড়েল (গভীর জলের বড় কুমির) কৃপাপ্রার্থী আগমনের পূর্বে লোক পাঠিয়ে সময় নির্দিষ্ট করে তবে আসেন। এই ঘোড়েল শিকারের জন্য এমন ভাবে সময় স্থির করতে হয়, যাতে পথেও এক ঘোড়েলের সাথে অন্য ঘোড়েলের দেখা না হয়।

বাংলার বাইরে এই সমস্ত সাধুসন্ন্যাসী-গোস্বামী বাবাদের কৃপা-প্রার্থিনী মহিলা বড় বেশী দেখা যায় না। যা দু'চারজন অবাঙ্গালী মহিলা আসেন, তাঁরা প্রায়ই কোলের ছেলেটার রোগমুক্তি বা পবমায়ু বৃদ্ধির কামনা নিযে আসেন। তাঁদেব দানও টাকাটা সিকেটার ওপরে ওঠে না।

সাধুবাবাদের ব্যবসা চলে স্পেশাল ও একস্ট্রাস্পেশাল কৃপাপ্রার্থীদের নিয়ে। তারমধ্যে একস্ট্রাস্পেশাল কৃপাপ্রার্থী ঘোড়েলই প্রধান। এই সমস্ত কৃপাপ্রার্থীদের সমস্যাও নানাপ্রকার।

দিনমজুর, রেলস্টেশনের কুলি। মোটেব আশায় দাঁড়িয়ে থাকে। অপর সকলে মোট পায়, সে পায ন। মালগুদামেব কাজে সবচাইতে ভারী বোঝাটাই তার ঘাড়ে চাপে।

টাঙ্গাওয়ালা, যে ঘোড়াটা কেনে, সেইটাই বদমাশ হয। প্রায়ই গাড়ী ভেঙ্গে রুজিরোজগার বন্ধ হযে বালবাচ্চা নিযে না খেয়ে দিন কাটে।

ছোট দোকানদার, দোকান করে। পাশের দোকানে খদ্দেরের ভিড়ে মাল দিয়ে উঠতে পারে না, একসেবে চোদ্দ ছটাক মাপে। আর তার দোকানে মাছিও নড়ে না।

বড় দোকানদার, বাজারের সেরা মাল সাজিয়ে বসে থাকে। অন্য দোকানে ভেজাল নকল পচা মাল নির্বিবাদে ভাল দরে বিক্রী হয়। তার দোকানের মাল কেউ দেখতেও আসে না।

গোল্ডমেডেলিষ্ট ডাক্তার। যে রোগী, হাতে আসে, সেই যমের বাড়ী যাওয়ার পথে দেখা করে যায় মাত্র। তাঁর অপূর্ব চিকিৎসা বিদ্যার পরিচয় দিতে সময় দেয় না। নির্বোধেরা তাঁর নাম রেখেছে 'কলির যম'।

কলেজের ছাত্র, দু'বার আই, এ, ফেল করে বি, এ,-তে ঢুকেছে। চেহারাটা গোরিলার মত। ভালবেসে ফেলেছে একটা কলেজের মেয়েকে। দু'জনের আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে। মেয়েটা কিন্তু তাকে ত্যাগ করে আর একটা বানরমুখো ছেলের সাথে থিয়েটার করে, পিক্‌নিকে যায়।

চাকুরে সাহেব বা বাবু, দশবছর চাকরি করছেন। তাঁর নীচের বাবু

ওপরে উঠে তাঁরই ওপরে 'ছড়ি ঘুরোয়'। তিনি প্রমোশন পান না। বড় সাহেবকে খুশী করার মত 'খুশ্'-ও যোগাড় হচ্ছে না।

বড় ব্যবসাদার, বড় বড় লিমিটেড কোম্পানির ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্ট। শত চেষ্টা করেও লাভের শতকরা চল্লিশের বেশী সরাতে পারেন না। অংশীদার-শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বহু শয়তান ঢুকে পড়েছে।

ফাট্‌কাবাজ, এবার ঠিকমত সরকারী বাজেট ফাঁস করতে পারেন নি। বিশ্বাসঘাতকেরা বহু টাকা খেয়ে যে সমস্ত 'টিপ্‌স্' দিয়েছিল, তাতে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। গভর্নমেণ্টের কাছেও তাঁর বিরুদ্ধে কূটনামী চলছে।

এই রকম নানা সমস্যা নিয়ে নানা শ্রেণীর কৃপাপ্রার্থী আসেন। আধ্যাত্মিক সমস্যা নিয়ে কাউকে আসতে দেখি নি। পরে জেনেছি— আধ্যাত্মিক সমস্যাটা একমাত্র শিক্ষিত বাঙ্গালী ঘোড়েলদের সমস্যা। বাংলার বাইরে অবাঙ্গালীরা ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তারা শিবের মাথায় জল ঢেলে ঘণ্টা বাজিয়েই কাজ সারে।

আমাদের মহান্ত-মহারাজের চরণতলে দিল্লীতে যত সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল, তার মধ্যে সবচাইতে মজাদার সমস্যা উপস্থিত করেছিলেন এক ভারতীয় 'হিজ হাইনেস' মহারাজা।

হিজহাইনেসটি শিশুকাল হতেই লণ্ডনে পালিত ও শিক্ষিত। ভারতীয় কোনো ভাষাই ভারতীয় মহারাজা জানেন না, বোঝেনও না। সেজন্য আমি মহান্তমহারাজের দোভাষী হয়ে হিজহাইনেসের সমস্যার স্বরূপ জানতে সুযোগ পাই।

আমাদের দিল্লীবাসের সাত কি আট দিন পরে একরাত্রে হিজহাইনেসের প্রাইভেট সেক্রেটারী এসে নিবেদন জানালেন যে, হিজহাইনেস মহারাজা এই ভারত প্রসিদ্ধ অলৌকিক শক্তিশালী মহাতমার চরণ দর্শন ক'রে ধন্য হতে চান। নানা কারণবশত হিজ্‌হাইনেসের এখানে আসা সম্ভব হচ্ছেনা। তারপর মহাতমার সাথে তাঁর একটু গোপনীয় কথাও আছে। হিজ্‌হাইনেস শুনেছেন যে, মহাতমার নিজস্ব বিশ্বাসী ইংরেজী জানা দোভাষী আছে। মহাতমা যদি কৃপা করে তাঁর নিজস্ব দোভাষী

সাথে নিয়ে হিজহাইনেসের দিল্লীপ্যালেসে চরণ ধূলো দেন, তবে হিজ্‌হাইনেস-মহারাজা কৃতার্থ.

ম্যানেজার মহারাজ পাঁচ সাত মিনিট তাঁদের ব্যবসাদারী মামুলী 'তাই-রে-না-রে-না' ক'রে স্বীকার হলেন। পরদিন বেলা সাড়েবারোটায় রোলস্‌রয়েস মোটর গাড়ী এল। আমরা তিন জন গেলাম মহারাজার দিল্লীপ্রাসাদে।

যথারীতি আদর অভ্যর্থনা পেলাম। দারোয়ান থেকে হিজ্‌হাইনেস পর্যন্ত উপস্থিত সকলেই 'গোড়লাগে মহারাজ' জানালেন। হিজ্‌হাইনেস বোধ হয় তাঁব সেক্রেটারীর কাছে হাতজোড় করা ও 'গোড়লাগে মহারাজ'টা শিখে নিয়ে, বহু কষ্টে রপ্ত করেছেন। হিজ্‌হাইনেস সব দিক থেকেই পুরোদস্তুর সাহেব। তবে বোধ হয় তাঁর বিবাহিত ভারতীয় পত্নীদের বেলায় গোঁড়া ভারতীয় রক্ষণশীল। আমাদের দু'ঘণ্টা অবস্থিতির মধ্যে রাজ-অন্তঃপুরের কোনো মহিলা দর্শনার্থিনীর দেখা পাই নি।

গোড়লাগের পালা শেষ হলে, হিজ্‌হাইনেস আমাদের তিনজনকে নিয়ে তাঁর পাঠাগারের দরজা নিজহাতে বন্ধ করে বসলেন সাধুসঙ্গ করতে। আমি হলাম দোভাষী।

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাতমার চরণে তিনি যে মর্মান্তিক দুঃখ কাহিনী নিবেদন করলেন তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ;—

মহারাজা শিশুকাল থেকেই ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছেন। এখনও ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডেই তাঁর দিন কাটে। পিতা বেঁচে থাকতে, কেবলমাত্র বিবাহ করতে বারদশেক এদেশে আসা-যাওয়া করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর নিজে রাজা হয়ে নিতান্ত বৈষয়িক প্রয়োজনে ইংরেজ সরকারের চাপে কয়েকবার ভারতে আসতে হয়েছে। তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধব সব ইওরোপে, এদেশে বড় একটা কেউ নেই। তাঁর বিবাহিত ডজনদেড়েক ভারতীয় স্ত্রী, ভারতেই নিজরাজ্যে রাজ অন্তঃপুরে পর্দানশিন হয়ে বাস করেন ; মহারাজা যখন দেশে আসেন, তখন

দেখা সাক্ষাৎ হয়। ভারতের মধ্যে মহারাজা রাজ্যের বাইরে কোথাও যদি যান, তবে দু'চারজন ভাগ্যবতী তাঁর সঙ্গিনী হবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এ হেন হিজ্‌হাইনেস দু'বছর পূর্বে প্যারিসে এক বিশ্বসুন্দরীর দেখা পেয়ে বহু চেষ্টায় তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। সেই আন্তর্জাতিক সুন্দরীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে আত্মসাৎ করার জন্য বহু সাধ্যসাধনা করা হ'লেও মুক্তবিহঙ্গী কোনও বন্ধন স্বীকার ক'রে হিজহাইনেসের সঙ্গিনী হতে রাজি হলেন না। তবে আজীবন তাঁর প্রমোদিনী হ'য়ে থাকবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তারপর দু'বছর সেই বিশ্বসুন্দরীকে নিয়ে হিজহাইনেস মহানন্দে কাটিয়েছেন। সে দু'বছরে লণ্ডন, প্যারিস, সুইজারল্যাণ্ড, নিউইয়র্ক প্রভৃতি পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত অভিজাত প্রমোদক্ষেত্রের যেখানেই তিনি তার প্রমোদিনীর সাথে গিয়েছেন, সেখানেই অভিজাত মহলে একটা বিপুল পুলক-শিহরণ জাগিয়ে অভূতপূব সম্মান, সমাদর, অভ্যর্থনা পেয়েছেন। এর জন্য মহারাজার অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে।

দু'বছরে কয়েক কোটি টাকা খরচ ক'রে পৃথিবীর প্রমোদক্ষেত্র ঘুরতে ঘুরতে শেষে এক অশুভক্ষণে হিজহাইনেস তার প্রমোদ-সঙ্গিনীর কথামত উপস্থিত হলেন ভূমধ্যসাগরের তীরে সর্বপ্রকার আইন শৃঙ্খলামুক্ত আন্তর্জাতিক প্রমোদক্ষেত্র 'মঁতেকার্লো'।

মঁতেকার্লোয় তখন হিজহাইনেসের পরিচিত বহু বন্ধু-বান্ধবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বহু ভারতীয় হিজহাইনেস ও হিজহাইনেসদের সুযোগ্য পুত্রও ছিলেন। আর ছিলেন এক বিখ্যাত ঘোড়াওয়ালা। ঘোড়াওয়ালাটি কিন্তু ভারতীয় হিজহাইনেস মহারাজাদের চাইতে ধনে মানে অনেক বড়।

কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল মহারাজার নিকটে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ বিশ্বসুন্দরী ঘোড়াওয়ালার সাথে নিভৃতে আলাপ সুরু করেছেন।

অবস্থা সুবিধে নয় বুঝে, মহারাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আজীবন প্রমোদ-

সঙ্গিনীকে নিযে সরেপড়ার মতলব কবতেই আন্তর্জাতিক বিহঙ্গী তাঁর হৃদয়পিঞ্জব ভেঙ্গে উড়ে যেযে ঘোড়াওযালাব কোলে বসেছেন।

এই দুর্ঘটনার ফলে ভারতীয হিজহাইনেস মহাবাজাব হাইনেসটা এমন ভাবে পথের ধূলোয লুটিযে পড়েছে যে, অভিজাত বন্ধু-বান্ধবী মহলে আর মুখ দেখানোব উপায নেই। কতকগুলো শযতান সংবাদপত্র-ওযালা ঘটনাটা ফলাও কবে প্রকাশ কবেছে। তাই মহাবাজা মনের দুঃখে ভাবতীয বনে এসেছেন সিদ্ধ মহাপুরুষ সাধু সন্ন্যাসী ফকির খুঁজতে।

মহাবাজা বহু বিলেতী বই ও সাময়িক পত্রিকায পড়েছেন—ভারতীয সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিবেবা এমন অদ্ভুত শক্তিব অধিকাবী যে, তাঁরা ইচ্ছা করলে যে কোনও মানুষকে বশীভূত কবে যা তা কবিযে নিতে পাবেন। তাঁদেব কাছে এমন সব বস্তু আছে, যা দেখানো মাত্রই মানুষ গরু, সাপ, বাঘ—সব বশীভূত হ'যে পিছনে পিছনে ঘোবে। তাঁরা তাঁদেব অলৌকিক শক্তিবলে যে কোনো মানুষকে ছাগল, ভেড়া, সাপ, ব্যাঙ—যা খুশি, তাই কবে দিতে পাবেন। তাই হিজহাইনেস মহারাজা এই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সিদ্ধ ফকিবের শরণাপন্ন হযেছেন। এখন কৃপা পূর্বক তাব এই দুর্নিবাব আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখত্রয বিনাশ কবত মর্মান্তিক দুঃখসাগব হতে উদ্ধারেব ব্যবস্থা কবলে এর জন্য তিনি উপযুক্ত প্রণামী দিতে প্রস্তুত আছেন।

মহান্তবাবাব নির্দেশক্রমে আমি হিজহাইনেসকে প্রশ্ন কবলাম—তিনি সেই সুন্দরী সম্পর্কে কি ব্যবস্থা কবতে চান?

মহারাজা উত্তব দিলেন—তিনি আর ঐ দুশ্চরিত্রাটাকে ফিরিযে এনে পূর্বের মত সঙ্গিনী কবতে চান না। তাকে ঐ ঘোড়াওযালার হাত হতে উদ্ধার করে নিজের বশীভূত দাসী করে রাখতে চান। তবে সবচাইতে ভাল হয়, যদি এক সন্ধ্যায় ঘোড়াওয়ালা যেয়ে দেখে, তার সখের বিশ্বসুন্দরী একটা হুতমপেঁচী হয়ে চেয়ারে বসে চোখ পাকাচ্ছে।

হিজহাইনেস মহারাজের প্রস্তাব শুনে মহান্তবাবা পরম গম্ভীরভাবে বললেন—তিনি ইচ্ছে করলে ঐ বিশ্বসুন্দরীকে সাপ, ব্যাঙ, হুতম পেঁচা—যা খুশি করে দিতে পারেন। তবে কিনা সেটা বড় নিষ্ঠুরতা হবে। তার চাইতে বরং তিনি একখানা মন্ত্রপূত রুমাল দেবেন। পর পর তিন দিন ঐ রুমালখানা সেই সুন্দরীকে দেখালেই সে বশীভূত হয়ে আজীবন মহারাজার দাসী হয়ে থাকবে।

এ প্রস্তাবে মহারাজা সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হলেন। বিদায়ের সময় দশহাজার টাকার একখান চেক আমাদের ম্যানেজারের হাতে দিয়ে, এগারোখানা গিনি মহান্তবাবার চরণে অঞ্জলী দিলেন। কার্য সিদ্ধ হলে আরও এক লাখ টাকা প্রণামী দেবেন শুনিয়ে, নিজে এসে গাড়ীর দরজা খুলে মহান্তবাবা ও আমাদের বসিয়ে, আর একবার 'গোড়লাগে' জানিয়ে বিদায় দিলেন। আমরা পরমানন্দে ডেরায় ফিরলাম।

পরদিন যথাসময়ে হিজহাইনেসের মোটর এল। ম্যানেজার ছোটে মহারাজ সুন্দর হাতির দাঁতের ছোট বাক্সে মন্ত্রপূত রুমাল নিয়ে হিজ-হাইনেস দর্শন করে এলেন। সে দিন আর আমি যাই নি।

মহান্তমহারাজের মন্ত্রপূত রুমাল দেখিয়ে হিজহাইনেস মহারাজা তাঁর সেই বিশ্বসুন্দরী বিহঙ্গীটিকে ঘোড়াওয়ালার কোল হতে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলেন কিনা, তা পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে আর জানতে পারি নি। কারণ, সে দু'বছর যে পরিবেশের মধ্যে ছিলাম, সে পরিবেশে ও প্রকার সংবাদ বহন করে কোনো সংবাদপত্র প্রবেশ করতে পারে না। দু'বছর পরে বাইরে এসে আবার যখন সংবাদপত্র পড়তে আরম্ভ করলাম, তখন হঠাৎ বোম্বাই হতে প্রকাশিত একখানা সাময়িক পত্রিকায় সেই আন্তর্জাতিক সুন্দরীর সন্ধান পাই। বাংলা দেশের বিশেষ করে বাঙ্গালী পরিচালিত সংবাদপত্র-পত্রিকাগুলি তখনও অবাঙ্গালী ও বিলেতী সংবাদপত্রগুলির মত রসসংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেষণের যোগ্যতালাভ করতে পারে নি তাই পুরনো বিলেতী কাগজ

ঘেঁটে যা জানতে পেলাম, তাতে সেই আন্তর্জাতিক সুন্দরী-বিহঙ্গীকে নিয়ে আন্তর্জাতিক অভিজাতমহলে দু'বছরে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক রসাল ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

মুক্ত-বিহঙ্গী ঘোড়াওয়ালার কোল হতে উড়ে গিয়েছে সত্য, কিন্তু হিজহাইনেস মহারাজার হৃদয় পিঞ্জরে আর ফিরে আসে নি। তাকে বিহঙ্গী বলাই ভুল, সেটি হচ্ছে সুচতুরা আন্তর্জাতিক মধুকরী। অর্থসম্পদই তার আকাঙ্ক্ষিত মধু। এই রূপান্তর আমাদের মহান্তবাবার মন্ত্রপূত রুমাল প্রদর্শনের ফল কিনা, বলা কঠিন।

তিন সপ্তাহ দিল্লী থেকে, ভক্তমহলে কৃপা বিতরণ-মূল্য মোটা টাকা সংগ্রহ করে, ডেরা ভেঙ্গে, আমাদের ক্যারাভান চলল আজমীড়ের পথে।

রাজপুতনার মরুভূমি, গরমে দিনে পথ চলা যায় না। শেষ রাত্রে যাত্রা করে বেলা আটটার মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হয়। দিনে যেখানে ডেরা পড়ে, সেখানেই আশে পাশের গ্রামবাসীরা সাধুসেবার সমস্ত যোগায়। মহান্তমহারাজের ধনভাণ্ডার হ'তে একটি পয়সাও খরচ করতে হয় না। তবে রাজপুতনার গ্রামাঞ্চলে দেখলাম, প্রণামীর পরিমাণ বড় অল্প। গ্রামের অধিবাসী প্রায় সকলেই দরিদ্র কৃষক। মহাত্মার কৃপায় কোনো বড় রকমের সমস্যা মীমাংসার জন্য কেউ আসে না। প্রায় সকলেই ভগবানে মতি হওয়ার আশীর্বাদ চায়। এই তুচ্ছ প্রার্থনা শুনে বোধ হয় আমাদের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা অন্তরে কৌতুক অনুভব করেন।

আজমীড়ের কাছাকাছি পানিখোট এসে মরুভূমির বালুকাঝড়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ঝড় আসার পূর্বে তার ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম। বিটঠল দাস আশ্বাস দিয়ে বলল—কোনো ভয় নেই, মহান্তবাবা আমাদের কাছে ঝড় আসতে দেবেন না।

কার্যতও দেখলাম তাই। চারপাশে ঝড়ে বালি উড়ে সব ওলট পালট

হয়ে গেল, কিন্তু আমরা কেবল ঝড়ো বাতাস ভোগ করলাম, বালি উড়ে এসে চাপা দিল না।

আজমীড়ে দশদিন ছিলাম। এ সহরটা দিল্লী অপেক্ষাও ভাল ব্যবসার ক্ষেত্র। 'চুনোপুঁটি'র আমদানী নেই বললেই হয়, কেবল বড় বড় ঘোড়েলের দরবার। দেখে শুনে মনে হল, এহেন ব্যবসার চরমপর্যায় অবতারত্বে পেঁৗছানোর জন্য যদি দশ-বিশলাখ টাকা ব্যয় করতেই হয়, তবে নিশ্চয়ই কোনো পাকা ব্যবসাদার অপব্যয়ের অপবাদ দিতে পারেন না।

আজমীড় হতে ছয়দিন পথ চলে আমরা উপস্থিত হলাম জয়পুর। জয়পুর সহরের প্রধান প্রাচীরের বাইরে রেলস্টেশনে যাওয়ার বড় রাস্তার ধারে আমাদের ডেরা পড়ল। নিকটেই দেখলাম 'মাইজীকা ধরমশালা' নামে একটা বড় ধরমশালা। ম্যানেজার মহারাজের মুখে শুনলাম,— সাত বছর পূর্বে তাঁরা জয়পুব এসেছিলেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। জয়পুরের অধিবাসী ধনী দরিদ্র সকলেই নাকি বৈষ্ণব। সেইজন্য এই শ্রেণীর অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রতি তাঁদের বিশেষ আগ্রহ নেই। শুনে একটু বিস্মিত হলাম।

কার্যতও দেখলাম তাই। ত্ব'দিন চ'লে গেল, দর্শনার্থী কিছু কিছু আসে বটে, কৃপাপ্রার্থীর দেখা নেই। তৃতীয় দিন প্রাতে শুনলাম, আজ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত, মহান্তমহারাজ দর্শন দেবেন। শুনে বেশ কৌতুহল হল।

বেলা চারটের সময় ম্যানেজার এসে আমাকে বললেন—আজ মহান্ত মহারাজ সাক্ষাৎ ভগবান রূপে দর্শন দেবেন। আপনি ছ'টা হতে রাত দশটা পর্যন্ত মহাতমার পাশে থাকবেন, উঠবেন না, বা কোনো কথা বলবেন না। আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হবে। আশা করা যায়, খুব ভিড় হবে। সেজন্য আমরা সকলেই প্রস্তুত হচ্ছি, আপনিও প্রস্তুত হন।

ম্যানেজারের কথামত সাড়ে পাঁচটায় দরবারে গেলাম। সাজানো

গোছানোর মধ্যে কোনো নূতনত্ব দেখলাম না, কেবল আমার আসন খানা মহান্ত মহারাজের গদীর বাঁয়ে গদীর সমান উঁচু করে পাতা হয়েছে। দর্শনার্থী স্ত্রী পুরুষ ভেদে এক পথ দিয়ে দর্শন করে, আর একপথ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কাঠের বেড়া দিয়ে করা হয়েছে।

ছয়টায় দর্শন আরম্ভ হয়ে সন্ধ্যা সাতটার পর অত্যন্ত ভিড় হল। তিরিশ জন সন্ন্যাসী ভিড় সামলাতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠছে। লোক আসছে, দর্শন ক'রে প্রণামী দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রণামীর পরিমাণ সম্মুখের থালায যা পড়তে দেখলাম, তা আশাপ্রদ নয। আনিই বেশী, তামার পয়সাও আছে, সিকি কিছু পড়লেও একটা আস্ত টাকা পড়তে দেখলাম না। প্রায দেড়মাস হয়ে গেল এই সন্ন্যাসী দলে আছি, কিন্তু এরকম ব্যাপার কোথাও দেখেনি। সব জাযগাযই লক্ষ্য করেছি, নিতান্ত দরিদ্র দর্শনার্থীও অতি সঙ্কোচের সাথে একটা সিকি প্রণামী দিয়েছে।

বৈষ্ণব প্রধান জযপুরেব এই প্রণামীর ব্যাপার তখন না বুঝলেও পবে বুঝেছি। জয়পুর, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা কৃষ্ণভক্ত। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলেন, 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর', কাজেই কৃষ্ণ ভক্তেরা যত শস্তায় পারেন সাধুদর্শনের পুণ্য আর ভাগবত পাঠ ও কীর্তন শ্রবণের ভক্তি—কিনে থাকেন। নবদ্বীপেও দেখেছি, পাঠকেব সম্মুখের থালায় যদি একটা আধলা থাকে, তবে ভক্তেরা গোটা পযসাটা দেন না, আধলাটা তুলে নিয়ে পয়সাটা দেন। অবশ্য পাঠক বা কীর্তনিয়া যদি রূপে রমনীমোহন হন, অথবা পাঠক যদি ব্যাসাসনে ব'সে ভাল 'ক্যারিকেচার' করতে পারেন, আর কীর্তনিয়া যদি সার্কাসের ক্লাউনের মত নেচে কুঁদে হাব ভাব দেখাতে পারেন, তবে কিন্তু অন্যপ্রকার ব্যাপার ঘটে।

রাত্রি দশটায় দর্শন শেষ হল, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বাইরে এসে দেখি, তখনও বহু দর্শনার্থী হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। আমার তাঁবুতে এসে বসতেই বিটঠলদাস খাবার নিয়ে এল। খেতে খেতে

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি দেখার জন্যে আজ এত ভিড় হ'ল? ওখানে আমরা ছাড়া দেখার মত বিশেষ কিছু তো ছিল না!

বিটঠলদাস বিস্মিত হয়ে বলল—কেন, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেন নি? কিছু শোনেনও নি?

নাঃ। আমি তো কিছু বুঝলাম না। বিশেষ কিছু শুনিও নি।

আজ মহান্তবাবা কৃষ্ণ ভগবান রূপে আত্মপ্রকাশ করে সকলকে দর্শন দিলেন। জয়পুরে সকলেই কৃষ্ণভক্ত, তাই মহান্তবাবা তাঁর অলৌকিক শক্তি বলে, সর্বসমক্ষে নিজে ভগবান কৃষ্ণ ও আপনাকে রাধা রূপে দেখিয়েছেন। যারা দর্শন করতে এসেছে, তারা সকলেই আপনাদের দু'জনকে রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে দেখেছে। এই প্রকারে মহান্তবাবা শিব-দুর্গা, রাম-সীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ—অনেক কিছুই দেখিযে থাকেন। এই তাঁবুর ভিতরে বসে তিনি স্বর্গ, নরক, বৈকুণ্ঠও দেখিয়ে দিতে পারেন।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি আর যাই হই না কেন, এই ব্যবসাদার মহান্ত-কেষ্টবাবার রাধা হতে মোটেই প্রস্তুত নই। মুখে আর খাবার উঠল না, উঠে পড়লাম। হাত মুখ ধুয়ে গেলাম ম্যানেজার মহারাজের খোঁজে। শুনলাম তিনি মহান্ত মহারাজের তাঁবুতে আছেন। সে তাঁবুতে তখন প্রবেশাধিকার পেলাম না। প্রায় একঘণ্টা বাইরে অপেক্ষা করে দু'জনের সাক্ষাৎ পেলাম। একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই জানতে চাইলাম—এ ব্যাপারটা কি?

মহান্তমহারাজ হেসে বললেন—আরে বেটা, এ দুনিয়া মায়া হ্যায়। পরমাত্মা কা মায়া। এক মাত্র ব্রহ্ম সত্য, আর সব মিথ্যা—মায়া। ভগবান ব্রহ্ম তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জীব সেই মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ব্রহ্মে জগৎ দেখে। এটা ব্রহ্মের শক্তি মায়ার ভেল্কি ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবও সেই ব্রহ্ম। জীব মায়াবশ বলে দুঃখ পায়। সাধন করে জীবও ভগবান হতে পারে। যখন কোনো জীব সাধনবলে ব্রহ্ম-ভগবান হয়, তখন সেও মায়ার ভেল্কি দেখাতে পারে। আমি সাধন

বলে ব্রহ্ম হযে মাযার খেলা যখন দেখাতে পারি, তখন আমি কৃষ্ণ ভগবান হওয়ায় দোষ কি ? আমি তো ব্রহ্ম।

শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। মায়াবাদ ব্যাখ্যায় এমন সুন্দর প্রাঞ্জল অকাট্য যুক্তি, এমন তত্ত্ব ব্যাখ্যা, আজ পর্যন্ত আর কারও মুখে শুনি নি। এই মহান্তবাবার যাযাবর ক্যাম্পের মেম্বর হযে, এর পূর্বে পেয়েছি দিব্যদৃষ্টি, এবার পেলাম দিব্যজ্ঞান। বেদান্ত দর্শনেব মাযাবাদী ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর, আনন্দগিরি, মধুসূদন বাচস্পতি, প্রভৃতি মায়াবাদ-ধুরন্ধরগণ, যে মায়াতত্ত্ব বুঝাতে ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্য ব্যয় করেও ভালরকম বুঝাতে পারেন নি, সেই অদ্ভুত মায়াতত্ত্ব এই মহান্তমহাবাজ হাতে কলমে দেখিয়ে, তিন কথায বুঝিযে দিলেন। এব পরেও আচার্য শঙ্করের বাণী, "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, তদতিরিক্ত কিছু নহে"—এই পরম সত্য না বুঝার মত কোনও হেতুই থাকতে পারে না। অপব দিকে এতবড় মায়াবী মহান্তমহারাজ যে, অবতারত্বে প্রমোশন লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য, তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

ফিরে এলাম আমার তাঁবুতে। ক্যাম্পখাটে পাতা ইটালিয়ান রাগখানা ভাঁজ করে কাঁধে ফেললাম। যাযাবর ক্যাম্পে এসে একটা ছোট ঝোলা করেছিলাম, সেটায় দুখানা বহির্বাস আর একটা জামা ভ'রে কাঁধে ঝুলোলাম। বের হতে ফিবে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল নিদ্রিত বিটঠল দাসের মুখ খানা। ঘুমের ঘোরে বোধ হয় কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে ছেলেমানুষ কাঁদছে।

থমকে দাঁড়ালাম। মন বড় দমে গেল। সব হারিয়ে বড় আশায় মনপ্রাণ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। কাল যখন জানতে পারবে আমি নেই, তখন এর কি দশা হবে ?

পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে দাঁড়িয়ে একদিন আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। সে প্রার্থনা শ্রীজগন্নাথ শুনেছিলেন। সেই ভরসায় সেদিনও জয়পুরে বিটঠল দাসের মঙ্গলের জন্য শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীপাদ পদ্মে প্রার্থনা জানালাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে বিটঠল দাসের

জন্য দুশ্চিন্তা কেটে গেল। একটা দারুণ বন্ধন মুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

—o—

ব্রজের পথে

বেলা বারোটায় এসে নামলাম মথুরা জংসনে। বৃন্দাবনের গাড়ী ছাড়বে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। বৃন্দাবনের যাত্রি অনেকে টাঙ্গা ভাড়া ক'রে চলে গেল। এক জনের ভাড়া ছয় আনা। আমার সাথে সেই পয়সা ও আধলা কয়টা আছে। টাঙ্গায় উঠলে তার প্রায় সব ক'টাই খরচ হয়ে যায়। কাজেই টাঙ্গায় বৃন্দাবন যাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হ'ল। জল পিপাসা পেয়েছে। কলের জল খাওয়া গেল না। স্টেশনে পানিঘর আছে। সে পানিঘরের পানিতে চা ক'রে খাওয়া চললেও পিপাসার শীতল বারি সে নয়। শুনলাম বৃন্দাবন সাত মাইল। অনেক ভেবে চিন্তে রেল লাইন ধরে হাঁটা দিলাম।

বৈশাখ মাসের দুপুর। মাথায় পাগড়ি আছে, কিন্তু মুখ পুড়ে যাচ্ছে। আধঘণ্টা চলার পরই মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। অপরিচিত দেশ, অপরিচিত আবহাওয়া। পথের ধারে আশ্রয় পাওয়ার মত স্থান চোখে পড়ল না।

হঠাৎ কানে এল—স্বামীজী ঠারিয়ে। কৃপা ক'রকে ঠারিয়ে।

দাঁড়ালাম। এক হাত প্রস্থ এক টুকরো ছেঁড়া ময়লা বহির্বাস পরা, সারা গায় তিলক ছাপ, গলায় এক বোঝা ছোট বড় কাঠের মালা, বয়স ষাটের কোঠায় হবে, এক বাবাজী দৌড়ে এসে হাত জোড় ক'রে বললেন—মহারাজ, আবি বৃন্দাবনমে মৎ যাইয়ে। বহুৎ গরমী হুয়া থী। আপলোক কা অধম দাস মেরা মোকামপর আইয়ে। আপকো বহুৎ

পিয়াস ঔর ভুখ্ লাগা হ্যায়। আইয়ে মহারাজ, কৃপা করকে আইয়ে, দাসকা মোকামপর আইয়ে।

হিন্দী শুনেই বুঝলাম, লোকটা বাঙ্গালী। বহুদিন বাঙ্গালীর সাথে বাঙ্গলায় কথা বলিনি। মনে বেশ একটু আনন্দ হ'ল। চললাম বাবাজীর সাথে। মথুরার বিখ্যাত কংসের মাটির প্রাচীরে গর্ত ক'রে, তার সম্মুখে একখানা ছোট চালা লাগানো। হিন্দী ভাষায় মোকাম শব্দের অর্থ—গৃহস্থের বড় বাড়ী। বাবাজীর এই গর্ত যদি মোকাম হয়, তবে আশ্রম কুটির কেমন হবে তা যদিও ভাবার বিষয়, তথাপি সে সময় সে গবেষণা করার মত অবস্থা আমার ছিল না।

গর্তে ঢুকে বসে পড়লাম। চমৎকার শীতল জায়গা। বৈশাখী রোদে পোড়া গা জুড়িয়ে গেল। বাবাজী পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন। জল খেতে চাইলাম। নিষেধ ক'রে বললেন—এখনই জল খেলে সর্দিগর্মি হ'তে পারে।

আমি একটু সুস্থ হলে বললেন—মহারাজ, আমার আজ পরম সৌভাগ্য। আজ শ্রীরাধারাণী কৃপা ক'রে ভাল প্রসাদ এক ভক্তের হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। শ্রীপ্রসাদ আসার পর থেকেই পথের দিকে তাকিয়ে আছি আর ভাবছি, আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে যে, এই সুন্দর প্রসাদ দিয়ে কোনো সাধু অতিথির সেবা করতে পারব! আমার সে প্রার্থনা শ্রীরাধারাণী শুনে আপনাকে পাঠিয়েছেন। আজ আমার আনন্দের দিন।

শুনে মুগ্ধ হলাম। কথাগুলো বলার ভঙ্গীতে এমন একটা সরল আন্তরিক মাধুর্য প্রকাশ পেল, যা আমার পূর্বে অজ্ঞাত। বিশ্রাম ক'রে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। শালপাতা ভরা প্রসাদ। উৎকৃষ্ট ঘি-ভাত, পুরি, কচুরি, লাড্ডু, বরফি, রাব্ড়ি—অনেক কিছু। রাত্রে জয়পুরে খাওয়া হয়নি। খুব খিদে পেয়েছিল। পেটভ'রে খেয়ে চলেছি। দহিবড়া শেষ ক'রে যখন রাবড়ির দোনা ধরেছি, তখন খেয়াল হ'ল—আমিই তো সব খেলাম, বাবাজীর খাবার কই?

বাবাজীকে জিজ্ঞাসা ক'রতে তিনি উত্তর দিলেন—মহারাজ, এর জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। শ্রীরাধারাণী মথুরামাইদের ঘরে আমার মাধুকরীর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। আমি সন্ধ্যাবেলা তাঁদের দুয়োরে যাই।

আচ্ছা বাবাজী, আপনি বৃন্দাবনে বাস না ক'রে এখানে আছেন কেন?

বাবা, শ্রীবৃন্দাবনে স্থান পাওয়ার যোগ্য যে, এখনও হই নি। আপনি তো শ্রীকুঞ্জে যাচ্ছেন। আপনি আমার প্রতি কৃপা ক'রে, শ্রীরাধারাণীর আপন জন ব্রজবাসী ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীদের চরণে একটু প্রার্থনা জানাবেন—এ অধম আর কতকাল বাইরে প'ড়ে থাকবে।

বলতে বলতে বাবাজীর চোখ ছল ছল ক'রে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। আমি বৈষ্ণবীয় ভাবধারার কিছুই জানি নে, বুঝিও নে। তথাপি মনে হল, এ একটা অপূর্ব আনন্দময় ব্যাপার। এর মধ্যে কোনো মিথ্যে মায়া বা ব্যবসাদারীর স্থান নেই। গত রাত্রিতে মনের মধ্যে যে দারুণ ঝড় উঠেছে, এই বাবাজীর কথায় সে ঝড় দমকে দমকে থেমে যাচ্ছে।

খেয়ে, হাত মুখ ধুয়ে, বাবাজীর ছেঁড়া কম্বলের ওপরেই গড়িয়ে পড়লাম। রাত্রে আগরা এক্স্প্রেসে ভিড় ছিল। একটুও চোখের পাতা বোঁজা যায় নি। বাবাজী হাওয়া করতে আরম্ভ করলেন, আপত্তি করলাম না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখনও দেখি বাবাজী সমানে পাখা চালাচ্ছেন।

উঠে গর্তের বাইরে এসে দেখলাম বেলা প্রায় একঘণ্টা আছে! বাবাজীর নিকটে খাবার জল চাইলাম। বাবাজী ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, ভাল খাবার জল ঘরে নেই। যে জল আছে, তা দিয়ে আপনি হাত মুখ ধোন, আমি খাবার জল নিয়ে আসি। ভাল খাবার জল একটু দূর থেকে আনতে হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসব।

বাবাজী মেটে কলসী নিয়ে ছুটলেন। হঠাৎ মনে হল সদানন্দ অবধূত মহাশয়ের কথা। তিনি বলেছিলেন, বৃন্দাবনে যাওয়ার পূর্বে

আমার গেরুয়া লুঙ্গি পাঞ্জাবি ফেলে, বৈষ্ণব বেশ ধরতে। এইতো আমার সে বেশ পরিবর্তনের সুযোগ। কিন্তু পরব কি? বাবাজীর একখানা ময়লা বহির্বাস চালার গায়ে ঝুলছিল। সেটা প'রে বৈষ্ণবের বহির্বাসের অমর্যাদা করতে সাহস হল না। আমার মাথার পাগড়িটা ফিকে গেরুয়া, সেইটেব তিন হাত ছিঁড়ে নিয়ে বহির্বাস করলাম। বাবাজীর তিলকমাটি দিয়ে সর্বাঙ্গে লাগালাম তিলক, আর রাধাগোবিন্দ নামের ছাপ। ইটালীয়ান রাগ আব সমস্ত কাপড় জামা জুতো গর্তের এককোণে বেখে, তার ওপরে চাপালাম বাবাজীর পেতে শোয়া শুকনো ঘাস। কাঁধে তুলে নিলাম তাঁরই ছেঁড়া কম্বল। ট্যাকে থাকল সেই পয়সা আর আধলা ক'টা। জয় রাধাগোবিন্দ ব'লে বেরিয়ে পড়লাম ব্রজের পথে।

মনে সেই পূর্বের মত সাহস ফিরে এসেছে। শরীরে কোনো গ্লানি নেই। বৃন্দাবনে যেয়ে কি হবে, সে চিন্তাও নেই। বৃন্দাবন যেতে হবে, এই মাত্র জানি। মনে বেপরোয়া ভাব। কেবল একটা ভয় মাঝে মাঝে হচ্ছিল—ঐ বুঝি গর্তের বাবাজী আমার ছেড়ে আসা কাপড় কম্বল ঘাড়ে ক'রে, পিছনে ছুটে আসছে। 'মশানী' এসে রেল লাইন ছেড়ে নেমে পড়লাম বৃন্দাবনেব পাকা রাস্তায়। তারপর ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে ছুটলাম বৃন্দাবনের পথে।

জয়পুর রাজমন্দিরের নিকটে আসতেই সূর্য অস্ত গেলেন। আরও কিছু পথ এগিয়ে যেতেই তুই বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালেন। তুজনেরই বয়স যাটের ওপর, আট-ন' হাতী ধুতি ও চাদর পরা, গলায় মালা, হাতে মালার থলে। আমাকে থামিয়ে প্রশ্ন করলেন—যাওয়া হ'চ্ছে কোথায়?

প্রশ্নের ধরণ দেখে মন গরম হয়ে গেল। রূঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলাম—জানি নে।

আসা হচ্ছে কোথা থেকে?

জানি নে।

বাপধন, তুমি যে কিছুই জান না, তা তোমার পরনের বহির্বাস আর গায়ের তিলক ছাপ দেখেই বুঝতে পারছি। সম্মুখেই পুলিশ ফাঁড়ি। সেখানে তারা তোমাদের জন্যই ওৎপেতে ব'সে আছে। আর এগিয়ে যেয়ে তাদের আশ্রমের বাসিন্দা হ'য়ে দরকার নেই। আমাদের সাথে এস।

শুনে অবাক্ হলাম। মনের বিরক্তি সরে গেল। নির্বাক পুতুলের মত তাঁদের অনুসরণ করলাম।

রাস্তা ছেড়ে রেল লাইন পার হ'য়ে 'বাড়বানল কুণ্ডের' নিকটে ছ'খানা ছোট কুটির, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঠানে তুলসী বেদী। ছ'জনে তুলসী প্রণাম ক'রে আমাকেও প্রণাম করতে বললেন। আমি তাঁদের আদেশ পালন করে কুটিরের বারান্দায় বসলাম। তাঁরা হাত পা ধুয়ে, সন্ধ্যাবন্দনাদি আরম্ভ করলেন। নাম-কীর্ত্তন ও ভজন-গানে রাত্রি ন'টা বাজল। তারপর তিনজনে একত্রে প্রসাদ পেতে বসলাম। তাঁদের সেবিত গোপালজীর প্রসাদ—ঘি মাখা গরম রুটি, আচার আর দুধ। সাদাসিধে প্রসাদ, বেশ তৃপ্তির সাথেই খেলাম। প্রসাদ পাওয়ার পূর্বে আমাকে ছ'টো বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিলেন—প্রসাদের দোষ ধরা অপরাধ, আর প্রসাদ পেতে ব'সে ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কথা বলা উচিৎ নয়।

যতদিন বৃন্দাবনে ছিলাম নিযম ছ'টো মানতাম। পরে আর মানতে পারি নি, মানা সম্ভবও নয়। অনেক জায়গায়ই দেখেছি, বিশেষ ক'রে বাবোয়ারি পূজোয় প্রসাদ ব'লে যে সমস্ত বস্তু বিতরিত হয়, তার অনেক গুলোই মানুষের খাদ্য নয়। অন্ন বা খিঁচুড়ি প্রসাদ যদি হয়, তবে তা পঞ্চাশের ছুর্ভিক্ষে 'সুরাবর্দি ঘ্যাঁট'কেও প্রমোশন দেয়। অথচ নাম কিন্তু প্রসাদ—আরাধ্য দেবতার ভোগ !!

আমার আশ্রয় দাতা ছ'জনের পরিচয় পরে পেয়েছিলাম। একজন ব্রাহ্মণ, উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজন বৈদ্য, উপাধি সেনগুপ্ত। উভয়ই পূর্ববঙ্গ বাসী। কলকাতা এক কলেজে পড়ার সময়ে বন্ধুত্ব হয়। কর্ম-জীবনে ছ'জনেই বাংলার বাইরে পুলিশের উচ্চপদে চাকরি করেছেন।

দু'জনেরই স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। পেনশন পাওয়ার পর দুই বন্ধু পরামর্শ করে, উপযুক্ত পুত্রদের হাতে সংসার বুঝে দিয়ে, বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন। পেনসনের টাকা যা পান, তা থেকে নিজেদের খরচ বাদে অবশিষ্ট টাকা ব্রজবাসী দুঃস্থদের খোঁজ ক'রে দান করেন; সহর বৃন্দাবনে বড় হৈ চৈ হয় ব'লে বাড়বানাল কুণ্ডের নিকটে কুটির নির্মাণ ক'রে বাস করছেন। পূর্বে বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন, সেজন্য বৃন্দাবন-মথুরার পুলিশ মহল খুব খাতির করে।

আহারান্তে শয্যার ব্যবস্থা হল—একখানা কুশের মাদুর, কম্বল, মশারি। আমার শোবার ব্যবস্থা ক'রে দু'জনে এসে কাছে ব'সে প্রশ্ন করলেন—এইবার বল তো বাপধন, তোমার আসল পরিচয়টা কি? তোমার কোনো ভয় নেই, সব কথা খুলে বল।

তাঁদের প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে এবার আমার হাসি পেল। বললাম—আমি একজন বিপ্লবী ফেরারী। আমাদের দলীয় নিয়মানুযায়ী যা বলা নিষেধ, তা বাদ দিয়ে আর সমস্তই আপনাদের বলছি।

এই বলে শোনাবার মত যা কিছু সবই শুনালাম।

সমস্ত শুনে সেন মশাই প্রশ্ন করলেন—গোবর্ধনে চারজন কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজী আছেন। তাঁদের মধ্যে কার আশ্রয় গ্রহণ করবে, তা সঠিক কিছু জান কি?

কথাটা শুনে একটু বিব্রত হ'য়ে পড়লাম। সদানন্দ অবধূত মহাশয় কেবল নামটাই ব'লে দিয়েছেন; বিশেষ কোনো পরিচয় জানান নি। কাজেই এ বিষয়ে কিছু ব'লতে পারলাম না। তখন আমাদের মধ্যে পরামর্শ করা হল—আমার পক্ষে সঠিক না জেনে কোথাও কারও কাছে যাওয়া নিরাপদ নয়। সেনমশাই যেয়ে গোবর্ধনে খোঁজ করবেন—কোন কৃষ্ণচৈতন্যদাস সদানন্দ অবধূতের পরিচিত। হয়তো তাতে আট-দশদিন লাগবে। তা লাগুক, এসব ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হ'য়ে কাজ করাই ভাল। আপাতত আমার পক্ষে সহর বৃন্দাবনে বেড়াতে যাওয়াও ঠিক হবে না। কিছুদিন যাবৎ পাঞ্জাবে ও সংযুক্তপ্রদেশে

কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে। তাতে মথুরা ও বৃন্দাবনে বহু পুলিশ সি, আই, ডি, ঘোরাফেরা করছে। আমার প্রতি শ্রীরাধারাণী সদয়, তাই সহরে প্রবেশমুখেই তাঁদের দু'জনের চোখে পড়েছি।

পরদিন প্রভাতে উঠে নিত্যকর্মাদি শেষ ক'রে, দুই বৃদ্ধ গেলেন দর্শনে। আটটার পর যখন দুই বন্ধু ফিরে এলেন তখন দেখি, একজনের হাতে বাজার, আর একজনের হাতে, সেই মথুরায় বাবাজীর গর্তে লুকিয়ে রেখে আসা কাপড়ের পোঁটলা আর কম্বল।

আমাকে বললেন—বাপধন, বেশ ফ্যাসাদ বাধিয়েছ। শ্রীরাধারাণীর অশেষ করুণা তোমার ওপরে, তাই ফ্যাসাদ না পাকতেই আমরা যেয়ে পড়েছি। মথুরার ঐ বাবাজী পরম নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব। যদিও তিনি লেখাপড়া জানেন না, তথাপি তাঁর অপূর্ব দৈন্য, নির্লোভ ব্যবহার ও ভজননিষ্ঠার জন্য, ব্রজমণ্ডলের সকলেরই পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর ধারণা—তুমি একটি মহাপুরুষ। করুণাময় মহাপুরুষ, তাঁর উৎকৃষ্ট মূল্যবান পোষাক কম্বল গর্তে লুকিয়ে রেখে বাবাজীর ময়লা ছেঁড়া কম্বলখানা সম্বল করে চলে এসেছেন। বাবাজী মহাপুরুষের পিপাসার জল আনতে যেয়ে, দুর্ভাগ্যক্রমে জলের কলসী ভেঙ্গে যাওয়ায় বিলম্ব হয়। পিপাসার্ত মহাপুরুষ তাঁর পিপাসার জল পান না করেই ব্রজে চলে এসেছেন। বাবাজী গর্তে এসে সমস্ত বুঝে; তখনই সেই জলের কলসী কম্বল, আর কাপড়ের পোঁটলা ঘাড়ে ক'রে, কাঁদতে কাঁদতে বৃন্দাবনে এসে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের দুয়ারে ব'সে আছেন। যাকে দেখছেন, তাকেই সেই অপূর্বত্যাগী মহাপুরুষের কথা ব'লে, তাঁর খোঁজ করছেন। ব্যাপারটা তোমার পক্ষে বিপজ্জনক ভেবে, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে মথুরা পাঠিয়েছি। কিন্তু যতদিন তিনি মহাপুরুষকে জল খাওয়াতে না পারবেন, ততদিন মনে শান্তি পাবেন না। এখন থেকে তাঁর গর্তে সব সময়ের জন্য দু'কলসী ভাল জল রাখবেন। দু'তিন দিনের মধ্যে সুযোগমত আমরা একজন যেয়ে, বাবাজীর অলক্ষ্যে তাঁর জল খেয়ে, ছেঁড়া কম্বলখানা রেখে আসব। এ প্রবঞ্চনা করা ছাড়া রাধারাণী আর

তো কোনো উপায় দেখাচ্ছেন না। তোমাকে মথুরায় পাঠাতে সাহস হয় না।

শুনলাম, কিছু বললাম না। গত দিনের দুপুর থেকে যা দেখছি ও শুনছি, তার সাথে আমার পরিচয় নেই। মনে মনে স্থির করলাম, বৃন্দাবনে যতদিন থাকব, ততদিন কেবল ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে চলব। যে যা বলেন, তাই করতে চেষ্টা করব মাত্র। বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের জন্য আর কিছু করব না।

তৃতীয় দিন সেনমশাই গেলেন রাধাকুণ্ডে। পাঁচদিন পরে ফিরে এসে জানালেন--আমার আশ্রয় শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্যদাস বাবাজী 'পুছরীর পণ্ডিত বাবাজী' নামে বিখ্যাত। পুছরী জায়গাটা শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের দক্ষিণে গোবর্ধন পর্বতের শেষ প্রান্তে। সদানন্দ অবধূত অতি বিচক্ষণ। তিনি আমার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তিই নির্বাচন করেছেন।

শুনে আনন্দিত হলাম। আমার গেরুয়া কাপড় ও কম্বলের গতি কি হবে জানতে চাইলে, বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন—ওগুলো শ্রীগোবিন্দের পুরনো মন্দিরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পাঠ করেন, তাঁকে দিলেই হবে।

সেইদিনই অপরাহ্নে যখন দু'জনে সহরে গেলেন, তখন কাপড় কম্বল নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পূর্বে বাড়ুজ্যেমশাই মথুরার গর্তের বাবাজীর জল খেয়ে, তাঁর ছেঁড়াকম্বল রেখে এসেছেন।

মথুরা হয়ে গোবর্ধন পর্যন্ত টাঙ্গা চলে। ভাড়াও এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু সে পথে যাওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ হবে না মনে ক'রে, হাঁটাপথে গরুড়গোবিন্দ, বহুলা বন দিয়ে যাওয়াই স্থির হল। পথ প্রায় তিরিশ মাইল। এত পথ দুই বৃদ্ধের কারও পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয় ব'লে উপযুক্ত একজন সঙ্গী খুঁজতে আরও পাঁচদিন গেল। পাঁচদিনের চেষ্টায় ব্রজবিহারী দাস বাবাজী নামে এক পরিব্রাজক বৈষ্ণব সঙ্গী পাওয়া গেল।

ব্রজবিহারী দাস বাবাজীও বৃদ্ধ, তবে দেহখানা খুব শক্ত-সমর্থ। প্রায় বিশবছর যাবৎ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক জায়গায়

একবেলা বা একরাত্রির বেশী থাকেন না। কোনো বাজে কথা বা বৈষয়িক আলাপ করেন না। একখানা কম্বল আর একটা লাউয়ের খোল-জলপাত্র মাত্র সম্বল। কেউ কিছু দিলে প্রয়োজন থাকলে গ্রহণ করেন, নচেৎ নয়। টাকা পয়সা স্পর্শই করেন না। হাতে সব সময় জপের মালা। মালা জপ ক'রতে ক'রতে ঘুমান, জেগেই আবার জপ আরম্ভ করেন।

আমার জন্য সেনমশাই কিনে এনেছেন—তিনখানা সাদা বহির্বাস, একটা খদ্দরের বেনিয়ান, একখানা দেশী কম্বল ও মশারি। বাঁড়ুজ্যেমশাই এনে দিলেন, একটা পিতলের লোটা, আর ঐ দেশে ব্যবহারের যোগ্য কাপড়ের ও চামড়ার দুই জোড়া জুতো। নতুন মালা গলায় প'রলে সন্দেহ হ'তে পারে বলে, বাঁড়ুজ্যেমশাই তাঁর পুরনো মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে, নিজে নতুন মালা ধারণ করলেন। এ ক'দিনে তিলক কাটাও শিখে ফেলেছি। শেষ রাত্রে বিহারীদাস বাবাজীর সাথে যখন পথে বেরুলাম, তখন বেশভূষার দিক থেকে একেবারে খাঁটি বৈরাগী ব'নে গিয়েছি। অবশ্য একটা ত্রুটি থেকে গেল। সে ত্রুটি সংশোধনের উপায়ও নেই। কারণ বাজারে পছন্দমত ভাল ভাল জট কিনতে পাওয়া গেলেও টিকি কিনতে পাওয়া যায় না। যাত্রাদলের লাগানো টিকি, দেখলেই চেনা যায়।

শেষরাত্রে বৃন্দাবন ছেড়ে চললাম গোবর্ধনে। যে বেশ ধ'রে নবদ্বীপ থেকে বেরিয়েছিলাম, এবার তা নিঃশেষে মুছে গেল। টিকে থাকল সেই পয়সা আর আধলা ক'টা। সেনমশাই মাইল খানেক সাথে এসে, মাঝে মাঝে পুছরী যেয়ে আমার সংবাদ নেবেন ব'লে বিদায় নিয়ে গেলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, বেলা ন'টার পর আর পথ চলা যাবে না। জোর পায়ে হেঁটে চললাম।

গরুড়গোবিন্দ এসে রাত্রি প্রভাত হল। শ্রীমন্দিরে মঙ্গল আরতি দর্শন করলাম। আরতির সময় বিহারীদাস বাবাজী কীর্তন গেয়ে অপূর্ব ভঙ্গী ক'রে নৃত্য করলেন। আরতি শেষ হলে, সেবাইত ও উপস্থিত

গ্রামবাসীরা আমাদের সেদিন থেকে প্রসাদ গ্রহণের অনুরোধ করলেন। বাবাজী রাজি হলেন না। কিন্তু প্রসাদ না নিযে বৈষ্ণব গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন, তা হতে পারে না। প্রসাদ এল,—টাটকা কাঁচা দুধ, মাখন মিছরি, ক্ষীরের লাড়ু।

বাবাজী প্রসাদ নিলেন কাঁচা দুধ। আমি আধপোযা মাখন-মিছরি আর পোয়া দেড়েক ক্ষীর গিলে ফেললাম। আরও প্রায আধসের ক্ষীরেব লাড়ু পড়ে থাকল। একবার মনে ভাবলাম, লাড়ুগুলো বহির্বাসে বেঁধে নিয়ে যাই দুপুরে কাজে লাগবে। অযাচক বাবাজী সাথে থাকায় সাহস পেলাম না।

বহুলাবন যখন এলাম, তখন বেলা সাতটা হবে। জৈষ্ঠমাস, বেলা সাতটায়ই বেশ গরম পড়েছে। বহুলাবনেব কুণ্ডে স্নান ক'রে বাবাজী তাঁর নিত্যকর্ম আরম্ভ করলেন। আমিও স্নান ক'রে আচ্ছারকম তিলক লাগিযে, বসে গেলাম চোখ বুঁজে সন্ধ্যা আহ্নিক করতে। বক্‌সা ক্যাম্পে কালীশঙ্কর দাদা বৈদিক সন্ধ্যাটা শিখিযেছিলেন। তাঁর সঙ্গছাড়া হওযার পর মাঝে মাঝে সেটা করতাম। আবার সেটা আরম্ভ করলাম, বহুলাবনে কুণ্ডের ঘাটে বিহারীদাস বাবাজীর পাশে ব'সে। সেই যে আরম্ভ কবেছিলাম, তারপর আজ পর্যন্তও গাযত্রী অন্তত কোনো দিন বাদ পড়ে নি। এটা বোধ হয় ঐ অযাচক নেংটে বাবাজীর কাছে ব'সে একদিন সন্ধ্যা আহ্নিকের ভণ্ডামী করার ফল।

সন্ধ্যা পূজো সেরে উঠে দেখি, কয়েকজন গ্রামবাসী ঘাটের ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমবা উঠে আসতেই দণ্ডবৎ জানিয়ে দুপুরে আতিথ্যের নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা অস্বীকৃত হলাম। তাতেও রেহাই নেই। কিছু না খেয়ে যাওয়া চলবে না।

এসে গেল দই ঘোল ছাতু গুড়। বাবাজী কিছু ঘোল খেলেন। আমি সেরখানেক দই খেয়ে ঘোল খেতে যেয়ে দেখি, ঠকে গিয়েছি। স্বাদে দই অপেক্ষা ঘোল অনেক ভাল। ছাতু গুড় একটু জিভেয়

ছুঁইয়ে গ্রামবাসীর আতিথ্যের সম্মান রক্ষা ক'রে আবার পথ ধরলাম।

ভাল পথ গ্রামের ভিতর দিয়ে। সম্মুখে কোনো গ্রাম পড়লেই বাবাজী পথ ছেড়ে মাঠে নামেন, গ্রাম ঘুরে আবার পথে ওঠেন। দু'তিন খানা গ্রাম এইভাবে পার হয়ে বাবাজীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। বাবাজী বললেন—এই সব গ্রামের অধিবাসী বেশীর ভাগই শ্রীরাধারাণীর স্বজাতি। ওরা অতিথি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব দেখলে, না খাইয়ে গ্রাম থেকে যেতে দেবে না। কাঁহাতক এত খাওয়া যায়? এই উপদ্রবের ভয়ে গ্রামের বা'র দিয়ে পালাতে হচ্ছে।

বাবাজীর কথা শুনে সদানন্দ অবধূত মহাশয়ের কথা মনে হল। তিনি একদিন বলেছিলেন—যদি কেউ সত্যই ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হন, তবে তাঁর মাথা গোঁজার স্থান, পরিধেয় বস্ত্র ও উদরান্নের জন্য ভিক্ষে, চাঁদা বা প্রণামী আদায়, গুরুগিরি বা ধর্মপ্রচারের ব্যবসা,—কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ভারতে এখনও এতবড় দুর্ভাগ্য দেখা দেয় নি।' ব্রজের পথে কথাটা ভাল ক'রে বুঝলাম।

যখীনগাঁও এসে বেলা প্রায় এগারটার কাছাকাছি হল। ভয়ানক রোদ্। মাথা বাঁচানোর জন্য পাগড়ি বেঁধেছি, গায় চাপিয়েছি কম্বল। বাবাজী তাঁর কাঁথায় ঢেকেছেন আপাদ মস্তক। এদেশের গরমে বাংলার মত ঘাম ছোটে না। যখীনগাঁয় এসে বাবাজী আর মাঠে নামলেন না, গ্রামের প্রবেশ মুখে প্রথম বাড়ীখানার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়লেন—জয় রাধারাণী।

সাথে সাথে তিনখানা বাড়ী অন্তর এক বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক বুকপর্যন্ত ঘোমটা টানা ব্রজমাই, ডান কোলে বছর খানেক বয়সের একটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর ছেলে। ঘোমটা উঁচু করে একটু দেখে নিয়ে, অপূর্ব ভঙ্গীতে হাত তুলে ইসারায় আমাদের ডাকলেন।

আমরা যাওয়ার জন্য কেবল পা বাড়িয়েছি, এমন সময় এ বাড়ীর দরজা খুলে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। ওদিকেও এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসেছেন। লেগে গেল দুই বৃদ্ধায় ঝগড়া,—সাধু বৈষ্ণব গ্রামে এলে বড়লোকেরাই সেবা করেন, গরিবের ভাগ্যে হয় না। যদি বা ভাগ্যক্রমে দু'টি বৈষ্ণব দুয়োরে এসেছেন, তাও বড়লোকের বেটাবৌ ভাগিয়ে নিচ্ছে। এ বড় অন্যায় কাজ।

শেষ পর্যন্ত বাবাজীই মীমাংসা করলেন। বাবাজী থাকলেন গরিবের বাড়ী, আমি গেলাম বড়লোকের বেটারবৌএর বাড়ী।

গ্রামে সকলেরই চালে চালে বসতি। বাইরে থেকে ধনী দরিদ্র বুঝা যায় না। বাড়ীর ভিতরে যেয়েও কিছু বুঝতে পারলাম না। মেটেঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে বসলাম। ঘরে বিশেষ কোনো আসবাবপত্র নেই। মেটে দেওয়ালঘর। ছাদে বাঁশের মত লম্বা কাঠ সাজিয়ে, তার ওপরে মাটি ঢেলে পেটানো। ছাদে কোনো চালা নেই। এ দেশে বৃষ্টি খুব কম হয় ব'লে, এ রকম ছাদে অসুবিধে হয়না। ছাদের মাটি বেশ পুরু থাকায়, গরমে ঘর ঠাণ্ডা হয়, শীতে হয় গরম। বাড়ীর পুরুষেরা সকলেই দূর-দূরান্তরের মাঠে কৃষিকার্যে গিয়েছেন, আসবেন সন্ধ্যায়। দেশের বেশীর ভাগ জমিই কৃষির অযোগ্য। স্থানে স্থানে দশ-বিশ বিঘে জমি চাষের উপযুক্ত পাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে হাত পা ধুয়ে খেতে বসলাম। এদেশের জল খুব ভাল, সকালে যে ক্ষীর মাখন দই ঘোল খেয়েছিলাম, তা হজম হয়ে বেশ খিদে লেগেছে। খাবার এল—রুটি, রহরের ছাতুর ডাল, আচার, দহিবড়া, ঘোল আর আধপোয়া মত ঘি। জল হজমী হলেও ডাল সিদ্ধ হয় না। সেজন্য ডাল জাঁতায় পেষাই ক'রে সেই ছাতু রান্না হয়। গ্রীষ্মের তিন মাস শাক-তরকারি একেবারেই অমিল।

আমি মাথা নীচু ক'রে খেয়ে যাচ্ছি। বউটি সামনে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় শাশুড়ী ব'লে দিয়েছেন, আমার আর কিছু লাগবে কিনা, দেখতে।

হঠাৎ শুনলাম—ভাইয়া, তুমি বৈরাগী হলে কেন? তুমি তো আসল বাবাজী নও।

মুখ তুলে দেখি বউটির মুখে ঘোমটা নেই, বিশ-বাইশ বছর বয়স, বড় বড় টানা চোখে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

এ প্রশ্নের আমি কি উত্তর দেব? মুখ নীচু করে খেতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলল—ভাইয়া, ঘরমে যাও, তোমার বহু কাঁদছে। তাকে দুঃখ দিও না।

এবার যেন গলাটা বড় ভার ঠেকল। আবার মাথা তুলে তাকালাম। দেখলাম একটা অপূর্ব সমবেদনা ভরা ছল ছল দুটো চোখ। আশ্চর্য এরা !!

খাওয়া শেষ ক'রে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্রি তিনটেয় হাঁটা দিয়ে প্রায় বিশ-বাইশ মাইল রাস্তা এসেছি। ঠাণ্ডা ঘর, দরজা বন্ধ করতেই বেশ অন্ধকার হল। এক ঘুমেই বেলা চারটে। উঠে খোঁজ নিয়ে জানলাম বাবাজী প্রস্তুত হচ্ছেন, আমিও প্রস্তুত হলাম। আমার ঘোমটা টানা নতুন বহিন এক বাটি ঘন দুধ, আর সর নিয়ে এল।

আমি যখন খাচ্ছি তখন বোনটি বলল—ভাইয়া, আমার কথা রাখবে তো? তোমাকে কিন্তু ঘরে ফিরতে হবে।

এবার আমি কথা বললাম—বহিন, তোমার কথা আমি রাখব। তোমাকে মিথ্যে কথা বলব না, আমার বাড়ীতে মা বউ ছেলে—সবই আছে। আমি নিতান্ত প্রয়োজনে এই বেশ ধরেছি। প্রয়োজন শেষ হলেই এ বেশ ছেড়ে ঘরে যাব। তোমাকে কথা দিচ্ছি, যখন বাড়ী যাব, তখন তোমার সাথে দেখা করে জানিয়ে যাব। তুমি সত্যই আমার বহিন।

কথাগুলি একনিশ্বাসে বলে যখন মুখ তুলে তাকালাম, তখন বহিনের মুখের ঘোমটা সম্পূর্ণ সরে গিয়েছে। সে মুখে-চোখে যা

দেখলাম, তা চোখওয়ালা মানুষের ভাগ্যে কদাচিৎ দেখার সৌভাগ্য হয়।

পুরীর সমুদ্রতীরে সেই শিক্ষিতা মেয়েটিতে দেখেছিলাম, দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মত্যাগের ব্যাকুল সৌন্দর্য। আদরার বোনটিতে দেখেছি, প্রিয়জনের বিপদাশঙ্কায় আকুল সৌন্দর্য। দিল্লীর পথে গাড়ীর মধ্যে দেখেছি. অবাধ্য ক্ষুধার্ত পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষিনী মাতৃত্বের গম্ভীর সৌন্দর্য। এই গ্রাম্য গোয়ালা বহিনটির মুখে-চোখে দেখলাম বিজয়িনীর সৌন্দর্য।

স্বর্গ কেমন, আর সে জায়গার অধিবাসীদের মুখমণ্ডল কি রকম আনন্দোজ্জ্বল, তা যদি দেখতে পেতাম, তবে এ মুখচ্ছবির সাথে মিলিয়ে দেখতাম—কে বেশী আকর্ষণ করে, কে বেশী সুন্দর।

কতটুকুই না পরিচয়! আমিও বহিনটির নাম জিজ্ঞাসা করি নি, বহিনটিও আমার নাম জানে না। জিজ্ঞাসা করারও কোনো প্রয়োজন করে না। ভাইয়া আর বহিনই পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

রাস্তায় বাবাজীর 'জয় রাধারাণী' হাঁক শোনা গেল। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কম্বল কাঁধে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা যেয়ে পথের বাঁকের কাছে ফিরে দেখলাম, বহিন বাড়ীর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মুখের ওপরে ঘোমটা নেই।

পণ্ডিত বাবাজী মহারাজের আশ্রয়ে

(১)

যমুনাওত যখন এলাম তখন সূর্য ডুবে গেছেন। সন্ধ্যাদেবী এসে পৃথিবীদেবীকে পরাচ্ছেন ধূপছায়া-শাড়ী, রাত্রিদেবী পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণপক্ষের কালো শাড়ী হাতে। যে প্রকৃত সুন্দরী, তার সব শাড়ীই মানায়। কাপড়ের দোকানে যেয়ে শাড়ী বেছে, দোকান উজাড় ক'রতেও হয় না, দামের বিচারও প্রয়োজন করে না।

পথে যা দেখছি, সবই সুন্দর লাগছে। গোবিন্দকুণ্ডে পৌঁছুতে রাত ঘোর হয়ে গেল। বাবাজী কুণ্ডে নেমে স্নান করলেন, আমাকে স্নান করতে দিলেন না; নতুন জায়গা, নতুন জল, তাতে রাত্রি। কুণ্ড পরিক্রমা করে কুণ্ডবাসী বৈষ্ণবদের কুটিরে ঠাকুর দর্শন করলাম। সব কুটিরেই আরতি ও ভজন গান হচ্ছে। ছোট ছোট কুটিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো ঠাকুর। সেবা করেন যাঁরা, তাঁরা মাধুকরী সম্বল ত্যাগীবৈষ্ণব। আরতি যা হচ্ছে তা দেখলেই বুঝা যায়, লোক দেখানো আরতি নয়। যে সেবক আরতি করছেন, তাঁর মন থেকে বিশ্বসংসার সরে যেয়ে, জেগে রয়েছেন মাত্র সম্মুখের দেবতা। যাঁরা ভজনকীর্তন গাইছেন, তাঁদেরও ঐ একই অবস্থা; কে এল, কে গেল, তার দিকে লক্ষ্য নেই। সর্বত্রই একটা অপূর্ব শান্ত পবিত্র তন্ময় পরিবেশ।

গোবিন্দকুণ্ড দর্শন ক'রে পুছরীর পথ ধরলাম। আরতির বাজনা ও কীর্তনধ্বনি শুনতে শুনতে আরও মাইলখানেক যেয়ে, শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্যদাস বাবাজীর আশ্রম। রাস্তার পশ্চিমে গোবর্ধন পর্বত। পূবে প্রায় পোয়া মাইল দূরে অনেকগুলো বড় বড় গাছের তলায় ছয়খানা ছোট ছোট কুটির—আশ্রম।

আমরা যখন আশ্রমে পৌঁছলাম, তখন আরতি শেষ হয়ে কীর্তন চলছে। প্রাঙ্গনে আটজন বৈষ্ণব ও পাঁচজন গৃহী-গোপ কীর্তন করছেন।

গোপ পাঁচজন ঐদেশীয়। আমরা দণ্ডবৎ করে পিছনে বসলাম, কেউই আমাদের লক্ষ্য করলেন না। আমার সাথের বাবাজী কীর্তনে যোগ দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ধ্বনি দিয়ে কীর্তন শেষ হল। সকলেই মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রণাম ক'বে স্থিব হয়ে প্রায় পাঁচ মিনিট একদৃষ্টে শ্রীবিগ্রহ দর্শন ক'বে, আবাব প্রণাম করলেন। তারপর পরস্পর কোলাকুলি ও প্রণাম কবা হল। গোপ ক'জন প্রাঙ্গনে গড়াগড়ি দিলেন। বিহাবীদাস বাবাজীও সকলেব সাথে কোলাকুলি করলেন। দেখলাম বাবাজী সকলেরই সুপবিচিত। বুঝলাম সকলেই তাঁকে পেয়ে আনন্দিত হ'যেছেন। তাবপর জয বাধারাণী, জয় গিরিধারীলাল— বলতে বলতে যাব যার গন্তব্যস্থানে সকলে চলে গেলেন, থাকলেন কেবল পণ্ডিত মহারাজ।

এইবার বিহারীদাস বাবাজী আমাকে পণ্ডিতবাবাজীর সাথে পরিচিত করলেন। কথায বুঝলাম, সেনমশাই পূর্বেই সব ব'লে গিয়েছেন। আমি প্রণাম ক'বে দাঁড়াতেই বাবাজীমহাবাজ আমার মাথায় হাত দিয়ে হাসিমুখে বললেন—তুমিতো দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ! তোমার বয়স কত?

আমি বললাম—এই সাতাশে প'ড়েছি।

বল কি? আমি তো মনে করেছি কুড়ি-একুশ! তা বেশ, তোমার কোনো চিন্তা নেই। তুমি আমার ছাত্র হয়ে এখানে থেকে পড়াশুনা ক'রবে। শ্রীরাধাগিরিধারীলাল তোমাকে রক্ষা করবেন।

কথাগুলি শুনে আমার মত লোকেরও চোখে জল এসে গেল। মনে মনে সদানন্দ অবধূত মহাশয়কে প্রণাম করলাম।

রাত্রের ভোগ লাগল। ভোগ শেষে আমরা তিনজনে প্রসাদ পেলাম। প্রসাদ—দুধ ক্ষীর পুরি আর রুটি। ক্ষীর আর পুরি সবটাই আমি পেলাম। বাবাজী মহারাজ দু'জনে দুধ ও রুটি গ্রহণ করলেন। রাত্রে আর কোনো কথা হল না। ছোট এক কুটিরে আমি একাই শুলাম।

(২)

পুছরীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ তৎকালে ছোট পণ্ডিত বাবাজী নামে ব্রজমণ্ডলে পরিচিত ছিলেন। বড় পণ্ডিত বাবাজীমহারাজ থাকেন সহরবৃন্দাবনের উপকণ্ঠে দাউজীর বাগানে। এই সমস্ত বৈষ্ণব মহাতমাদের চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা যায় না। তথাপিও মনে হল—বাবাজী মহাবাজ ষাট পার হয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ। জন্মস্থান বোধ হয় যশোর জিলায়, কথায় বেশ যশুরে টান আছে। মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বর্হিবাস। সহরবৃন্দাবন ছাড়া ব্রজমণ্ডলে যে সমস্ত ভজননিষ্ঠ ত্যাগী বৈষ্ণব-মহাতমা দেখেছি, তাঁদের তুলনায় এঁর আচার ব্যবহার একটু স্বতন্ত্র। অন্যান্য ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণব পূজা জপ কীর্তন স্মরণ মনন নিয়েই থাকেন। ইনি শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের সেবা কীর্তন ও শাস্ত্র-চর্চায়ই বেশী সময় কাটান। বেলা সাড়ে এগারোটা হতে তিনটে পযন্ত আশ্রমে থাকেন না। ঐ সময়ে গোবর্ধনের কোনো নির্জন স্থানে যেয়ে ধ্যান-ধারনা করেন। ত্যাগী বৈষ্ণবগণ নিজ দেহ ও দৈহিক ব্যাপারে উদাসীন, পণ্ডিত বাবাজী সে প্রকার নন।

এই সমস্ত ত্যাগী বৈষ্ণবদের সেবিত শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য বড় বড় ধনী, রাজা, জমিদার—দাতারাই সমস্ত ব্যয় বহন করেন। বাবাজীরা কোনো দাতার দুয়োরে প্রার্থী হওয়া তো দূরের কথা, কারও নিকটে হাত পেতে কোনও দান গ্রহণ করেন না। দাতারা স্থানীয় মুদী ও গোয়ালাদের সাথে বন্দবস্ত ক'রে শ্রীবিগ্রহ সেবার চাল ডাল আটা ঘি দুধ ক্ষীর সর মাখন প্রভৃতি যা কিছু প্রয়োজন, সব আশ্রম কুটিরে সময় মত পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। অতিথি-অভ্যাগত সমাগমে ও উৎসবাদিতে যা লাগে, তাও দাতারাই দিয়ে থাকেন।

বাবাজীরা শ্রীবিগ্রহের সেবায় লাগান রাজভোগ। সে ভোগের প্রসাদ অতিথি-অভ্যাগত উপস্থিত থাকলে তাঁরা পান, নচেৎ গ্রামের গৃহস্থদের ছেলে-মেয়েরা লুট করে খায়। প্রসাদ বিলিয়ে দিয়ে বাবাজী যান মাধুকরীতে।

ব্রজমণ্ডলে ত্যাগী-বৈষ্ণবদের ভিক্ষা ও মাধুকরী এই দু'প্রকারই চলে। যাঁরা ভিক্ষা করেন, তাঁরা ধনীর দান—মুদী-গোয়ালার জোগান গ্রহণে সম্মত হন না। ভিক্ষায় যা প্রাপ্তি হয়, তাই ঠাকুরের ভোগ দিয়ে প্রসাদ পান। ভিক্ষায় আটা গুড় দই ঘোল কিছু কিছু শাক-সব্জিও পাওয়া যায়।

যাঁরা মাধুকরী করেন, তাঁরা বেলা এগারটার পর একটার মধ্যে, অথবা সন্ধ্যার পূর্বে যান ব্রজবাসী গৃহস্থের দুয়োরে। গৃহস্থ ব্রজমাইরা দিনের রান্না শেষ করে অবস্থানুযায়ী দু'একখানা রুটি, শাক, আচার, গুড়, দই পৃথক করে তুলে রাখেন—মাধুকরী দেওয়ার জন্য। বৈষ্ণব এসে বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে 'জয় রাধারাণী' বলে হাঁক দিলে ব্রজমাই সেই পৃথক রুটি হতে একটুকরো ছিঁড়ে, তার সাথে আর যা কিছু থাকে তাই হাতে দেন। বৈষ্ণব বাবাজী সেখানে দাঁড়িয়েই সেটুকু খেয়ে আবার অন্য বাড়ী যান।

ব্রজমণ্ডলে সহর-বৃন্দাবন ছাড়া আর কোথাও বোষ্টমীওয়ালা বাবাজী দেখা যায় না। যোগেযাগে যা দু'চার জোড়া আসে, তারা কোথাও পাত্তা পায় না।

পণ্ডিত বাবাজী মহারাজ মাধুকরী বা ভিক্ষা করেন না! শ্রীরাধা-গিরিধারী-লালের সেবার জন্য মুদী ও গোয়ালা যোগানদার আছে, তারাই সব দিয়ে যায়। দুপুরে ও রাত্রে ভোগ রান্না হয়। সে ভোগে নানা-রকমের উৎকৃষ্ট দ্রব্য থাকলেও বাবাজী মহারাজ ভাত ডাল তরকারি রুটি দুধ ঘোল দই—এরই মধ্যে তার গ্রহণীয় প্রসাদ সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছেন।

(৩)

প্রথম দিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গল। ঘুম ভেঙ্গেই কানে এল, বাবাজীমহারাজ বীণা বাজিয়ে অপূর্ব সুরে গাইছেন—

'জাগহুঁ বৃষভানুনন্দিনী, মোহন যুবরাজে।'

গানটা আমার পরিচিত। নবদ্বীপে কুঞ্জভঙ্গ-কীর্তনে বহুবার এ গান শুনেছি। গান ও সুরের ধাঁচ এক হলেও বুঝলাম, এ গান আর নবদ্বীপের কীর্তনিয়াদের গান এক নয়। নবদ্বীপের ব্যবসাদার কীর্তনিয়ারা

গায়—সমবেত শ্রোতাদের শুনিয়ে বাহাদুরী নেবার জন্যে। ইনি গাচ্ছেন তাঁর বৃষভানু রাজনন্দিনী আর মোহন যুবরাজের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য।

বৃষভানু রাজনন্দিনী সখীদের সহায়তায় রাত্রে কুঞ্জে এসে, তাঁর প্রাণবল্লভ মোহন যুবরাজের সাথে সুখ নিদ্রায় নিদ্রিত। রাত্রি শেষ হয়ে গেছে। প্রভাতে লোক পথে বেরনোর আগে অভিসারিকাকে গৃহে নিয়ে যেতে হবে। সখীগণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মোহন যুবরাজের লীলামুগ্ধা শ্রীরাধা নিশ্চিন্তে পরমসুখে ঘুমাচ্ছেন। সে সুখনিদ্রা ভাঙ্গতে সখীগণ অন্তরে ব্যথা পাচ্ছেন। সে ব্যথা রসবোধহীন বালক অরুণদেব বোঝেন না। তাই—

অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদ বদন
চমকি চুম্বি চঞ্চরীপদ নিমিখ সদন সাজে।

অন্যান্য রাত্রেব মত আজও অককণ বালক অরুণ উদয় হ'তে চলেছেন। অরুণোদয়ে কেবলমাত্র শ্রীরাধার সুখনিদ্রা ভঙ্গ ক'রে সখীদের অন্তরে ব্যথাই দেবে না, অপব দিকে অরুণেব আবির্ভাবে সরোবরের শত শত প্রফুল্ল কুমুদিনীর মুখও ম্লান হযে ক্রমে মুদিত হতে চলেছে। কুমুদিনী-বন্ধু মত্ত-ভ্রমর ব্যাপার দেখে চমকিত ও দিশেহারা হ'যে পড়েছে। নিরুপায় সখীগণ অন্তরের ব্যথা জানিয়ে যুগলের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য আবার গাইছেন—

কি জানি সজনী রজনী থোর, ঘুঘু ঘোষত ঘনহি ঘোর
গত যামিনী জিত দামিনী কামিনী কুল লাজে॥

হে সখী রাধে, রাত্রি এত ছোট হল কি ক'রে তা বুঝি নে! পূব আকাশে যে ঈষৎ আলোক ছটা দেখা যাচ্ছে, ওটা বিদ্যুতের ঝলক নয়, ওটা অরুণোদয়ই। ঐ শোন ভয়ানক ঘুঘুপাখিগুলো ভীষণ চিৎকার করছে, অতএব রাত্রি আর নেই। হে সখী, এখন জাগ। তোমার মোহনকে জাগাও। নচেৎ তোমার সখী আমরা, আমাদের নিদারুণ লজ্জায় ফেলবে। ঐ শোন,—

ফুকরত হত শুক কোক জাগই অব সবহুঁ লোক
শুক শারীক পীক কাকুলি নিধুবন ভরি গাজে॥

হতভাগা শুক ও ময়ূরগুলো চিৎকার করছে। সমস্ত শুক শারী কোকিলের কলরবে নিধুবন মুখরিত হয়ে উঠেছে। এখনই সমস্ত লোক জেগে যাবে। হে সখী, জাগ, তোমার মোহন যুবরাজকে জাগাও। আমাদের মান লজ্জা রেখে, সময় থাকতে ঘরে চল।

শুয়ে শুয়ে শুনছি অপূর্ব ঘুমভাঙ্গানি গান। গানের সাথে অতি কোমল সুরে বেজে চলেছে বীণা। যেমন গান, তেমনি বীণা, তেমনি ভাব মাধুর্য। এ তিনের এই অপূর্ব মিলন বোধ হয় এ প্রকার পরিবেশ ছাড়া সম্ভব নয়। শ্রীবৃন্দাবনে, এই প্রকার স্থানে, এই রকম ভজন নিষ্ঠ বৈষ্ণব মহাত্মার মুখে এ গান না শুনলে, এর মাধুর্য বোধহয় বুঝা যাবে না।

উঠে হাত মুখ ধুয়ে মন্দিরে প্রণাম ক'রে সম্মুখেই বসলাম। মন্দির ছয় হাত দৈর্ঘ্য, চার হাত প্রস্থ একখানা চালাঘর। ছোট্ট চতুর্দোলে শ্রীরাধা-গিরিধারীলাল রয়েছেন। সুন্দর সাজানো গুছানো ঠাকুর।

পণ্ডিত মহারাজ সেবা করছেন। সে সেবার পারিপাট্য না দেখলে ধারণা করা যায় না। কত সন্তর্পণে, কত আদর ক'রে সেবা। স্নান বস্ত্রালঙ্কার পরিধান প্রভৃতি সেবা হচ্ছে। তারপর আরম্ভ হল পূজা। সে পূজায় আড়ম্বর নেই, আছে আর্তি।

শুনলাম বিহারীদাস বাবাজীমহারাজ শেষ রাত্রেই চলে গিয়েছেন। এক বৃদ্ধা ঝাঁকায় ক'রে মাখন, ক্ষীর, দই, ঘোল নিয়ে এসে উঠানে ব'সে পূজা দেখছেন, মাঝে মাঝে আমার দিকেও তাকাচ্ছেন। আমি সাহস ক'রে ভোগের জিনিস তুলতে পারলাম না। পণ্ডিত মহারাজ পূজা সেরে সব তুললেন। তখনকার মত মাখন মিছরি আর ক্ষীর ভোগ লাগল। ভোগান্তে আরতির সময় কাঁসর বাজালাম। কাঁসর-ঘণ্টার বাজনা শুনে অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ছুটে এল। আরতির পর পণ্ডিত মহারাজ বাল্যভোগের প্রসাদ প্রায় একপোয়া মাখন আর একসের ক্ষীর ছেলেমেয়েদের ভাগ করে দিলেন। তারা মহানন্দে খেয়ে, হাত চাটতে

চাটতে আবার যেখানে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, সেখানে ছুটল। বুঝলাম— এরা সকালবেলাটা এই আনন্দ করেই বেড়ায়। ছেলেমেয়েগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের। স্থানীয় অধিবাসীদের বেশীর ভাগই জাতিতে গোপ। এই সব ছেলেমেয়েদের বাপ-মা বাবাজী মহারাজদের জোগানদার।

বাবাজীমহারাজের সেবায় যে বৃদ্ধা দই দুধ এনেছেন, তিনি ঝাঁকা নিয়ে উঠানে ব'সে আছেন দেখে, মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন,—

রতিয়ার মা, বসে আছ কেন?

মহারাজ, এ ছেলেটি কে?

এটি গত রাত্রে এসেছে। এখানেই থেকে আমার কাছে পড়বে।

মহারাজ, ছেলেটি দেখতে আমার বদলুবামের মত।

বেশ, শ্রীরাধাগিরিধারীলাল তোমার বদলুর অভাব পূরণ করলেন। এর নাম থাকল রামদাস। তুমি রামদাসকে তোমার ছেলে বলেই মনে করবে।

বলার সাথে সাথে বৃদ্ধা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বৃদ্ধার বুকের মধ্যে আমিও অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। খানিকক্ষণ কেঁদে আমার গায় মাথায় হাত বুলতে বুলতে বললেন,—

বাবাজী মহারাজ, রামদাসের খাওয়ানো পরানোর ভার দয়া করে আমাকে দিন। ওর যা লাগবে সব আমি দেব।

বাবাজী মহারাজ হেসে বললেন—বেশ, তাই হবে। রামদাস কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ গৃহস্থ। ও ভুল ক'রে বৈরাগী সেজেছে। আপাতত রামদাসের কাপড় দরকার। তারপর ও খায় কিন্তু ভাত।

মহারাজ, রাধারাণীর কৃপায় আমার তো কোনো অভাব নেই। আমার অভাব খাওয়া-পরার লোকের। আমি আজ মথুরায় লোক পাঠিয়ে কাপড় জামা, ডাল চাল আনাব। লালা, আর তোমার কি লাগবে বল?

বাবাজী মহারাজের কথায় বুঝলাম, আমার এই বৈরাগীর বেশ তাঁর

পছন্দ নয়। সে জন্য মনে মনে স্থির করলাম, একেবারে বাঙ্গালী বাবুও হব না, বৈরাগীর বহির্বাসও পরব না, মধ্যম ভাব ধরব। নয় হাত ধুতি, আর হাত কাটা বেনিয়ানের ফরমাশ করলাম। দু'দিস্তা কাগজ, পেনসিল, কয়েকখানা কাপড় কাচা সাবানের কথাও বলে দিলাম।

নতুন মা আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঝাঁকাটা তুলে নিয়ে, যাওয়ার সময় বলে গেলেন—লালা, তোমার বহিন রতিয়া আসবে। তার সাথে বিকালে আমাদের বাড়ী যেও। তোমার কাপড় তোমার বহিনই কেচে দেবে।

(৪)

বৃদ্ধা চলে গেলে পণ্ডিত-মহারাজ আমাকে বললেন,—তোমার সমস্ত ব্যবস্থা শ্রীরাধাগিরিধারীলাল ক'রে দিলেন। এখন এখানকার নিয়ম ব্যবস্থা শোন। আজ প্রথমদিন তোমার সমস্ত কাজে একটু গোলমাল হবে। কাল থেকে ভোরে উঠে স্নানাদি সেরে নিয়ে আরতি দর্শন করবে। তারপর তোমার নিত্যকর্ম সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিয়ে কিছু প্রসাদ পেয়ে পড়তে বসবে। এখানে সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত পড়াশুনা হয়। আরও চারজন বৈষ্ণব ও একটি গোস্বামী-সন্তান পড়তে আসেন। যে কোনও বৈষ্ণব আসলেই প্রণাম করবে। পথে ঘাটে বৈষ্ণব দর্শন হলেই অন্তত হাতজোড় ক'রে দণ্ডবৎ জানাবে। আমি লক্ষ্য করেছি, তোমার ঘাড়ের শলাটা বড় শক্ত। কিন্তু মনে রাখবে, বৈষ্ণবের কৃপা না হলে শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের কৃপা হয় না। বৈষ্ণবকৃপা নিজের সদ্ব্যবহারের দ্বারা পেতে হয়। সে কৃপা চেয়ে পাওয়া যায় না, অথবা ভক্তির ভণ্ডামি বা ন্যাকামি করেও পাওয়া যায় না। যে গোস্বামীসন্তান এখানে পড়তে আসেন, তিনিই মধ্যাহ্নে ভোগ রান্না করেন। তুমি তাঁকে সাহায্য করবে। শ্রীমন্দিরে সাড়ে-দশটায় ভোগ লাগে। এগারটায় সকলে প্রসাদ পাব। সাড়েএগারটা থেকে সাড়েতিনটে পর্যন্ত আমি এখানে থাকি নে। ঐ সময়ে তুমি থাকবে। যদি কোনো অতিথি আসেন, তাঁর সেবা করবে। সেবার

দ্রব্যাদি রতিয়াদের বাড়ী হতে আনবে। অতিথি যদি রসুই ক'রে ভোগ লাগাতে চান, তবে মুদীর দোকান হতে সব এনে দেবে। অপরাহ্ন সাড়ে চারটে হতে পাঠকীর্তন আরম্ভ হয়। সে সময় অনেক বৈষ্ণব আসেন। তুমি সকলের পিছনে স্থির হয়ে বসে শুনবে। যদি সে সময় কোনো বৈষ্ণবের জল বা কিছু প্রয়োজন হয়, দিযে সেবা করবে। সন্ধ্যা আরতির পর হয় কীর্তন। পার যদি কীর্তনে যোগ দেবে। তোমাকে আমি বেদান্ত পড়াব। অপর সকলে যা পড়ছেন, তাও মনোযোগ দিযে শুনবে। কারণ, তোমার জীবনে এমন একটা সময় আসবে, যখন এখানে যা পড়বে শুনবে, তা কাজে লাগবে। আজ থেকে মনে রেখ,—যতদিন এ আশ্রমে থাকবে, ততদিন এখানে শ্রীরাধাগিরিধারীলালের সেবাইত তুমি। আশ্রমের মানমর্যাদা রক্ষার দায়িত্বও তোমার।

শুনলাম। এক মূহুর্তের মধ্যে আশ্রমটা আমার হয়ে গেল। সে আমার' মধ্যে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। ঠিক মত সব করতে পারব কিনা, তা ভাবা চিন্তা বিচার বিশ্লেষণের হেতুও নেই, কারণ আশ্রম তো আমার।

(৫)

স্নান কবতে গেলাম গোবিন্দকুণ্ডে। শুনলাম পুছরীতেও দু'টো কুণ্ড আছে, লবণ-কুণ্ড ও অপ্সরা-কুণ্ড। লবণকুণ্ডের জল অত্যন্ত ক্ষার। অপ্সরা কুণ্ডের জল ক্ষারি নয়, কিন্তু বৎসরে আট মাসই ব্যবহারের অযোগ্য। আশ্রম থেকে গোবিন্দকুণ্ডও যতদূর, ও দু'টো কুণ্ডও ততদূর। গোবিন্দকুণ্ডের জলও ভাঙ্গপড়া। এদেশে এক যমুনা নদী ছাড়া, আর কোনো জলাশযেই ভাল জল পাওয়া যায় না। হয় অত্যন্ত ক্ষারি, নয়তো ভাঙ্গপড়া। ভাল জলের ইঁদারাও খুব কম। সে জন্য মিঠাপানির ইদারায় যথেষ্ট ভিড় হয়। আমাদের আশ্রমের নিকটে একটা ভাল ইঁদারা আছে। প্রায় দু'শ' হাত দড়ি দিয়ে জল তুলতে হয়।

স্নান করে এসে দেখলাম, ছাত্রেরা এসে পড়েছেন। বড় ছাত্রের বয়স

বোধ হয় সত্তর পার হ'য়েছে ; পড়েন 'উজ্জ্বল নীলমণি' ও 'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত'। কনিষ্ঠ ছাত্রটিই গোস্বামীসন্তান, আমার সমবয়সী, পড়েন ব্যাকরণ ও ভাগবত। গোস্বামীসন্তানটি সহর বৃন্দাবনের এক বিখ্যাত ধনী গোস্বামী বংশের ছেলে, এখানে থাকেন গোবিন্দ কুণ্ডে।

আমি সকলকেই প্রণাম করলাম, তাঁরা সকলে প্রতি-প্রণাম করলেন। পণ্ডিত মহারাজ আমার নাম রামদাস গোস্বামী ব'লে সকলের নিকটে পবিচয় দিলেন। আমি আশ্রমে থেকে বেদান্ত দর্শন ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়ব শুনে, সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলেন।

সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে টোলে যোগ দিলাম। টোলঘবে একটা টাইমপিস্ ঘড়ি আছে। ন'টায পড়া শেষ হ'ল। দেখলাম বৈষ্ণব ছাত্র ক'জন বৈষ্ণব শাস্ত্রের নানা বিভাগে অধ্যয়ন করেন। সকলেই বেশ মনোযোগী ছাত্র। পড়ানোর সময় তর্কবিতর্কও বেশ চলে। দেখে শুনে ভালই লাগল।

পড়া শেষ হলে, বৈষ্ণব ছাত্র চারজন যথারীতি প্রণাম কবে বিদায় হলেন। গোস্বামী গেলেন রান্না করতে। আমি দু'কলসী জল এনে দিয়ে আবার ঢুকলাম টোল ঘরে।

টোলঘরে দুই আলমারি বোঝাই গ্রন্থ, আব একপাশে অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র—খোল, পাখোয়াজ, ডুগিতবলা, তানপুরা, বীণা, সেতার, সারেঙ্ আর একটা আমাদের পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত দোতারা দেখলাম। বুঝলাম এখানে সঙ্গীত চর্চাও বেশ ভালই হয়। ভোরে শুনেছি পণ্ডিত মহারাজের বীণা ও গান। তাতেই ধারণা হয়েছিল, ইনি একজন বড় গাইয়ে। এই যন্ত্রগুলি দেখে বুঝলাম, পণ্ডিত মহারাজ একজন সঙ্গীতাচার্যও বটে। কিন্তু ছাত্র কারা ?

আলমারিতে দেখলাম বহু মূল্যবান গ্রন্থ। দার্শনিক গ্রন্থই বেশী। গ্রন্থগুলি সব দাতাদের দান। প্রত্যেক গ্রন্থের ওপরে দাতার নাম লেখা আছে। তাড়াশের জমিদার বনোয়ারীলাল রায় ও বনমালী রায়, এবং কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের দানই বেশী।

কোনো কোনও গ্রন্থ চার-পাঁচ কপিও আছে। পরে শুনেছিলাম, নিষ্কিঞ্চন ত্যাগী বৈষ্ণব ছাত্রদের জন্য ঐ সব গ্রন্থ চার-পাঁচ কপি রাখতে হয়েছে।

বাবাজী মহারাজ গিয়েছেন বৈষ্ণব দর্শনে। ছাত্র গোস্বামী রান্নাঘরে রান্না করছেন, আর ভজন গানের সুর ভাঁজছেন। আমি টোল ঘরে বইগুলো দেখছি। এমন সময় কানে এল—পণ্ডিত বাবা, মেরা ভাইয়া কাঁহা ?

বুঝলাম রতিয়া এসেছে। কণ্ঠস্বর অপূর্ব সতেজ ও মিষ্টি। টোল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, অসাধারণ বলিষ্ঠ মেয়ে। মাথায় আমার চাইতেও লম্বা হবে। বয়স ঠিক বুঝতে পারলাম না, কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে যে কোনো একটা অঙ্ক হতে পারে। পরে শুনেছি একত্রিশ বছর। মাথায় বাঙ্গালী মেয়েদের মত চুল—যা ও সমস্ত দেশে দেখা যায় না। মুখখানা দারুণ বসন্তরোগে একেবারে মৌচাক হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম—বহিন, এই যে আমি। এস এখানে বসি।

রতিয়া একটু হেসে পরিষ্কার বাংলায় বলল,—ভাইয়া, আমি যে অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই নে। তুমি কাছে এস।

শুনে স্তম্ভিত হলাম। হঠাৎ চোখ দেখে বুঝার উপায় নেই যে, মেয়েটি অন্ধ। এগিয়ে যেয়ে সম্মুখে দাঁড়ালাম। বাঁ হাতখানা আমার ডান কাঁধে রেখে, ডান হাত দিয়ে মাথায় গায় হাত বুলিয়ে দেখে বলল—চল যাই টোলঘরে যেয়ে বসি। বাইরে বড় রোদ্দুর।

টোলঘরে আমার সম্মুখে রতিয়া নীরবে বসে আছে। অন্ধ চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরছে। আমি তাকে কি যে বলব, তা খুঁজে পাচ্ছি নে। রতিয়ার পরিচয় প্রায় কিছুই জানি নে। যা জানি তা হচ্ছে, আজ সকালে যে নতুন মা পেয়েছি, রতিয়া তাঁর মেয়ে। তিনি অবশ্য বলে গিয়েছিলেন যে, আমার বহিন রতিয়া আমাকে দেখতে আসবে। কিন্তু তাঁর সে কথায় মনে কোনো আগ্রহ না জাগায়, এদের

সম্বন্ধে আর পরিচয় জানতে চেষ্টা করি নি। এখন একে দেখার সাথে সাথে মনে হল, এ একটি অসাধারণ মেয়ে। এ ধরণের কোনো মেয়ের সম্মুখে আমি আমার বয়সে কোথাও পড়ি নি।

রতিয়া আমার ডান হাতখানা ধরে নীরবে চোখের জল ফেলছে। আমিও একটা দারুণ অস্বস্তি মনে নিয়ে নীরবে বসে আছি। এমন সময় পণ্ডিতমহারাজ এসে পড়লেন।

বাবাজীমহারাজ আমাদের দেখে বললেন,—বতিযা, আজ থেকে রামদাস তোমার ভাই হল। রামদাস যতদিন এখানে থাকবে, ততদিন ওর ভালমন্দ সব তুমি দেখবে। রামদাসের সমস্ত ভার আমি তোমাকে দিলাম।

রতিয়া প্রশ্ন করল—ভাইযা, তুমি কতদিন এখানে থাকবে?

তা তো বলতে পারি নে বহিন।

তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন?

মা, বউ, সবই আছে, কেবল বাবা স্বর্গে গেছেন।

তোমার বউ কত বড়?

আমার ছ'মাসের ছোট। তার একটা লালা হয়েছে।

তুমি এখানে পড়তে এসেছ? পড়া শেষ হলে চলে যাবে?

হাঁ বহিন। পড়া শেষ হলে দেশে যাব বইকি।

দেশে গেলে আর আসবে না?

নিশ্চয় আসব। তুমি আমার অন্ধ বহিন, তোমাকে দেখতে অবশ্যই আসব।

আচ্ছা ভাইয়া, আমি এখন যাই। আমি গেলে তবে মা তোমার খাবার নিয়ে আসবে। বিকালে আমি পাঠে আসব। পাঠ ভাঙ্গলে তোমাকে আমাদের বাড়ী দেখাতে নিয়ে যাব।

(৬)

গোবিন্দ কুণ্ডের দুলালরাম গোপের স্বচ্ছল অবস্থা। দুলালরাম ছ'বছর বয়সে, বারো বছরের মুনিয়াকে বিয়ে করেন। চব্বিশ বছর বয়সে স্ত্রী, মেয়ে রতিয়া ও পাঁচ মাসের ছেলে বদলুরামকে রেখে, বসন্ত রোগে মারা যান। স্ত্রী মুনিয়া খুব বুদ্ধিমতী ; চাকর রেখে চাষ-আবাদের কাজ চালিয়ে, সংসার ঠিক রেখেছেন। রতিয়ার বয়স যখন বারো বছর, তখন গোবর্ধন পর্বতের পশ্চিমে 'গাঁঠুলীর' নিকটে 'বেহেজ' গ্রাম হ'তে সম্বন্ধ এল। ছেলের নাম মোহন, ডাকনাম মুন্না, বয়স আট বছর, ও অঞ্চলের মধ্যে ধনী।

মুনিয়া মেয়ের বিয়ে আর ছেলের বিয়ে, এক সাথেই দিলেন। আট বছরের বদলুরামের বিয়ে হ'ল তের বছরের এক মেয়ের সাথে।

বৃন্দাবনের ওদিকে গোয়ালাদের মধ্যে ছোট ছেলের সাথে বয়সে বড় মেয়ের বিয়ে খুব প্রচলিত। বিয়ের পর মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যেয়ে আটদিন থেকে, অষ্টমঙ্গলার গিঁট খুলে, বাপের বাড়ী চলে আসে। তারপর স্বামীর বয়স ষোলবছর হলে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যেয়ে ঘরসংসার করে। এই যাওয়ার সময় একটা অনুষ্ঠান হয়, তাকে 'গহনা করা' বলে। স্বামীর বাড়ী হ'তে গহনায় নানাপ্রকার অলঙ্কার, কাপড়, জামা, ইত্যাদি উপহার আসে। মেয়ের বাপের গ্রামবাসীরাও ছেলের নিকটে ভোজ আদায় করে।

রতিয়ার স্বামীর বয়স যখন ষোল হল, রতিয়ার বয়স তখন কুরি। রতিয়ার গহনা হবে। ফালগুন মাসে শুভদিনে রতিয়া যাবে বড়লোক স্বামীর ঘরে। আর মাত্র দশদিন বাকী। কত আশা কত আনন্দ। গ্রামের বউ-ঝিরা এসে রতিয়াকে শিখাচ্ছে, জামাই আসলে কি কি গহনার দাবী করতে হবে। গ্রামের অপর সকলে রতিয়ার মাকে ভাল ভোজ আদায় করতে পরামর্শ দিচ্ছে।—'জামাই দেবে না কেন? তারা বড়লোক। আমাদের রতিয়ার মত সুন্দরী মেয়ে এ তল্লাটে নেই।'

রাত্রে রতিয়ার জ্বর হল। জ্বর ক্রমেই বেশী, তার সাথে গায়ে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা। মায়ের বুক কেঁপে উঠল। দু'দিন পবে দেখা দিল ভয়ানক বসন্ত। আটদিন অজ্ঞান অবস্থায় যমের সাথে টানাহেঁচড়া ক'রে রতিয়ার জ্ঞান হল। আর সাত-আট দিনের মধ্যে ঘা শুখিযে রতিয়া সেরে উঠল। কিন্তু নিদারুণ রোগ নিযে গেল তার দৃষ্টি শক্তি, আর রেখে গেল মুখে শত শত ক্ষতচিহ্ন।

মা হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। মথুরায বড় ডাক্তার দিয়ে দেখালেন ;—ডাক্তার সাহেব, যত টাকা লাগে আমি দেব, আমার বতিয়ার চোখ ভাল করে দাও।

ডাক্তার সাহেব ভাল করে দেখে, ব্যথিত চিত্তে জবাব দিলেন—কিছু করার নেই, কোথাও যেয়েও কোনো ফল হবে না। ডাক্তার সাহেব ফীঃও নিলেন না।

রতিয়ার গহনা আর হল না। তিন মাস পরে সংবাদ এল, বড় লোকের ছেলে মুন্না বিযে করেছে। কথাটা রতিয়ার নিকটে গোপন রাখার চেষ্টা হযেছিল। মা'র কান্নাকাটিতে সবই জানা হয়ে গেল।

রতিয়া কাঁদে না, কারও সাথে কথা বলে না, কোথাও যায় না; বাড়ীতে ব'সে থেকে ক্রমে শুখিয়ে উঠছে। এক দিন রতিয়ার মা শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্যদাস পণ্ডিতবাবাজী মহারাজের শ্রীরাধা গিরিধারীলালের সেবার জোগান দিতে যেয়ে, রতিয়ার অবস্থা জানিয়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন। বাবাজীমহারাজের দয়া হল, রতিয়াকে সাথে করে আনতে বললেন।

পরদিন রাতিয়া এল। বাবাজীমহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—রতিয়া গান শিখবি ?

রতিয়া উত্তর দিল—আপনি যদি কৃপা করে শিখান. শিখব।

কথা স্থির হ'য়ে গেল। রতিয়া আসে বেলা নয়টায় গান শিখতে। দুতিন দিনের মধ্যেই বড় সঙ্গীতাচার্য বাবাজীমহারাজ বুঝলেন, ছাত্রী তাঁর উপযুক্ত, কণ্ঠস্বর দুর্লভ, অতিশয় মেধাবিনী।

রাধাকুণ্ডের তাড়াশ-জমিদার বাড়ী হ'তে এসে গেল তানপুরা বীণা সেতার সারেঙ পাখোয়াজ। ছ'মাসের মধ্যে জমে উঠল গানের ক্লাস। দূর-দূরান্তর হ'তে আসতে আরম্ভ করল শিক্ষার্থী আর সমঝদার শ্রোতা। পণ্ডিতমহারাজ ছ'বছরে সাতখানা গীতগোবিন্দের গান, আর দশ-পনরোটা মীরার ভজন রতিয়াকে শিখিয়ে, গানের ক্লাস বন্ধ করে দিলেন। গানের ক্লাস করলে আশ্রমে বড় হৈ চৈ হয়, ভজন-সাধনে বিঘ্ন আসে।

রতিয়ার সে বিমর্ষভাব কেটে যেয়ে হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেল। এখন সে পণ্ডিতবাবার আদেশ হলে রাত ন'টার পর শ্রীরাধা গিরিধারী-লালকে গান শুনায়। মাঝে মাঝে নিঝুম রাতে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসে গান গায়। তার কণ্ঠস্বর এমন জোরালো যে, রাতের বেলা বহু দূরের গ্রামেও তার গান পৌঁছিয়ে শ্রোতাকে তন্ময় করে ফেলে। বাবাজীমহারাজ ছাড়া আর কারও ফরমাশে রতিয়া গান গায় না। সে বহু ব্রজপ্রচলিত গ্রাম্যগীতি জানে। ঝুলন, দোলের হোলি, প্রভৃতি উপলক্ষ্যে ঐ সমস্ত পল্লীগীতি গায়। সে জন্য আশেপাশের বহু গ্রামে তার বিশেষ সমাদর আছে।

গায়ে রতিয়ার অসাধারণ শক্তি, ছ'হাতে ছ'টো মোষ সামলাতে পারে। একবার এক রসিকপুরুষ রতিয়াকে নির্জনে পেয়ে, একটু রসিকতা করতে নিয়েছিলেন। রতিয়া তাঁর হাতখানা ধরে এমন একটা নোচড় দিয়েছিল যে, মথুরার হাসপাতালে তিনমাস বাস করেও সে হাত আর ইচ্ছামত নড়লচড়ল না।

রতিয়ার ভাই বদলুরাম আট বছর বয়সে বিয়ে করেছিল। গহনা ক'রে বউ ঘরে আনার ছ'বছর পরে জ্বর হয়ে আট মাস ভুগে মারা যায়। বদলুরামের স্ত্রী বাপের বাড়ী গেলে সেখানে বাপ-মায় আবার তার বিয়ে দিয়েছে। এখন রতিয়া আর তার মা—এই ছ'জন মাত্র সংসারে, আর কেউ নেই।

ছাত্র গোঁসাইয়ের রান্না শেষ হয়ে সাড়েদশটায় মন্দিরে ভোগ লাগল। দু'টো চুলো জ্বেলে রান্না হয়েছে—ভাত, রুটি, ডাল, আলুর তরকারি। এগারটায় মন্দির থেকে ভোগ বেরুল। আমরা তিনজন শালপাতায় প্রসাদ পেলাম। নতুন মা আমার জন্য ঘি আর দই দিয়েছেন। সেগুলিও ভোগ লেগে প্রসাদ পেলাম। সাড়ে এগারটার মধ্যেই বাবাজীমহারাজ বেরিয়ে গেলেন। আমরা দু'জনে রান্নাঘর পরিষ্কার ক'রে বাসনপত্র মেজে গুছিয়ে রেখে টোলঘরে এসে বসলাম।

গোঁসাইটি সরল ভালমানুষ, বড়লোকের ছেলে হলেও কোনো অভিমান নেই। প্রতিদিন বাবাজীমহারাজের দিনের রান্না করে দিয়ে যান। রাত্রে অতিথি না থাকলে শ্রীরাধা গিরিধারীলালের জন্য কয়েকখানা পুরি হয় মাত্র। পুরি আর ক্ষীর রাত্রে ভোগ লাগে। সে প্রসাদ অতিথি থাকলে তিনি পান, নইলে পরদিন প্রাতে প্রসাদার্থী ছেলে-মেয়েরা পায়। বাবাজীমহারাজের জন্য দুপুরের ভোগের রুটি কয়েকখানা থাকে, তাই রাত্রে দুধ দিয়ে খান।

বাসনমাজা ও রান্নাঘর পরিষ্কার করতে করতে শুনেছি রতিয়ার কাহিনী। টোলঘরে বসে গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিলাম আশ্রমের আচার ব্যবহার হাল-চাল। গোসাঁইর মুখে শুনলাম, বাবাজীমহারাজ দুপুরে যান আপ্‌সরা কুণ্ডের নিকটে এক নির্জন কুঞ্জে, সেখানে বসে তিন ঘণ্টা ধ্যান করেন। গোবর্ধনের আশেপাশে ও প্রকার কুঞ্জ বহু আছে। এক এক কুঞ্জে এক এক মহাত্মা ভজন করেন।

সাড়েবারোটায় গোঁসাই চলে গেলেন। আমি টোল ঘরে শুয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিলাম। জেগে সময় আর কাটতে চায় না। জ্যৈষ্ঠ মাস। বাংলাদেশে যাদের বাড়ীতে আমগাছ আছে, তারা এ সময় আমতলায় শুয়ে-ব'সে পাকা আমের দিকে তাকিয়ে বেশ সময় কাটায়। সঙ্গী জুটলে তাস পিটিয়ে বা গল্প করেও সময় কাটে। এখানে আমগাছ

তো দূরের কথা, কোনো একটা ভাল ফলের গাছই চোখে পড়ে না বক্‌সা ক্যাম্পে ও লছমন ঝোলায় ছিল সম্মুখে রহস্যময় বিরাট হিমালয় তার দিকে তাকিয়ে বেশ সময় কাটানো যেত। এখানেও শ্রীগোবর্ধন-পর্বত আছেন, তবে তিনি বর্তমানে শ্রীহীন, কতকগুলি বড় বড় পাথরের স্তূপ মাত্র। কদাচিৎ কোনো জায়গায় একটা ছ'টো ছোট গাছ অতিকষ্টে পাথর ঠেলে মাথাতুলে দাঁড়িয়ে, কাতর কণ্ঠে কৃপণ আকাশের কাছে জল ভিক্ষা ক'রছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের খাজনা আদায়ের মত ছোট গাছ ও লতাগুলির শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন জ্যৈষ্ঠের সূর্যদেব। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই যেন কেমন একটা বিশ্রী লাগতে লাগল। ভাবছি গতকাল ও আজ প্রাতে তো মনের ভাব এমন ছিল না ?

হঠাৎ চোখে পড়ল, ঘরের এক কোণে কাল কাপড়ের বোরখা প'রে দাঁড়িয়ে আছে সারেঙ, তানপুরা, বীণা, সেতার,—চার সখী। সাথে সাথে মনে পড়ল, আমার নবলব্ধ বহিন রতিয়ার কথা। আমার মনের দুরবস্থার কারণও পরিষ্কার বুঝাগেল।

মানুষের মনের ছ'টো দিক আছে। একটা প্রকাশ্য দিক, আর একটা অবচেতন দিক। এই অবচেতন দিকের ভাবাবেগ অনেক সময় মনের তৎকালিক প্রকাশ্যদিকে স্পষ্ট ধরা যায় না। ধরতে না পারলেও মনের অবচেতন দিকের ভাবধারাই প্রকাশ্য দিকটা প্রভাবান্বিত করে। রতিয়ার কাহিনী শোনার পর, আমার মনের অবচেতনদিকে যে দুঃখময় প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়েছে, তাতেই তৎকালে প্রকাশ্য মনে যা কিছু গ্রহণ করতে যাচ্ছে, তাই বিশ্রী দুঃখময় লাগছে।

বাবাজীমহারাজ ঠিক সময়মত এসে শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের বৈকালিক সেবা আরম্ভ করলেন। এদিকে পাঠের শ্রোতা আসতে আরম্ভ করেছে। আমি পাঠের আসর পেতে প্রস্তুত হলাম। চারটায় কীর্তন আরম্ভ করে দশ মিনিট পরে কীর্তন শেষ হয়ে পাঠ আরম্ভ হল। আট দশজন গৃহী-বৃদ্ধ শ্রোতা, আর সকলেই ত্যাগী বৈষ্ণব। সাত আটজন

জটাজুটধারী অবাঙ্গালী বৈষ্ণব শ্রোতাও দেখলাম। পণ্ডিতমহারাজ ব্যাসাসনে শ্রীগ্রন্থের পূজা করে মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করলেন। যেমন উদাত্ত কণ্ঠস্বর; তেমনি উচ্চারণ। মনে পড়ল থানেশ্বর মঠের সেই পাঠ সভা, দু'টিই এক প্রকাব। পাঠ হচ্ছে শ্রীজীবগোস্বামীর শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের প্রথম দিকের ব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসা। অত্যন্ত কঠিন দার্শনিক বিষয়। মনে হল, আমিও যেন কিছু কিছু বুঝতে পারছি। পাঠ হচ্ছে হিন্দীতে।

পাঠ শেষ হলে দেখলাম, রতিযা এসে আমার পাশে ব'সে আছে। আশ্চর্য হলাম। কোন সময় যে সে এসে বসেছে, তা কিছুই জানি নে। পাঠের পূর্বে আমাব মন তো এই রতিযাকে নিযেই ব্যস্ত ছিল। মনে হযেছিল, মন এত চঞ্চল থাকলে পাঠেব কিছুই ভাল ক'রে শুনতে পাবব না, বুঝবও না। তার জন্য উঠানে গৃহী শ্রোতাদের পিছনে বসেছিলাম। কিন্তু পাঠারম্ভেব সাথে সাথে মন পাঠেব বিষয় ছাড়া আর তো কিছুই চিন্তা করে নি!

মনে প'ড়ল কালীশঙ্কর দাদার একটা কথা। একদিন তিনি বলেছিলেন—শিক্ষক যদি চরিত্রবান ও মনোবল সম্পন্ন হন, তবে তিনি অমনোযোগী ছাত্রকেও মনোযোগী করতে পারেন। তিরস্কারাদির কোনো প্রয়োজন হয় না।

(৭)

রতিযার সাথে চলেছি তাদের বাড়ী। পথে বেরিযে বুঝলাম রতিয়া একেবারে অন্ধ নয, আলো-ছাযার মত সামান্য কিছু দেখতে পায়। পরিচিত পথে চলতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। শ্রবণ শক্তিও অত্যন্ত প্রখর। শব্দ শুনে শব্দ উৎপত্তির স্থল কত দূরে, তা ধরতে পারে। পায়েব শব্দে মানুষ গরু মোষ কুকুর ছাগল—কি চলেছে, এবং সেটা কত বড়, তা ব'লতে পারে।

পথে চলতে চলতে রতিয়া জিজ্ঞাসা করল—ভাইয়া, পণ্ডিত বাবা তোমার জন্য ধুতি কিনতে বলেছেন। এখন তোমার পরণে কি আছে?

উত্তর দিলাম—আমার পরণে এখন বহির্বাস আছে।

বাবাজীদের মত বহির্বাস ?

হাঁ। তবে কিছুদিন আগে ছিল গেরুয়া কাপড়-জামা। বৃন্দাবনে এসে সে গুলো ফেলে দিয়ে বহির্বাস ধরেছি।

তুমি না বললে, ঘরে তোমার বউ ছেলে সব আছে! তুমি কি বউএর সাথে ঝগড়া করে পালিয়েছ ?

না বহিন, আমি ঝগড়া করে পালিয়ে আসি নি। আমার কাহিনী বহু, সময়মত সব তোমাকে শোনাব, কিছু গোপন করব না। আচ্ছা বহিন, তুমি এমন স্নুন্দর বাংলা বলতে শিখলে কি ক'রে ?

আমাদের বৃন্দাবনে ব্রজবাসীরা বাঙ্গালীদের সাথে মিশে অনেকেই কিছু কিছু বাংলা জানে। আমাকে বাবাজীমহারাজ খুব যত্ন ক'রে বাংলা শিখিয়েছেন। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল, আমি বাংলা শিখে বৈষ্ণব-পদবলী কীর্তন করি। তা আর আমার ভাগ্যে ঘটে উঠল না।

কেন ঘটে উঠল না ?

তোমরা পুরুষমানুষ জাতটা বড় ভাল নও, মেয়েদের গান শুনলে হুমড়িয়ে পড়। দেখাও যেন গান শুনছো, কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি ও মন থাকে মেয়েটার দেহের দিকে। গান সে কি গাইছে, তার গলায় স্নুর আছে কি না, গানের তাল-মানের জ্ঞান আছে কি না—সে সমস্ত কিছুই শোনো না। মেয়েটার চেহারা যদি ভাল হয়, আর বয়সটা যদি কম হয়, তবেই তোমাদের আনন্দে ডগমগ লোলুপ চক্ষু স্থির হয়ে থাকে। অবশ্য একথা আমি পণ্ডিত-বাবাদের মত মহৎ ব্যক্তিদের বাদ দিয়েই বলছি।

তা হলে তুমি সাধারণত পুরুষ জাতটাকে ঘৃণা কর ?

হাঁ, করি। মেয়েদের সম্পর্কে তোমরা বেশীর ভাগই কলুষিত মনোবৃত্তি সম্পন্ন নীচ স্বার্থপর।

বহিন্, তোমার মন্তব্যটা বড়ই কড়া হয়ে গেল। আমি তো বলতে চাই—পুরুষজাত নারীজাতির উপাসক। তাই তোমাদের সমস্ত ব্যাপারে তারা বিশেষ আগ্রহ দেখায়।

হ্যাঁ। তারা আমাদের উপাসক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সেটা দেহের রূপ-যৌবনের উপাসনা। সাক্ষাৎসম্বন্ধে মেয়েদের গুণের উপাসনা করেন, এ রকম পুরুষ একমাত্র সাধু মহাত্মারা ছাড়া আর কেউ কোথাও আছেন কিনা, তা আমার জানা নেই। তোমাদের বাংলা দেশের পুরুষেরা বোধহয় মেয়েদের গুণের উপাসনাই করেন? রূপযৌবনের দিকে তাকান না?

কথা আর বাড়ালাম না। রতিয়ার কথায় সত্য কতখানি আছে, তা যাচাই না করেও তার জীবন-ইতিহাসের পাতায় যা লেখা পড়েছে, তাতেই এ উক্তির হেতু স্পষ্ট। অন্য কথা আরম্ভ করলাম।

আচ্ছা বহিন, বাবাজী মহারাজ আমার জন্য ধুতিকাপড়ের ব্যবস্থা করছেন কেন? এ সম্বন্ধে তোমাকে তিনি কিছু বলেছেন?

না। তবে আমার মনে হয়, গৃহস্থ হয়ে বৈরাগীর বর্হিবাস পরা ঠিক নয়। যাক্, কাল তোমার ধুতি জামা এলে আমিও নিশ্চিন্ত হব, তোমার সাথে বেড়াতে পারব। যদি জানতাম, তোমার পরণে বৈরাগীর বহির্বাস আছে বা সন্ন্যাসীর গেরুয়া আছে, তবে তোমার সাথে পথে বেরোতাম না।

তুমি না অমাদের ঘৃণা কর! আমার সাথে আবার বেড়াবে কেন?

পণ্ডিত বাবা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি মানুষ চিনতে ভুল করেন না। তবে যদি কোনো দিন বুঝি, তোমার পরিবর্তন হয়েছে, তবে নিশ্চয়ই তোমার সাথে কথা বলব না।

আমার সে পরিবর্তন তুমি বুঝবে কি করে? তুমি তো চোখে দেখ না!

আমি মানুষের কথা ও কণ্ঠস্বর শুনে তার মনের ভাব বুঝতে পারি। তারপর ছায়ার মত চোখেও একটু দেখি, তাতে মানুষের নড়াচড়াও বুঝি।

বল তো, তোমার সম্পর্কে আমার এখন মনোভাব কি?

আজ প্রথম যখন দেখা হয়, তখন তোমার মন ভালই ছিল। সে সময়ে তোমার মনে একটা আনন্দ খেলা করছিল। এখন সেটা নেই। বোধ হয় আমার কাহিনী শুনেছ। তোমার কথায় আমার প্রতি একটা করুণা ও সহানুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে। তোমাদের পুরুষজাতটা সম্পর্কে আমি অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করা সত্বেও তুমি একটু মৃদু প্রতিবাদ করেই কথাটা এড়িয়ে গেল। এটা আমার প্রতি অহেতুক করুণা ও সমবেদনার ফল। কিন্তু তোমার কাছে আমি এ করুণা, এ সহানুভূতি চাই নে। বরং ওতে আমি বিরক্ত হই।

তবে তুমি কি চাও যে, ঐ মন্তব্যের জন্য আমি তোমার সাথে কোমর বেঁধে ঝগড়া করব ?

হ্যাঁ, আমি তাই চেয়েছিলাম। দয়া করুণা সহানুভূতি সমবেদনা —এ সব পেতে পেতে আমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

রতিয়ার কথা শুনে বিস্মিত হলাম। একে প্রথম দেখে যা মনে হয়েছিল, এখন বুঝলাম—এ তাই, বরং আরও কিছু বেশী।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা বহিন, বল তো, তোমার ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদে আমি কি ব'লে তোমার সাথে ঝগড়া করতে পারতাম ?

তুমি ব'লতে পারতে—যুবতী মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই নিজের রূপ-যৌবন লুব্ধপুরুষের দৃষ্টিপথে উপস্থিত করার একটা উৎকট আগ্রহ আছে। তার জন্যই তারা পুরুষের আহ্বান পেলেই, শালীনতা বর্জিত বেশে তাদের সম্মুখে নাচে, গায়, খেলা করে। তাদের এই মনোভাব পুরুষদের চাইতেও ঘৃণিত।

তা হলে দেখছি তুমি মেয়েদেরও ঘৃণা কর।

হাঁ, আমি ঐ ধরণের মেয়েদেরও ঘৃণা করি। তবে আমার ধারণা মেয়েদের ঐপ্রকার মনোবৃত্তির মূলেও পুরুষের দুষ্প্রবৃত্তিমূলক চেষ্টা আছে। আমার যখন চোখ ভাল ছিল, তখন একবার মথুরায় এক ছবির দোকানে গিয়েছিলাম। সে দোকানে এমন সমস্ত নারীর ছবি ছিল, যা

দেখে মনে হচ্ছিল, যদি ঐ ছবির চিত্রকরদের আমি হাতের কাছে পেতাম, তবে যে হাতে তারা ঐ রকম ছবি এঁকেছে, সে হাত মুচড়িয়ে ভেঙ্গে দিতাম। আরও বেশী দুঃখ হয় যখন দেখি, আমাদের উপাস্য শ্রীরাধা কৃষ্ণ হরগৌরী নিয়ে চিত্রকরেরা নিকৃষ্ট ভাবোদ্দীপক ছবি এঁকেও সমাজের বুকে নিরাপদে ঘুরে বেড়াতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়, ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়েরাও নারীদেহ নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলায় আপত্তি করেন না! রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ও শিবদুর্গার ভক্তরাও নির্বাক !!

কথাগুলো শুনে মনে ভাবলাম, রতিয়া অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে। বহির্জগত, আধুনিক উন্নত রুচি ও আর্ট সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই নেই। এ অবস্থায় এ প্রকার ধারণা তারপক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। আধুনিক ও সুপ্রাচীন আর্ট দেখতে দেখতে আমার তো ধারণা হয়েছে— যে আর্টিস্ট নারীদেহ অঙ্কনে বা নির্মাণে যত স্বল্পাবরণা ও বিলাসলাস্যময়ী ক'রতে পেরেছেন, তিনি তত বড় আর্টিস্ট। রাধাকৃষ্ণ মূর্তির পবিত্র দেবভাব, হরগৌরী মূর্তির পিতৃ-মাতৃ ভাব—ও গুলো তো পুরণো বস্তা-পচা মাল! ও সমস্ত বস্তাপচা মাল নিয়ে আর্ট সৃষ্টি হয় না। আর্টের মধ্যে থাকবে আর্টিস্টের যুগোপযোগী নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়। তবে তো আর্টরসিকদের মনস্তুষ্টি হবে।

তারপর হিন্দুধর্মের দিক দিয়েও এ সমস্ত আর্টের উপযোগিতা যে কত, তা যে কোনো বারোয়ারি আর্টিস্টিক পূজা-প্রাঙ্গনে সন্ধ্যাবেলায় উপস্থিত হলেই বুঝা যায়। এই আর্টিস্টিক পূজা-অর্চনায় পাড়ার বালক কিশোর যুবকদের কি নিদারুণ ভক্তি! কি দুর্দান্ত উন্মাদনা !! ভক্তিগদগদ দর্শন ব্যাকুল নরনারীর কি অদম্য হুড়াহুড়ি !!!

এ সমস্ত তত্ত্ব আমার জানা থাকলেও রতিয়াকে বুঝানো সম্ভব নয়। একে সে আধুনিক শিক্ষার উজ্জ্বল আলোক পায় নি, তারপর সে অন্ধ, আর বিশেষ করে কুসংস্কারান্ধ। এ অবস্থায় যদি তাকে সুবিখ্যাত, 'ফ্রয়েডের থিওরী' অনুযায়ী এই সমস্ত ফাইন-আর্টের রস বুঝাতে যাই, আর তার ফলে ঐ গেঁয়ার মেয়েটার হাতের একটা চপেটাঘাত আমার

গণ্ডে এসে পড়ে, তবে আর যাই হোক সে গণ্ডের ভিতরে যে একটা পৈতৃক দম্ভও 'রুচি-কৌমুদী' প্রকাশ করার জন্য অবশিষ্ট থাকবে না, সে বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ। কাজেই সাহসে কুলালো না।

আমাকে নীরব দেখে রতিয়া বলল—ভাইয়া তুমি আমার জন্য দুঃখিত হ'ও না। তোমাকে সত্যই বলছি, আমি মোটেই অসুখী নই। পণ্ডিত-বাবা আমার আনন্দের পথ দেখিয়ে মনে শান্তি এনে দিয়েছেন। আমি প্রাণ খুলে যখন ভজন গান গাই, তখন আনন্দসাগরে ডুবে যাই। গান শেষ হলেও সে আনন্দ আমার অন্তরে বহুক্ষণ থাকে।

আমি বললাম—বহিন, তোমার গান আমাকে শুনাবে না ?

আজ রাত্রে শ্রীরাধা গিরিধারীলালের আরতি দেখতে যাব। আরতি কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত বাবা যদি আদেশ করেন গাইব। তখন শুনো।

কথায় কথায় রতিয়াদের বাড়ী এসে গেলাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী। গোহালে দেখলাম, বড় বড় চারটে গাই ও দু'টো দুধেল মোষ বাঁধা রয়েছে। শুনলাম, চাষের বলদ মাঠেই থাকে। নতুন মা একখানা আমসত্বের মত মোটা গরম সর খেতে দিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আরতির পূর্বে আশ্রমে ফিরতে হবে। রতিয়া জানাল, সে আরতির পর কীর্ত্তনের সময় মাকে সাথে নিয়ে যাবে। আমি একাই চললাম আশ্রমে। ভাবতে ভাবতে চললাম—কি অদ্ভুত মেয়ে এই অন্ধ রতিয়া।

আশ্রমে আরতি শেষ হয়ে ভজন কীর্ত্তন আরম্ভ হল। আট-দশ জনে কীর্ত্তন করছেন। আমার মন পথের দিকে তাকিয়ে আছে,—এখনও তো রতিয়া আসে না।

ন'টায় কীর্ত্তন শেষ হয়, সে দিন পনরো মিনিট পূর্বেই কীর্ত্তন শেষ হল। কীর্ত্তন শেষ হতেই রতিয়া এসে গেল। শ্রীমন্দিরের ক্ষুদ্র বারান্দায় একপাশে বসলেন পণ্ডিত মহারাজ সারেঙ হাতে, আর একপাশে বসলেন এক অবাঙ্গালী জটাধারী বাবাজীমহারাজ পাখোয়াজ নিয়ে।

মধ্যে শ্রীরাধা-গিরিধারীলালকে সম্মুখক'রে বসল রতিয়া, হাতে তানপুরা। আমরা আর সকলে বসলাম উঠানে। আরম্ভ হ'ল গান।

প্রথম গাইল একখানা মীরার ভজন। তারপর গাইল একখানা জয়দেবের গীতগোবিন্দের গান। জয়দেবের গীতগোবিন্দের সংস্কৃত গান এপর্যন্তও কোনো ভাল গায়কের মুখে শুনি নি, কাজেই তুলনামূলক বিচার করে শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বলতে পারব না। মীরার ভজন বহু শোনা ছিল, আজও শুনি। রতিয়ার মুখে যা শুনেছি, আজও কেউ তার ধারে-কাছে পৌঁছাতে পারেন না।

দু'খানা গানে রাত দশটা বেজে গেল। ছোট উঠান লোকে ভ'রে গিয়েছে। উঠানে স্থান না থাকায় বাইরে গাছতলায় বসে লোকে গান শুনছে। গান শেষ হলেও দশ মিনিট পর্যন্ত কেউ নড়লেন না। বাবাজী মহারাজদের সজল চক্ষু স্থির হয়ে আছে। দশ মিনিট পর্যন্ত একটি টুঁ শব্দ নেই। তারপর সকলে নীরবে প্রণাম করে চলে গেলেন। রতিয়াও শ্রীরাধা গিরিধারীলাল ও বাবাজী মহারাজদের প্রণাম করে একটি কথাও না ব'লে মায়ের হাত ধরে চলে গেল।

আমার ধারণা হ'ল, এ গানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের বাইরে গান থামলেও মনের কানে গান থামতে বহু সময় লাগবে।

(৮)

পণ্ডিত বাবাজী মহারাজের আশ্রয়ে দিন ভালই কাটছে। পড়াশুনাও বেশ হ'তে লাগল। বকসা ক্যাম্পে কালীশঙ্কর দাদা যা পড়িয়েছিলেন, তার যেটুকু মনেছিল তা খুব কাজে লাগছে। কালীশঙ্কর দাদার পড়ানোর ধরণটা ছিল কলেজের অধ্যাপকদের মত। পণ্ডিত মহারাজের পড়ানো ঠিক পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়দের মত। কালীশঙ্কর দাদাকে পড়ায় ফাঁকি দেওয়া যেত, এঁর নিকটে সে উপায় নেই। ইনি পড়া দিয়ে আবার প্রশ্ন করেন। সে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে নতুন পড়া দেন না।

বেদান্ত দর্শনের 'বেদান্ত পরিভাষা' পড়ি। পণ্ডিত মহারাজ পূর্বপক্ষে তর্ক তোলেন, আমাকে উত্তর দিতে হয়। স্কুল কলেজে পড়ার সময় ডিবেটিং ক্লাবে তর্কবিতর্কে আমার বেশ আগ্রহ ছিল। বেদান্ত প'ড়তে যেয়ে তর্কের ক্ষেত্রটা ভাল পেয়ে গেলাম, নেশা বেশ জমে উঠল।

বহু বাবাজী মহারাজের দর্শন পাই। অনেকেই আমার সত্য পরিচয় কিছু কিছু জানেন। সকলেরই স্নেহ পাই।

একদিন পণ্ডিত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি তো হিংস্র বিপ্লবী। আপনারা অহিংস বৈষ্ণব হ'য়ে আমাকে স্নেহ করেন কেন?

পণ্ডিত মহারাজ উত্তর দিলেন—বাবা, শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের লীলাভূমি আজ বিধর্মীর পদানত। মথুরায় শ্রীবাসুদেবের জন্ম স্থানের পবিত্র মন্দির হয়েছে মসজিদ। সে মসজিদে গোহত্যা হচ্ছে নিত্য ব্যাপার। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-মন্দির প্রভৃতি বিখ্যাত মন্দিরগুলি, পরধর্মবিদ্বেষী রাজশক্তি ভেঙ্গে বিকৃত করে দিয়েছে। এই সমস্ত দেখে শুনে বৈষ্ণবসমাজ অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করেন। যারা এই বিজাতীয় বিধর্মীর শাসন দূর ক'রে ভারতভূমির পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে, তাদের প্রতি বৈষ্ণবদের স্নেহ-সহানুভূতি তো স্বাভাবিক।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম—আপনারা তো এ জগৎটাকে অনিত্য ও ক্লেশ জনক বলেন। তবে কেন এর ভালমন্দ নিয়ে ব্যস্ত হবেন?

বাবাজীমহারাজ উত্তর দিলেন—তুমি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ভাবধারা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু জান না বলে এই প্রকার ভুল ধারণা ক'রেছ। এই জগৎ যদি মিথ্যামায়া ও ক্লেশজনকই হবে, তবে নিত্যধাম গোলোক-বিহারী পরমপুরুষ কেন এই পৃথিবীর বুকে নেমে আসেন? সমস্ত শাস্ত্রই তো বলেন, পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের সুখ-দুঃখ ভালমন্দ নিয়ে সেই পরম পুরুষ চিন্তা করেন। তাঁর সর্বোত্তম লীলাক্ষেত্রও এই পৃথিবী। ব্যবহারিক জগতের হিংসা ও অহিংসা নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছ, ওর মীমাংসা একমাত্র অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণই করতে পারেন। তিনি ভিন্ন আর কারও

সে ক্ষমতা আছে বলে মনে করিনে। তাঁকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা কর, সমস্ত সংশয় দূর হবে।

আপনি শ্রীরাধা-গিরিধারীলাল না বলে অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণ বললেন কেন?

শ্রীরাধা গিরিধারীলালের তত্ত্ব বুঝা অতিশয় কঠিন। আবার নিজে বুঝে অপরকে বুঝানো আরও কঠিন। ষড়দর্শন ও বৈষ্ণবশাস্ত্র উপযুক্ত বৈষ্ণব আচার্যের নিকটে অধ্যয়ন ও শ্রীগুরুকৃপায় সাধন-ভজনে অগ্রসর হ'তে পারলে তবে ব্রজের শ্রীরাধা গিরিধারীলালের তত্ত্ব কিছু বুঝা যেতে পারে, নচেৎ নয়।

আমাদের বাংলাদেশে দেখি, অনেকেই শ্রারাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝে ফেলে আনন্দে গদগদ হয়ে পাঠ বক্তৃতা করেন। এমন কি রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে বইও লিখে ছাপান। তাঁদের সে বক্তৃতা-পাঠ শুনে ও বই পড়ে তো মনে হয় না যে, তাঁরা কোনো দর্শন শাস্ত্র প'ড়েছেন। এ ব্যাপারটা তবে কি?

ছেলে বেলায় ঠাকুরমার কোলে ব'সে সন্ধ্যাবেলা চাঁদের মা বুড়ীর গল্প শুনে চাঁদ সম্পর্কে যেমন আমরা জ্ঞানলাভ করতাম, ঐ সমস্ত পাঠ, বক্তৃতা, বই,—তত্ত্বের দিক থেকে ঐ প্রকার চাঁদের জ্ঞানের মতই।

তা হ'লে কি আপনি বলতে চান, ব্রজের কৃষ্ণ অপেক্ষা অর্জুনসখা কৃষ্ণ বুঝা সহজ।

হাঁ, অনেকটা তাই বটে। শ্রীকৃষ্ণ যতদিন ব্রজে ছিলেন ততদিন তাঁর পূর্ণতম অভিব্যক্তি—যাকে উপনিষদে তুরীয়ব্রহ্ম বলা হ'য়েছে, তাই ই প্রকাশ পেয়েছে। তুরীয় ব্রহ্মতত্ত্ব দুর্বোধ্য। মথুরায় তিনি ভগবান-পরমেশ্বর-তত্ত্ব, সে জন্য কথঞ্চিৎ সহজবোধ্য। শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতা ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভিতর দিয়ে আমরা হিন্দুসভ্যতা, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্র ও তার প্রয়োগকৌশল—সমস্তই পাই। আরও পাই, আধ্যাত্মিক জগতের প্রাথমিক জ্ঞান ও সাধনভজনের প্রাথমিক উপদেশ—যা সর্বসাধারণে বুঝতে পারে, ইচ্ছা করলে আচরণও করতে পারে।

গীতা যে তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ ক'রেছেন, তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর তত্ত্বজ্ঞান আছে নাকি?

গীতায় ভগবান সবই বলেছেন, তবে আনন্দ-রস-তুরীয় ব্রহ্মতত্ত্বের আভাষ দিয়েছেন মাত্র। শ্রীমদ্‌ভাগবতেই এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হ'য়েছেন। তোমার ভাগ্যে যদি কোনো দিন শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন সম্ভব হয়, তখন আমার কথা বুঝতে পারবে। শ্রীমদ্‌ভাগবত হচ্ছেন সমস্ত বেদ উপনিষদের ভাষ্য।

আমাদের দেশে ও নবদ্বীপে ভাগবত পাঠ ও কথকতা আমি শুনেছি। তাঁদের পাঠে কোনো দার্শনিক যুক্তি বা বেদ-উপনিষদের কথা বিশেষ কিছু শুনেছি বলে মনে হয় না।

তার কারণ হচ্ছে—যাঁরা পাঠ করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই অর্থ অথবা প্রশংসা লাভের জন্য পাঠ করেন। তাঁদের সে অর্থ ও প্রশংসা আসে শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞ জনসাধারণের কাছথেকে। সাধারণ গৃহস্থরা দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার বোঝেনও না, বুঝতে চানও না। কাহিনী বর্ণনা ভাল হলেই ঐ সমস্ত শ্রোতা খুশী হন। কাজেই বাজারে যে মালের কাটতি নেই, সে মাল যেমন ব্যবসাদার দোকানে রাখে না, তেমনই ব্যবসাদার পাঠক বক্তারাও দর্শনশাস্ত্র উপনিষদ পড়েন না। আর যদি বা উপাধি লাভের জন্য পড়েন, পাঠে আলোচনা করেন না।

তা হলে শ্রীমদ্‌ভাগবতের মত কঠিন দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ ক'রতে ব্যাসাসনে বসে পাঠকপ্রভুরা কি পাঠ করেন? আমি তো যা শুনেছি তাতে কেবল কতকগুলি গল্প ও শস্তা সাধন ভজনের কথা, এবং কতকগুলি সাধারণ নীতি-বাক্যের মধ্যেই তাঁদের পাঠ-বক্তৃতা সীমাবদ্ধ থাকে!

দেখ বাবা, এবিষয়ে আর আলোচনা চালিও না। আমাদের আলোচনা ক্রমেই পরনিন্দা ও পরচর্চ্চায় পরিণত হতে চলেছে। ঐ সমস্ত পাঠক ও বক্তারাও সাধারণ গৃহস্থ জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করছেন। তাঁরাই শ্রীভগবান ও ভগবদ্‌ভক্তি সাধারণ গৃহস্থের সম্মুখে

উপস্থিত ক'রে নানা উপায়ে সকলকে ভগবতুন্মুখ করছেন। তাঁদের চরণে আমার শতকোটি নমস্কার।

এই বলে বাবাজীমহারাজ দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। আমিও নিতান্ত বেকুফ হ'য়ে তাঁর অনুকরণে দণ্ডবৎ করলাম।

(৯)

রতিয়াকে আমার সমস্ত ইতিহাসই বললাম। শুনে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। দুইদিন রতিয়া আমার সাথে মনখুলে কথা বলতে পারল না। তার কথায় বুঝলাম, আমাকে দেখলে সে আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে বিচলিত হ'য়ে পড়ে। তৃতীয় দিন দুপুরবেলা ঘরে বসে পড়ছি, এমন সময় রতিয়া এসে কাছেই বসল। মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, কিছু বলতে এসেছে।

কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে রতিয়া বলল—ভাইয়া, শ্রীরাধা-গিরিধারী-লালের কৃপায় তোমার এ বিপদ কেটে গেল বাড়ী যেয়ে আর এ সমস্ত দলে যোগ দিও না। তোমার বুড়ী মা-ছেলে-বউএর মুখ চেয়ে, এ রকম বিপজ্জনক কাজে নামা অত্যন্ত অন্যায়। গান্ধীজীও তো দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছেন। তুমি যদি দেশের জন্য কিছু করতেই চাও, তবে গান্ধীজীর কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কাজ কর। তাতে যদি তোমার জেলও হয়, সে জেলে যেয়েও সুখে থাকবে। কলকাতার সেই ধোবীখানার বর্ণনা শুনে গত দুই রাত আমি ঘুমোতে পারি নি। একটু মন স্থির করতে নিলেই মনে ভেসে ওঠে ঐ দৃশ্য। আমি অস্থির হয়ে পড়ি।

আমি বললাম—বহিন, তোমার পরামর্শের প্রথমটা চেষ্টা করব। দ্বিতীয়টা আমার পোষাবে না। অহিংস সত্যাগ্রহ করতে যেয়ে যদি পুলিশের লাঠি আমার মাথায় পড়েও জ্ঞান থাকে, তবে দ্বিতীয়বার লাঠি পড়ার সুযোগ দেবার জন্য বীরের মত দাঁড়িয়ে থাকার বীরত্ব আমার মধ্যে মোটেই নেই। এক ঘা লাঠি পড়ার সাথে সাথেই

কাপুরুষের মত ঐ লাঠিওয়ালার লাঠি কেড়ে নিয়ে তাকেই ফাটিয়ে দেব। আর যদি লাঠি কেড়ে নিতে না পারি, তবে থান ইঁট বা ঐরকম কিছু খুঁজব। তারপর জেলে যেয়ে প্রথমশ্রেণীর কয়েদী হয়ে সুখ সুবিধে ভোগের জন্য যে অনশন সত্যাগ্রহ ইত্যাদি করতে হয়, ওটাও আমার রুচি ও স্বভাব বিরুদ্ধ।

আমার কথা যে রতিয়ার মনঃপুত হল না তা বুঝলাম। কিন্তু কি করব? রতিয়াকে মিথ্যা স্তোক বাক্য শুনাতে আমার প্রবৃত্তি নেই।

রতিয়া বলল—সহর বৃন্দাবনের হারানন্দ পরিব্রাজক মহারাজ যে কলকাতায় তোমার বিষয়ে খোঁজ নেবেন কথা আছে, সে সম্বন্ধে তুমি পণ্ডিত বাবাকে বলেছ?

হাঁ। আমি সমস্ত কথাই তাঁকে জানিয়েছি।

তা হলে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই পণ্ডিতবাবা করবেন। পরিব্রাজক মহারাজ পণ্ডিতবাবার সুপরিচিত। তিনি একজন বড় কালোয়াত ও পাখোয়াজী। পূর্বে তিনি কয়েকবার এখানে এসেছিলেন। তাঁর বাজনা ও গান আমি শুনেছি।

সে দিনের মত রতিয়া চলেগেল।

রতিয়া রোজই দু'তিনবার আসে। কোনো কোনও দিন রাত্রে আরতির পর গান গায়! দুপুরে এসে গল্প করে। আমার কাছে শোনে আমার বাড়ীর গল্প, ছেলে বেলার কথা, পাঠ্য জীবনের কথা। অনেক কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে শোনে। আমি শুনি তার মুখে ব্রজমণ্ডলের সাধুবৈষ্ণবদের আচার ব্যবহার ও সাধারণ গৃহস্থদের সামাজিক আচার ব্যবহারের কথা। কোনো কোনও দিন বাবাজীমহারাজের নিকটে আমি কি পড়েছি তাই শুনাতে হয়। ক্রমে এমন হয়ে পড়ল যে, প্রতিদিনই কি পড়লাম তা রতিয়াকে বুঝিয়ে বলতে হত। সে আমার ছাত্রী হয়ে দাঁড়াল।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় যেয়ে শ্রাবণে ঝুলন উৎসব। ব্রজমণ্ডলে ঝুলনে প্রতিগৃহস্থের বাড়ীতেই ঝুলন বাঁধা হয়। সে ঝুলনে ঠাকুরদেবতা ঝুলন-

খেলেন না. ঝুলন খেলে বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সকলেই। বউ-ঝিরা ঝুলন খেলতে খেলতে সুন্দর গান করে। গানগুলি সব রাধাকৃষ্ণ নিয়ে ঐ অঞ্চলের পল্লীগীতি। মেয়েদের মধ্যে যে ভাল গান করতে পারে, তার আদর ঝুলন আব দোল উপলক্ষ্যে খুব বেশী। আজকাল বাংলাদেশে শিক্ষিত সমাজে যেমন পৌষ-মাঘ মাসে পিক্‌নিক্ পার্টির ধুম পড়ে, ও দেশে শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে ঝুলন-পক্ষের পনরোদিন ঐপ্রকার ব্যাপার চলে। মেয়ে-পুরুষে দলবেঁধে একদিন গ্রামথেকে দু'একমাইল দূরে মাঠেব মধ্যে বা পাহাড়েব ধাবে বড় বড় গাছতলায় আড্‌ডা ক'রে গাছে পাঁচ সাতটা ঝুলন বাঁধে। তারপর সারাদিন ঝুলনখেলা, গান গাওযা, রান্না ক'রে খাওয়া, ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ চলতে থাকে। এই সমস্ত দলে অন্তত একজন ভাল গায়িকা থাকা চাইই। নিজেদের গ্রামে ভাল গায়িকা না থাকলে, অন্য গ্রামথেকে আনা হয়। এই সময়ে রতিয়ার আদর অত্যন্ত বেশী। বহু দূরের গ্রাম থেকেও নিমন্ত্রণ আসে। শতাধিক নিমন্ত্রণের মধ্যে সে পনরো দিনে পনরোটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। আর সকলে হতাশ হ'য়ে ভবিষ্যতের আশায ফিবে যায়।

এই সমস্ত মেঠো ঝুলনে স্ত্রীপুরুষ একজোড়া ক'রে ঝুলনে চাপে। এই জোড়াটা কিন্তু সম্বন্ধ বিচার করেই ঠিক করা হয়। ভাইবোন, দেওর-বউদিদি, মামী-ভাগ্নে, ঠাকুরদাদা-নাতনী, এই রকম সম্বন্ধে ঝুলনের জুটি ধরা হয়। সেবার রতিয়া ঝুলনের পূর্বেই পণ্ডিতমহারাজের অনুমতি নিয়ে, পনরো দিনের জন্য তার মেঠোঝুলনের স্থায়ী জুটি হ'তে আমাকে নিমন্ত্রণ করল। কথা ঠিক হল—যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, বেলা এগারটার পরে যেয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরতে হবে, নচেৎ আমার পড়ার ক্ষতি হয়। রতিয়া সেইভাবেই তার আমন্ত্রণকারীদের সাথে বন্দবস্ত করল।

আমি রতিয়ার মেঠোঝুলনের স্থায়ী জুটি হব শুনে, ছাত্রগোসাঁই একটু মুখটিপে হাসলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বললেন—কোনো যুবক রতিয়ার সাথে ঝুলনে ওঠে না। প্রথম প্রথম যারা উঠত, তারা ওর কনুইয়ের গুঁতোয় বুকে পাঁসরে ব্যথা হয়ে, পাঁচ সাত দিন বিছানায় প'ড়ে

থাকার পর এখন আর কেউ এগোয় না। ওর সাথে ঝুলনে ওঠেন ঠাকুরদাদারা, অথবা দশ বারো বছরের ছেলে।

প্রথম দিন গেলাম চার মাইল দূরে মাধুরী কুণ্ডে। দু'জনে ঝুলনে উঠলাম। রতিয়া গলা ছেড়ে গান ধরল। আধঘণ্টা ঝুলন খেলে নেমে রতিয়াকে বললাম—বহিন, কাল পিঠে একখানা মোটা কাঁথা বেঁধে আসব।

কেন ভাইয়া, কি হয়েছে ?

ঝুলন খেলাব সময় তোমার মাথার বেনীটা আমার পিঠে সপাং সপাং ক'রে যা পড়েছে, তাতে পিঠে আর ফোলার জায়গা নেই।

রতিয়া আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল—তাই তো ভাইযা, তোমার পিঠটা খুব গরম হয়েছে। তুমি একেবারে ছেলেমানুষ।

সে দিন রতিয়া আর কিছুতেই ঝুলনে উঠল না। ব'সে ব'সে গান গাইল। পরদিন নিমন্ত্রণ ছিল কুমুদ বনে। গাড়িতে চড়ে সে যখন আমাকে নিতে এল, তখন দেখি তার মাথার চুল আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মত খোলা। ও দেশে কিন্তু এলোচুলের চলন নেই।

(১০)

ঝুলন শেষ হয়ে জন্মাষ্টমী-নন্দোৎসব হয়ে গেল। বৃন্দাবনের তীর্থযাত্রীদের পরিক্রমা বেরিয়ে রাধাকুণ্ডে এসেছে। সেনমশাই ও বাঁড়ুজ্যেমশাই পরিক্রমার যাত্রী হয়ে, এলেন পণ্ডিত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করতে। বাবাজী মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানালেন, হরানন্দপরিব্রাজক মহারাজের সাথে প্রায়ই দেখা হয়। কলকাতার সংবাদে বুঝা যায়, আমার জন্য চেষ্টা চলছে। তবে কিছু সময় লাগবে।

বুঝলাম বাবাজী মহারাজ চেষ্টায় আছেন। রতিয়া ঠিক কথাই বলেছে।

আরও কয়েকমাস চলে গেল। কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিন রতিয়া আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যেয়ে ভাল ক'রে খাইয়ে হাতে রাখী বেঁধে দিল। রাখীটা এক টাকা দিয়ে কিনেছে।

ভাইফোঁটার দু'দিন পরে বেলা তখন নয়টা, আমাদের টোলের পড়া

.শব হয়েছে, রতিয়া ছুটতে ছুটতে এসে পণ্ডিত মহারাজকে জানাল, ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে এক অবতার এসেছেন। তিনি সদলবলে গোবর্ধন পরিক্রমায় বেরিয়ে গোবিন্দকুণ্ডে এসে চা খাচ্ছেন। তাঁদের দলে ভাল ভাল গাইয়ে বাজিয়ে আছে, তাঁরা চমৎকার কীর্তন করছেন। পণ্ডিত বাবা যদি অনুমতি দেন, তবে সে ভাইয়াকে সাথে নিয়ে, এই দলের সাথে গোবর্ধন পরিক্রমা ক'রে আসতে চায়।

রতিয়ার আগ্রহ দেখে পণ্ডিত মহারাজ অনুমতি দিয়ে, তাঁদের দেওয়া কোন খাদ্য খাওয়া ও তর্কবিতর্ক ক'রতে নিষেধ করে দিলেন। রতিয়া বাড়ী হতে দই আর ছাতু এনেছিল। দুই ভাইবোনে দই ছাতু খেয়ে প্রস্তুত হলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিক্রমা এসে গেল।

এত বড়দরের অবতার সচরাচর দেখা যায় না। ভক্ত ও ভক্তিমতীরা সকলেই অভিজাত বাঙ্গালী ও অসমীয়া। তাঁদের আভিজাত্য সব বিষয়েই পরিস্ফুট। ভক্ত ও ভক্তিমতীদের চাইতে তাঁদের আয়া ঝি চাকর বয়ের সংখ্যা অনেক বেশী। প্রায় তিরিশ খানা গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে লটবহর চলেছে। সর্বাগ্রে চলেছেন দশ বারো জন বাবুকীর্তনীয়া, খোলকরতাল হারমোনিয়ম সহযোগে অবতারের মহিমা কীর্তন হচ্ছে। তার পিছনে চলেছেন পঁচিশ-ত্রিশটি সুন্দরী যুবতী পরিবেষ্ঠিত অবতার। অবতারের বেশভূষা কলকাতার প্রথম শ্রেণীর সৌখীন বাবুদের মত। গলায় সুন্দর বেলফুলের মালা। দুই হাতের আঙ্গুলে আংটির মূল্যবান পাথর ঝক্‌মক্ ক'রছে। বয়স ঠিক বুঝা যায় না, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে হবে। বেশ সুপুরুষ।

দেখে খুব কৌতূহল হল, এমন দল আর দেখিনি। রতিয়ার হাত ধ'রে দলে 'হংস মধ্যে বক যথা' ভিড়ে পড়লাম।

দলে যোগদিতেই এক ভক্ত পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় দিলাম—আমি এখানে থেকে পড়াশুনা করি। আমার এই অন্ধ বহিনটির আকাঙ্ক্ষা—আপনাদের কীর্তন শুনতে শুনতে গোবর্ধন পরিক্রমা করে, তাই দু'জন এসেছি।

আমার কথা শুনে নিকটবর্তী কয়েকটি ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে একজন রতিয়ার হাত ধ'রে প্রথম প্রস্তাব করলেন, অন্ধ রতিয়া তাঁদের গাড়ীতে চলুক। রতিয়া তাতে সম্মত হল না। তখন তিনি নিজেই রতিয়ার হাত ধ'রে নিয়ে চললেন।

অবতার প্রভু ভাবাবেশে চলেছেন। মধ্যে মধ্যে আবেশ বৃদ্ধি হয়ে সঙ্গিনীদের গায়ে ঢলে পড়ছেন। অবতার যাতে পথের ধুলোয় না পড়েন, সেজন্য ঢলে পড়াব মত হ'লেই তিন-চারজন সঙ্গিনী তাঁকে জড়িয়ে ধরে সামলাচ্ছেন।

আমার পাশের এক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করে শুনলাম—ইনি হচ্ছেন আনন্দব্রহ্মের পূর্ণতম অবতার, অন্যান্য সমস্ত অবতারের মূল। ব্রজে এসে শ্রীকৃষ্ণভাবের আবেশে শ্রীরাধার জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। সর্বদা 'কই আমার প্রাণ প্রেয়সী রাধা' ব'লে ব্রজেব সর্বত্র বৃষভানুরাজ কন্যা শ্রীরাধারাণীর খোঁজ করছেন।

শুনে একটু চিন্তিত হলাম। অবতারের যে রকম ভাবাবেগ দেখছি, তাতে যদি তিনি 'এই আমার শ্রীরাধা' বলে ছুটে যেয়ে ঘাগরা ওড়না পরা রতিয়াকে চেপে ধরেন, তবে তাঁর বাধাপ্রেমের যে পরিণতি ঘটবে তার চাইতেও বড় কথা, শেষ রক্ষে হবে কি করে? আমরা মাত্র দুই ভাইবোন, ওরা যে শতখানেক! তবে একটা ভরসার কথা—গাড়োয়ান গুলো সব এ দেশী। তথাপি পিছিয়ে যেয়ে রতিয়ার সাথের ভদ্রমহিলা ক'জনকে অনুরোধ করলাম, তাঁরা যেন একটু পিছনেই চলেন।

গোবিন্দকুণ্ড হতে পুছড়ী-অপ্সরাকুণ্ডে পৌঁছুতে তিন মাইল পথে দু'ঘণ্টা লেগে গেল। অপ্সরাকুণ্ডের তীরে মধ্যাহ্ন ভোজ হবে। কয়েকখানা গাড়ী ও সাথের চাকরেরা এসে, পূর্বেই তাঁবু সামিয়ানা খাটিয়ে রান্না আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। এক এক গাছের তলায় ছোট ছোট সামিয়ানার নীচে দশ-পনরো জন বসা হল। নিকটবর্তী গ্রাম হতেও বহুলোক এই অপূর্ব সাধুর দল দর্শনে এসেছেন। অবতার প্রভুর জন্য একটা

...ট তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি সেই তাঁবুর ভিতরে বিশ্রাম ...ছেন। মহিলারা বোধ হয় পালা করে তাঁর সেবা করছেন।

দলের এক ভদ্রলোক সমাগত গ্রামবাসীদের সম্মুখে হিন্দীতে বক্তৃতা ...রে বুঝাতে আরম্ভ করলেন তাঁদের এই নব অবতারতত্ত্ব,—সাড়ে তিন ...জার বৎসর পূর্বে যে ব্রহ্মসনাতন ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে এই ...রামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হ'য়ে পৃথিবী ধন্য করেছিলেন, তিনিই ...র ভারতের পূর্বাঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব হে জগৎবাসী, ...োমরা সকলে এই ব্রহ্মসনাতনের পূর্ণ অবতারের শ্রীপাদপদ্ম-যাতলে আশ্রয় গ্রহণ কর, সর্ববেদের সার মহামন্ত্র 'প্রণব' গ্রহণ করে হও।

তন্ময় হয়ে বক্তৃতা শুনছি আর ভাবছি, সেই মহান্ত মহারাজকে ...বতার তৈরী করতে হলে আমাকেও তো এই রকম বক্তৃতাই ক'রতে ...বে।

আমি ও রতিয়া দু'জনে বসেছি যে জায়গাটায়, সেখানে আরও ...বারোজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ছিলেন। একজন আমার সবিশেষ ...রিচয় জানতে চাইলেন।

পরিচয় দিলাম—বাড়ী নবদ্বীপ। পৈতৃক শিষ্য আছে, তাই গোবর্ধনে ...ল কৃষ্ণচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের নিকটে বৈষ্ণব-শাস্ত্র পড়তে এসেছি।

এক ভদ্রলোক—বোধ হয় ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগী, মুখখানা বিকৃত ...রে ইংরেজীতে বললেন, এই সমস্ত নোংরা বৈরাগী আর নির্বোধ গোঁসাইরাই ধর্ম ও দেশটাকে জাহান্নমে ঠেলে দিচ্ছে।

কথাটা শোনার সাথে সাথে আমার ভিতরের সেই বুনো মোষটা গা ...ড়া দিয়ে উঠল। বাবাজী মহারাজের সতর্কবাণী ভুল হয়ে গেল। ঐ ভদ্রলোকটার চাইতেও দাঁত খিঁচিয়ে সুবিধেমত ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে ...ললাম—স্যার, একটা গল্প শুনুন,—

'এক ভদ্রলোক গোরুর গাড়ীতে চ'ড়ে দূরে এক আত্মীয় বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। বড়লোক আত্মীয়বাড়া চার পাঁচ দিন লুচি

পোলাও ভোজ খেয়ে, সেই গাড়োয়ানের গাড়ীতেই বাড়ী ফিরলেন। গাড়োযান তাঁদের নামিয়ে দিয়ে গেল নিকটেই তার এক বোনের বাড়ী। বোনকে ডেকে বলল—ও বুঃ, পান্তবাত আছে নি? বোন উত্তর দিল—আছে। গাড়োয়ান ব'লল—দে তো বুঃ, এক হান্‌কী পান্তবাত, আব গোটাচারেক পেঁজ পুড়িয়ে, মুখটারে একটু শানাযে লই। ভদ্দব লোকেরা কি ছাইই খায়!! কেবল ঘ্যাও, কেবল ঘ্যাও, ঘ্যাও আর ঘ্যাও মুখটারে এক্কেবাবে নাশ করে ফ্যালাইছে!'—

আপনি অভ্যস্ত পিঁয়াজপোড়া পান্তভাতে, ঘি আপনার ভ'ল লাগবে কেন?

'ডিসপেপসিযা' গর্জে উঠলেন, কে হে তুমি ইচড়েপাকা ডেঁপো ছোকরা?

উত্তব দিলাম—আজ্ঞে, আমি আপনাব জ্যেষ্ঠ তাত, পণ্ডিত বাবাজীমহারাজের ছয মাসেব ছাত্র।

এ উত্তর দেবার হেতু—পণ্ডিত মহারাজ ছ'মাসে আমাকে 'বেদান্ত পরিভাষ' বইখানা পড়িয়ে শেষ করেছেন। তাতে আমার ধারণা—পরত মীমাংসায় যে তর্ক উঠিতে পারে, তা মোটামুটি আযত্তে এসেগেছে পাশ্চাত্যদর্শনের কয়েকখানা ভাল গ্রন্থ কালীশঙ্কর দাদা পড়িয়েছিলেন কাজেই তর্ক যদি বাধেই, এঁরা কেউ আমাকে কাবু করতে পারবে না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম।

ঘটলও তাই। ডিসপেপসিয়াকে পিছনে সরিয়ে এগিয়ে এলেন আর চারজন ভদ্রলোক। যিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তিনিও বক্তৃতা থামিয়ে এসে পড়লেন। দলের আর যত ভদ্রমহিলা ভদ্রব্যক্তি প্রায় সকলেই এসে ভিড় জমালেন। রতিয়া ভয় পেয়ে আমার গা ঘেঁষে বসল।

যে চারজন এগিয়ে এসে আমার সম্মুখে আসন গ্রহণ করলেন তাঁদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন—বৈষ্ণবের উপাস্য তত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ কি?

উত্তর দিলাম—আমি কোনো কিছু উপাসনা করি নে। কৃষ্ণ, ভগবান, ব্রহ্ম,—এ সমস্ত কোনো দিন দেখি নি, জানিও না। আপনারা ব্রহ্মসনাতনকে জানেন বলেই তাঁর সাথে মিলিয়ে, আপনার আমার মত একটা মানুষকে ব্রহ্মসনাতনেব পূর্ণ অবতার বলে মেনে নিয়েছেন। আপনারাই প্রথম প্রমাণ করুন—ব্রহ্ম পদার্থ আছে। তারপর ব্রহ্মেব লক্ষণ বলুন, এবং সেই লক্ষণের সাথে আপনাদের অবতারটিকে মিলিযে দেখান? সাথে সাথে একটি কথা মনে রাখবেন, কোনো শাস্ত্র-বাক্য সম্পর্কে যদি সন্দেহ ওঠে যে, ঐ উক্তি উক্ত গ্রন্থে আছে কিনা, তবে আশা কবি আধঘণ্টার মধ্যে সে গ্রন্থ এখানে উপস্থিত হবে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁদের যুক্তির ঝুলি ফুবিযে গেল। আধুনিক শিক্ষায উচ্চশিক্ষিত সমাজেব অধিকাংশেবই একটা বিশেষ গুণ এই যে, তাঁরা যুক্তির নিকটে অবনত হতে লজ্জাবোধ কবেন না। তাঁদের ত্রুটি হচ্ছে—অনেকেই হিন্দুদর্শনেব দু'চারখানা বই পড়েন বটে, কিন্তু সেটাকে ভালকরে বুঝাব জন্য, প্রাচীনপন্থী অধ্যাপক-পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করেন না। ফলে প্রাচীনপন্থী তৃতীয শ্রেণীর একটি পণ্ডিতের সম্মুখেও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের এম্, এ, পাস কথা বলতে পারেন না। অধিকন্তু এই সমস্ত অবতার-বাবাদের গোটাকতক শস্তা নীতিব উপদেশ, আর তত্ত্ব ব্যাখ্যায 'হিং টিং ছট্' শুনে কেউ কেউ এমন চিৎপাৎ হন যে, অনেক সময সৎ-শাস্ত্রযুক্তির হাতি বেঁধে টানলেও তাঁদের নড়ানো যায় না।

আমাদের তর্কবিতর্কে বেলা প্রায় একটা বেজে গেল। অনেকক্ষণ রান্না হয়ে গিযেছে। দলের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ স্তব্ধ হয়ে আলোচনা শুনছিলেন। ব্যাপারটা বোধহয় তাঁদের নিকটে একেবারে অভূতপূর্ব। শেষ পর্যন্ত আমিই আলোচনা থামিয়ে দিয়ে, তাঁদের খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

দলের সমস্ত ভদ্রলোক ও মহিলারা আমাদের খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন. আমরা অস্বীকৃত হলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জন না

খেলে মহিলারাও দলবেঁধে অনশন সত্যাগ্রহ করবেন বলে হুমকি দেওয়ায়, রতিয়ার সাথে পরামর্শ করে কিছু ফল খেতে স্বীকার করতে হল। ফল এল এক ঝুড়ি আপেল আঙ্গুর বোম্বাই-কলা। দুই ভাই-বোনে কিছু নিয়ে খেলাম।

খাওয়ার পর আবার সকলে একত্রিত হলেন। কথাপ্রসঙ্গে আবার তর্ক উঠতেই রতিয়া ব্রজের ভাষায় আমাকে বলল—ভাইয়া, তুমি আর এঁদের সাথে ঝগড়া করতে পারবে না। তার চাইতে এঁদের বল, আমি একটা গান গেয়ে শুনাতে চাই।

রতিয়ার কথামত তাঁদের বললাম—দেখুন, আমাদের তর্কবিতর্কে কি লাভ হবে? তর্কে আমি যদি আপনাকে পরাজিত করি, তাতে আপনার মতের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমি যদি পরাজিত হই, তাতেও আমার মত পরিবর্তিত হবে না। তার চাইতে যদি আপনারা ইচ্ছা করেন, আমার এই অন্ধ বহিনের মুখে একখানা ভজন গান শুনুন। আশা করি আপনারা সকলেই আমার বহিনের গানে আনন্দ পাবেন। তবে একটা কথা, বহিন কিন্তু একখানা গানের বেশী গাইবে না।

আমার কথায় সকলেই উৎসাহিত হ'লেন। তখনই এসরাজ হারমনিয়ম, ডুগিতবলা এসে গেল! রতিয়া বলল, তার গানের সাথে হারমনিয়ম চলবে না। যদি এসরাজ বা সেতার থাকে, দিতে পারেন।

রতিয়ার কথায় সকলেই যেন বেশ একটু অবাক হলেন। এসরাজ আগেই এসেছিল, এবার এল তরফদারী সেতার। সেতারটাই রতিয়ার হাতে দেওয়া হল। বোধ হয় সকলে ভেবেছিলেন, সেতার দিয়ে তানপুরার কাজ চালানো হবে। কিন্তু রতিয়া নিজহাতে সুর বেঁধে নিয়ে যখন একটা 'আলাপ' বাজাল, তখন যিনি সেতার এনেছিলেন তিনি মন্তব্য করলেন—এটা খুব বড় ওস্তাদের 'ঘরাণা'। পরে শুনলাম ভদ্রলোক গৌহাটির বিখ্যাত সেতারী।

যে দু'জন এসরাজ আর তবলা নিয়ে বসেছিলেন, তাঁদের সরিয়ে

দিযে সেতারী নিলেন এসর'জ, আব এক ভদ্রলোক ধরলেন তবলা। গ'ন আরম্ভ হল।

প্রায চল্লিশ মিনিটে রতিযা যখন একখানা ভজন শেষ কবল, তখন সকলেবই একটা স্তম্ভিত ভাব। গান থেমে গেলেও পাঁচমিনিটের মধ্যে কেউ কথা বললেন না, বা নড়লেন না। সকলেই স্থির দৃষ্টিতে রতিযাব মুখেব দিকে তাকিযে আছেন।

প্রথম কথা বললেন তবলচী। তাঁব উক্তি হল—এ প্রক'ব মীবাব ভজন-সুব ও এই বকম গলা, তিনি আব কোথাও শোনেন নি। সেতাবী অসমীযা ভদ্রলোকও তাব কথা সমর্থন কবলেন! আর একখানা গ'নেব জন্য অনুবোধ হল। আমি আমাব কথা স্মবণ কবিয়ে তাদেব দলেব গাইযেদেব তু'একখানা গ'ন শোনাতে অনুবে'ধ কবলাম।

সেই ডিস্‌পেপ'সিযাব মনেব গবম বোধ হয তখনও যায নি। তিনি মন্তব্য কবলেন—মেযেটা একখানা গা'নই শিখেছে, কাজেই আব কি গ'ইব।

সেতাবী ভদ্রলোক উত্তব দিলেন,—যে অমন সুন্দব সেতাবেব সুব বাঁধতে পাবে, সে যে একজন বড় গাযিকা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এঁর গানেব পব আমাদেব কারও গা'ন জমবে না।

তবলচী জানতে চাইলেন, রতিযার গানেব ওস্তাদ কে। আমি জানালাম,—আমার অধ্যাপক শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্যদাস বাবাজী মহাবাজই বতিযাব সঙ্গীত শিক্ষক।

একজন পণ্ডিত মহারাজেব বিশেষ পরিচয় জানতে চাওয়ায় বললাম—তাঁর বিশেষ পরিচয় আমি প্রায কিছুই জানি নে। ব্রজমণ্ডলে তিনি ছোট পণ্ডিত বাবাজী নামে পরিচিত। বাইবে বৈষ্ণব সমাজেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। দর্শন শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। আপনাদের বিদ্যায়ও বোধ হয় সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। গান সেতার পাখোয়াজে বড় ওস্তাদ। এর কোনো কোনোটায় বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠও বলাযেতে পারে। পূর্ব পরিচয় কিছুই জানি নে, জানার উপায়ও নেই। কারণ ত্যাগী বৈষ্ণব

সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের পরিচয় জানতে চাওয়া নীতিবিরুদ্ধ। থাকেন পুছরী ও গোবিন্দ কুণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায়।

তাঁর মঠ কিপ্রকারে চলে ?

মঠ আশ্রম তপোবন বলতে যা আপনারা বোঝেন, ওরকম কোনো কিছুই তাঁর নেই। কোনো আশ্রমজননী বা ব্রহ্মচারিণীও তাঁর নেই। আপনাদের ঐ তাঁবুটার চাইতেও ছোট একখানা কুঁড়ে ঘরে থাকেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সাধনভজন নিয়ে রাতদিনে আঠারঘণ্টা কাটান।

আমার কথা শুনে সকলে যেন অবাক্ হয়ে গেলেন। একটি মহিলা—বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, সুন্দর চেহারা, গম্ভীর প্রকৃতি, পরণে গেরুয়া শাড়ী ; প্রথম থেকেই আমাদের দু'জনকে বেশ লক্ষ্য করছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন,—এ প্রকার বৈষ্ণব এ অঞ্চলে আরও আছেন কি ?

আমি উত্তর দিলাম—হাঁ, আছেন, বহু আছেন। সাধনা ও অনুভবের দিক থেকে পণ্ডিতবাবাজী মহারাজের চাইতেও উচ্চ স্তরের বৈষ্ণব যথেষ্ট আছেন।

আমরা তাঁদের দর্শন পাব কি ?

বোধহয় না। আপনারা তো তাঁদের দর্শনকরার সঙ্কল্প নিয়ে ব্রজে আসেন নি। আপনারা এসেছেন, আপনাদের নব-অবতার-মহিমা ও অভিনব মতবাদ প্রচার করতে। এ অবস্থায় ব্রজবাসী সাধক বৈষ্ণব আপনাদের চোখে বোধহয় ধরা দেবেন না।

আপনি একবার আমাদের প্রভুকে দর্শন করুন না।

দর্শন তো আমি পেয়েছি।

সে প্রকার দর্শনের কথা আমি বলছি নে। তাঁর নিকটে বসে একটু আলাপ করে দেখুন না।

তাতে আমার লাভ ?

ভগবানের অনুগ্রহ হলে অনেক কিছুই তো হতে পারে।

বেশ, ভাল কথা। আমার অনেক কিছুই প্রয়োজন আছে। সাক্ষাৎ

ভগবানের অনুগ্রহে তার দু'একটা প্রয়োজন যদি বিনাপরিশ্রমে সিদ্ধ হয়, তবে আমি এখনই তাঁর চরণাশ্রয় করতে প্রস্তুত।

মহিলাটি উঠে অবতারের তাঁবুর দিকে গেলেন। রতিয়া আমার হাত ধ'রে ব্রজের হিন্দীতে বলল—ভাইয়া, তুমি এদের অবতারের কাছে যেতে পারবে না।

আমি বললাম—বহিন, বাবাজীমহারাজের আশীর্বাদ আর তুমি সাথে থাকতে কেউই আমার কিছু করতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

আমার কথায় রতিয়ার মুখখানা বড় ম্লান হয়ে গেল। মহিলাটি ফিরে এসে জানালেন, এখন যাত্রার সময় হয়েছে, কাজেই দর্শন সম্ভব নয়। পরিক্রমা গোবর্ধন সহরে গেলে ধর্মশালায় সাক্ষাৎ হবে।

আধঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা আরম্ভ হল। লক্ষ্য করলাম, আগেকার মত কীর্তনাদিতে আর যেন বড় উৎসাহ নেই। অবতার-প্রভু গম্ভীর মুখে চলেছেন, সকাল বেলার সেই 'সখী আমায় ধর ধর' ভাবটা আর নেই।

সন্ধ্যায় গোবর্ধন সহরে ধর্মশালায় পৌঁছা গেল। সেই গেরুয়াপরা মহিলাটি সারাপথ রতিয়ার হাতধরে এনেছেন। আমিও পাশেই ছিলাম, মহিলাটি পথে একটি কথাও বললেন না। রতিয়া আমাকে কয়েকবার দল ছেড়ে আশ্রমে ফিরতে বলেছিল, কিন্তু পরাজয়ের ভাব প্রকাশ পাবার ভয়ে তার কথা রাখতে পারলাম না।

ধর্মশালায় পৌঁছেও মহিলাটি আমার পিছন ছাড়লেন না। আধঘণ্টার মধ্যেই দর্শনের ব্যবস্থা হয়েগেল। আমরা দুই ভাইবোন যখন অবতার প্রভুর ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে দশবারোজন মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রভু শয়ন করে আছেন। চারজন অবিবাহিতা সেবিকা প্রভুর শ্রীঅঙ্গ মর্দন করছেন।

আমি প্রণাম করে বসতেই প্রভু আদেশ করলেন—তোমার কি বলবার আছে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে বল?

আমি হাতজোড় ক'রে অতি বিনীতভাবে বললাম—আমি শুনেছি, ভগবদ্ অনুগ্রহ হলে মূক ব্যক্তিও বক্তা হয়, পঙ্গুও পর্বত লঙ্ঘন করে। আপনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাই আপনার কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আমি দর্শনশাস্ত্র পড়ি, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারিনে। আপনি কৃপাকরে এই মুহূর্তে সমগ্র ন্যায়-দর্শনটা আমার অন্তরে প্রকাশ করে দিন। আমি চিরকাল আপনার দাস হ'যে থাকব, এবং সর্বত্র আপনার মহিমা কীর্তন করব।

অবতার কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন,—তুমি দ্বাদশবর্ষকাল আমার নিকটে থেকে, অখণ্ডব্রহ্মচর্য-পালন ও নির্বিচারে আমার সেবা কর। তা হলে আমার কৃপায় তোমার কামনা পূর্ণ হবে।

আজ্ঞে, আমি যদি অধ্যাপকের নিকটে রোজ দু'ঘণ্টা, আর বাড়ীতে তিনঘণ্টা পড়ি, তবে আশাকরি ছয় বছরে ন্যায়দর্শনে পণ্ডিত হব। আমার মতলব—ভগবদনুগ্রহে বিনা পরিশ্রমে এক মুহূর্তে পণ্ডিত হওয়া।

তারজন্য পূর্বে সাধন ভক্তির প্রয়োজন।

আজ্ঞে, সেটা পরোক্ষ ভগবানের বেলায়, সাক্ষাৎ ভগবানের বেলায় তো নয়।

তর্ক তুলো না। আমি যা আদেশ করছি, তাই পালন কর।

আজ্ঞে, আমার একটা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম আছে—দোকানে যেয়ে যখন কিছু কিনি, তখন আগে মালটা হাতে নিয়ে পরখ করে দেখি, ভাল না মন্দ, আসল না মেকী। যদি পছন্দ হয়, তবে দাম দিই। আপনি কৃপাকরে প্রথমে আমার প্রার্থিত জ্ঞানটা দিয়ে দিন, আমি দু'চারদিন জ্ঞানটা পরীক্ষে করে দেখি। তারপর যদি মালটা খাঁটি বলে বুঝি, তখন আপনার সেবায় লেগে যাব।

তুই দূর হ', ভণ্ড পাষণ্ড নাস্তিক। কে একে আমার সম্মুখে এনেছে?

যে আজ্ঞে—বলে আর একটা প্রণাম করে রতিয়ার হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম পথে।

পথে এসে রতিয়া হাসতে হাসতে বলল—ভাইয়া, তুমি ভারী দুষ্টু, ভারী বদ্।

গোবর্ধন সহর ছাড়িয়ে এসে জিজ্ঞাসা ক'রল—ভাইয়া, অপ্সরা কুণ্ডে তুমি ইংরেজী বাংলায় মিশিয়ে ওদের কি বলেছিলে, যাতে ওরা সব অমন চটে গেল? ইংরেজী তো আমি জানিই নে; তোমার বাংলাও তো বুঝতে পারলাম না।

একটা গল্প বলেছিলাম।

গল্পটা আমাকে বুঝিয়ে বল না?

গল্পটা বলার কারণ থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্তই বললাম। শুনে রতিয়া হেসে কুট্‌পাট্। সারা রাস্তা হাসতে হাসতে চলল, আর মাঝে মাঝে আমাকে শাসাতে লাগল—চল আগে পণ্ডিত বাবার সম্মুখে, আমি তোমার নামে নালিশ করব। তুমি পণ্ডিতবাবার আদেশ অমান্য ক'রে, বড় বড় সাধু-মহাত্মাদের অপমান করেছ।

আশ্রমে যখন পৌঁছিলাম, তখন আরতির পর ভজনকীর্তন শেষ হ'য়ে সমাগত বৈষ্ণবেরা প্রসাদ গ্রহণ করছেন। আমরা দু'জনে শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের শ্রীমন্দিরে প্রণাম ক'রে পণ্ডিতমহারাজ ও সমাগত বৈষ্ণবদের প্রণাম করলাম।

প্রণামান্তে রতিয়া বলল—পণ্ডিত বাবা, ভাইয়া আজ আপনার আদেশ অমান্য ক'রে বড় বড় সাধু মহাত্মাদের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে, তাঁদের যা তা বলে অপমান ক'রে এসেছে। ভাইয়ার মুখে সমস্ত শুনুন।

এইবলে রতিয়া হাসতে লাগল। তার কথা শুনে ও হাসি দেখে সকলেই বেশ একটু বিস্মিত হলেন; কারণ রতিয়া স্বভাব-গম্ভীর মেয়ে, হাসে কম। পণ্ডিতমহারাজ আমার কাছে ঘটনা শুনতে চাইলেন। আমি সেই গাড়োয়ানের গল্পটা বাদ দিয়ে আর সমস্ত বললাম।

আমার কথা শেষ হতেই রতিয়া বলে উঠল—পণ্ডিতবাবা, ভাইয়া প্রথম দিকে ঝগড়া বাধার আসল কারণটাই গোপন করেছে। পিঁয়াজ-পোড়া পান্তভাতের গল্পটা বলল না।

পণ্ডিতমহারাজ রতিয়াকেই সেটা বলতে বললেন। রতিয়া সেই ডিসপেপ্‌সিয়ার উক্তি থেকে আরম্ভ করে সমস্তটাই বেশ গুছিয়ে বলল। শুনে সকলেই হাসলেন।

গল্পটা বলে রতিয়া গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রল—পণ্ডিতবাবা, ভাইয়া যে এই সমস্ত কাণ্ড ক'রে এল, এর জন্য ভাইয়ার তো কোনো অমঙ্গল হবে না?

না মা, সেজন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বৈষ্ণব নিন্দা শুনে নীরব থাকাই পাপ। তবে তাইবলে নিন্দুক যদি কোনো সৎধর্মাবলম্বী হন, তা হ'লে তার অবলম্বিত ধর্মকে আক্রমণ করা অপরাধ। যাই হোক এক্ষেত্রে তোমার ভাইয়ার অমঙ্গল হবে না।

পণ্ডিতবাবা, ভাইয়া বড় দুষ্টু গোঁয়ার।

সেই জন্যই তো ওকে তোমার হাতে দিয়েছি। তুমি তোমার ভাইয়ার ভালমন্দ দেখে ওকে সামলাবে।

এই ঘটনার মাসখানেক পরে একদিন রতিয়া দুপুরে এসে বলল, সে দিনের সেই ঘটনায় একটা ভাল ফল হয়েছে। ঐ ঘটনার শেষ পরিণতিতে, দলের অনেকগুলি পুরুষ ও মহিলা পরদিনই দলত্যাগ করেছেন। দলত্যাগীদের মধ্যে দশবারোজন সহর বৃন্দাবনে যেয়ে, গোস্বামীদের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে দেশে গিয়েছেন। একটি অবিবাহিতা এম, এ, পাস মেয়ে কালীয়দহের শ্রীল প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজের নিকটে উপদেশ গ্রহণ ক'রে শ্রীবৃন্দাবনে নির্জনে থেকে কঠোর সাধন আরম্ভ করেছেন।

ফালগুণ মাস, দোলের হোলি আরম্ভ হয়েছে। ব্রজমণ্ডলে ঝুলন ও হোলি পল্লী-অঞ্চলের বড় উৎসব। দু'টো উৎসবই পনরো দিন ধ'রে চলে।

ব্রজে হোলি উৎসবের বৈশিষ্ট্য আছে। এক গ্রামের পুরুষেরা দলবেঁধে ঢোলক বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে যায় আর এক গ্রামে হোলি খেলতে। সে গ্রামের মেয়ে-বউরা গ্রামের প্রবেশ মুখে দেয় বাধা। পুরুষদের হাতে থাকে আবির ও রং-পিচকারি, মেয়েদের হাতে থাকে ছোট ছোট লাল লাঠি। উভয় পক্ষে চলে তীব্র সঙ্ঘর্য। পুরুষেরা গ্রামে প্রবেশ ক'রবেন, মেয়েরা ভিন্নগ্রামের পুরুষদের গ্রামে প্রবেশ ক'রতে দেবেন না। উভয় পক্ষে রং-পিচকারি ও লাঠির প্রয়োগ বেশ ভালভাবেই হয়।

এই হোলি সঙ্ঘর্ষের শেষ ফল হয়, জয়ী পক্ষকে পরাজিত পক্ষথেকে পরদিন ভূরিভোজ খাওয়ানো। মেয়েদের লাঠির চোটে পুরুষেরাই পরাজিত হন। যে জায়গায় পুরুষদল জেতেন, সেখানে প্রায়ই দেখা যায়, গ্রামের কোনো পুরুষের কারসাজি আছে। এপ্রকার ঘটনায় যদি সেই অপরাধী মেয়েদের কাছে ধরাপড়েন, তবে এক বৎসরকাল কোনো মেয়ে তাঁর খাদ্য পরিবেষণ করেন না, কাপড় ধুয়ে দেন না। তাঁকে নিজহাতে খাবার নিয়ে খেতে হয়, কাপড় কাচতে হয়।

এই ধরণের হোলিখেলায় রতিয়া যোগদেয় না। অন্ধ রতিয়ার হাতের লাঠি যদি বেকায়দায় পড়ে, তবে অনর্থ ঘটতে পারে। ঝুলনের মত হোলিতেও ব্রজে মেয়েরা গান গায়। সেই গানের জন্য রতিয়ার খুব আদর আছে। রতিয়া আমাকে সাথে নিয়ে নিমন্ত্রণে যায়। গোবর্ধনের চারপাশে যত গোপপল্লী আছে, সব পল্লীর স্ত্রীপুরুষ সকলেই আমাকে চিনে ফেলেছেন। আমার পরিচয়—পণ্ডিত বাবাজীমহারাজের ছাত্র, রতিয়ার ভাইয়া। সকলেই জানেন আমি গৃহী ব্রাহ্মণসন্তান। আমার

পরণ-পরিচ্ছদও গৃহীবৈষ্ণবের মত, নয়হাতী ধুতি আর হাতকাটা একটা বেনিয়ান, শীতের সময় কম্বল বালাপোষ গায় দিই।

রতিয়ার সাথে এক একদিন এক এক গ্রামে হোলি খেলতে যাই। রতিয়ার ভাইয়া, কাজেই গ্রামের সমস্ত বউ-মেয়েদেরও ভাইয়া, রঙের আক্রমণটা হয় ভয়ানক। গ্রামে প্রবেশ করে আধঘণ্টার মধ্যেই ভূত হয়ে যাই।

বহিনদের রঙের অত্যাচার অপেক্ষাও খাওয়ানোর অত্যাচার মারাত্মক। একদিনে একগ্রামে যে পরিমাণ খাদ্য সম্মুখে আসে, তার সব বাদ দিয়ে কেবল দুধের মোটা সরগুলো সংগ্রহ ক'রে ঘি করলে, আমার এক মাসের দু'বেলা লুচি খাওয়া চলতে পারে। বহিনেরা বুঝতেই চান না যে, পেটটা আমার রবারের বেলুন নয়। না-খাওয়ার জন্য সকলেই অভিমানে মুখ ফোলান।

পঞ্চমদোলের দিন গেলাম রাধাকুণ্ডে। রাধাকুণ্ডে রতিয়ার মামাবাড়ী। জয়পুরের মহারাজা সপরিবারে তীর্থে এসেছেন। রাস্তার ধারে বড় বড় তাঁবু পড়েছে।

মামাবাড়ী হোলির মাতামাতি খুবই হল। সন্ধ্যার পূর্বে কুণ্ডে স্নান ক'রে তীরেই গাছতলায় বসলাম। রতিয়া বাড়ীতে স্নান ক'বে তার মামাত বোনের হাতধরে এসে পাশেই বসল।

রাধাকুণ্ডে বহুলোক স্নান করছেন। তীরের গাছ হতে দলে দলে বানর লাফিয়ে প'ড়ে সাঁতার কাটছে, আবার গাছে উঠে লাফিয়ে জলে পড়ছে। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের মাঝে স্বল্পপরিসর বাঁধানো জায়গাটা কানাত দিয়ে ঘেরা হয়েছে। জয়পুরের মহারাণীরা পাল্কিতে এসে কানাতের মধ্যে স্নান করছেন। বসে বসে এই সমস্ত দেখছি।

রতিয়া বলল—ভাইয়া, তুমি যে কথা বলছ না? অসুখ ক'রেছে না কি?

না বহিন, অসুখ করে নি। তবে তোমাদের রং দেওয়া আর খাওয়ানোর ঠেলায় একটু কাহিল হ'য়ে পড়েছি।

রতিয়া একটু হেসে বলল—আমার গান শুনলে না কি তোমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হ'য়ে মন ভাল হয়? আমি তোমাকে একখানা গান শুনাই।

রতিয়া গান ধরল। ঝুলন ও হোলির নিমন্ত্রণে যেয়ে গায় পল্লীগীতি, বাবাজীমহারাজের নিকটে যে গান সে শিখেছে, তা গায় না। সে দিন রাধাকুণ্ডের তীরে বসে গাইল জয়দেবের গীত-গোবিন্দের গান।

দু'মিনিটের মধ্যেই বানরের লাফালাফি, মানুষের স্নান, সব বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তায় মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জয়পুরের কানাত জায়গায় জায়গায় ফাঁক হয়েছে। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের ওপর দিয়ে গানের সুর যেন ঢেউ খেলতে লাগল।

গান শেষ করেই রতিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল—চল ভাইয়া, মামাবাড়ীতে দেখা করে বাড়ী যাই।

গোবিন্দকুণ্ডের কাছে এলে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদ দেখা দিল। রতিয়াদের বাড়ীর রাস্তায় এসে বললাম—বহিন, এখন তুমি বাড়ী যাও, আমি আশ্রমে যাই।

নাঃ। তোমার সাথে আশ্রমে যেয়ে পণ্ডিতবাবাকে প্রণাম করে আসি।

অনেক রাতে হবে যে?

আমার তো ভাইয়া, রাত দিন সবই সমান।—তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল, আমারও রাত-দিন, শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ আছে।

সে কেমন?

বাবাজীমহারাজ আমার দিনের সূর্য, তুমি আমার রাতের চাঁদ।

আমি হেসে বললাম—তা হলে বহিন, বাবাজীমহারাজরা ছাড়াও অন্য মানুষও ভাল হতে পারে?

দেখ ভাইয়া, সে কথা যদি বল, তবে অন্য উপমা দেব। বাবাজী মহারাজদের মত মহাতমারা হচ্ছেন দুধ, তোমরা জল। দুধে কেউ ডুবে

ম'রেছে ব'লে শুনি নি, জলে কিন্তু অনেক ডুবে মরে। তাই বলে জল না হলেও তো চলে না!

পঞ্চম দোলের পরদিন গৌরীকুণ্ডে যাওয়ার কথা ছিল। আমাদের পড়া শেষ হলে আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। রতিয়া এসে জানাল, সে দিন সে কোথাও যাবে না, শরীর অসুখ করেছে, সারাদিন শুয়ে ঘুমাবে।

শুনে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম —কি রকম অসুখ বহিন?

তা দিয়ে তোমার দরকার কি? শরীর থাকলেই অসুখ হয়। এই হোলির ঝামেলাটা কি কম? তুমিও আজ বিশ্রাম কর। দুপুরে রোদে কোথাও বেরিও না। আমি দুপুরে এসে দেখে যাব তুমি কি করছ। দু'দিন আর কোথাও হোলি খেলতে যাব না।

বুঝলাম অসুখের হেতু কি।

শ্রীরাধাগিবিধারীলালের বাল্যভোগের প্রসাদ পাচ্ছি। প্রসাদের আয়োজনটা ছিল লোভনীয়। মথুরার এক ধনী দু'দিন যাবৎ শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের সেবা করছেন। আমরা অনেকগুলি প্রসাদের ভক্ত জুটেছি। এমন সময় একখানা মটরগাড়ী এসে রাস্তায় থেমে গেল। গাড়ী থেকে নেমে এলেন জয়পুরের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও এক রাধাকুণ্ডবাসী ব্রাহ্মণ পাণ্ডা।

আশ্রমে এসে শ্রীমন্দিরে প্রণাম করে পণ্ডিতমহারাজকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। পণ্ডিতমহারাজের নির্দেশে টোলঘরে এনে তাঁদের বসালাম। পাণ্ডাজী ছেঁড়া খেজুরের মাদুরেই বসলেন। সেক্রেটারী মাদুর একটু সরিয়ে মাটিতে বসলেন। আমি আপত্তি করতে বললেন—যে আসনে বৈষ্ণব-পণ্ডিতেরা বসেন, সে আসনে বসার যোগ্যতা তাঁর নেই। বরং ঘরের মাটিতে বসে যদি বৈষ্ণব-চরণ-রজ একটু গায় লাগে, কৃতার্থ হবেন।

পণ্ডিতমহারাজ মন্দিরে সেবায় ছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে আসা সম্ভব নয়। সেক্রেটারী মহাশয় আমাকে টোলের পড়াশুনা সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সাধ্যমত সমস্ত জানালাম।

আমরা কেউই উপাধি প্রাপ্তির জন্য পড়ি নে শুনে খুব খুশী হলেন। আলমারির বইগুলি দেখলেন। বইগুলির বেশীর ভাগ বাংলা দেশের ত'ড়াশের জমিদার ও কাশিমবাজারের জমিদার মহাশয়দের দান শুনে, তাঁদের যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে বঝলাম, লোকটি কেবল উচ্চশিক্ষিতই নন, বেশ সজ্জন ও বিনয়ী।

পণ্ডিতমহারাজ শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের ভোগ লাগিয়ে দরজা বন্ধ করে এসে বসলেন। সেক্রেটারীমহাশয় হাত জোড় করে নিবেদন করলেন—গতকাল আপনার ছাত্রী রতিয়াবাঈ রাধাকুণ্ডের তীরে বসে যে অপূর্ব গান গেয়েছেন, তা জয়পুরের মহারাণীমায়েরা ও মহারাজা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। এ প্রকার গান, এ প্রকার চমৎকার কণ্ঠস্বর তারা কোথাও শোনেন নি। তাঁরা সকলেই আপনার শ্রীচরণে নিবেদন জানাচ্ছেন—আপনি যদি কৃপা করে একদিন সহর বৃন্দাবনে মহারাজার প্রাসাদে চরণ ধূলি দিয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরে আপনার ছাত্রীর গান শুনান, তবে রাণীমায়েরা ও মহারাজা বিশেষ অনুগৃহীত হবেন।

পণ্ডিত মহারাজ সাথে সাথেই উত্তর দিলেন,—সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেক্রেটারী বললেন,—আমাদের মহারাজা তা আগেই অনুমান করেছেন। পণ্ডিতবাবাজী মহারাজের চরণধূলি পড়ার মত স্থান মহারাজার মত বিষয়ীর প্রাসাদ নয়। সে জন্য তিনি আর একটি প্রস্তাব করেছেন, সহর বৃন্দাবনে শ্রীমীরাবাঈর কুঞ্জে যদি আসর হয়, এবং সে আসরে বিশিষ্ট বৈষ্ণব ও গোস্বামী ভিন্ন অপর কাউকে যদি প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়, তবে পণ্ডিতমহারাজ অনুগ্রহ করবেন কি না?

পণ্ডিতমহারাজ বললেন—এ প্রস্তাব একটু ভেবে দেখতে হবে। আপনি দশম দোলের পরে আসবেন। মহারাজাকে জানাবেন, শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের ইচ্ছায় যদি যেতেই হয়, তবে বেলা সাড়েদশটার পর যাব, এবং সন্ধ্যা সাতটার পূর্বে এসে আরতি করব। এই প্রকার ব্যবস্থা করতে হবে।

সেক্রেটারী আনন্দিত হয়ে বললেন—আপনি যা আদেশ করবেন, মহারাজা তাই পালন করবেন। মহারাজা আপনাদের সেবক। আমি একাদশীর দিন এসে আপনার আদেশ গ্রহণ করব।

সেক্রেটারী মহাশয় ও রাধাকুণ্ডবাসী ব্রাহ্মণ প্রণাম করে বিদায় হলেন। আমার পিছনে বসেছিল রতিয়া, দেখলাম ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমি পণ্ডিত মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললাম—রতিয়া বড়ো ভয় পেয়েছে, ভয়ে দেখুন ঘেমে উঠেছে।

স্নেহ কোমল কণ্ঠে বাবাজীমহারাজ বললেন—ভয় কি মা! এতে ভয় পাবার কি আছে? যদি শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের ইচ্ছায় যেতেই হয়, আমি তোমার সাথে থাকব, তোমার ভাইয়া থাকবে। ভয় কিসের!

রতিয়া নীরবে বাবাজীমহারাজকে প্রণাম ক'রে বাড়ী চলল। আমিও তার সাথে কিছুদূর গেলাম।

পথে জিজ্ঞাসা করলাম—বহিন, তুমি অত ভয় পেলে কেন?

রতিয়া উত্তর দিল—বৃন্দাবনে যেয়ে গান করতে হবে বলে আমি ভয় পাই নি। তুমি আর পণ্ডিতবাবা কাছে থাকলে আমি আগুনের মধ্যে বসে গান গাইতে পারি। আমার ভয় হয়েছিল অন্য কারণে। পণ্ডিতবাবা আমাকে তাঁর কাছে শেখা গান একমাত্র শ্রীগিরিধারীলাল ও ভক্ত বৈষ্ণবদের সম্মুখে গাইতে আদেশ করেছেন। অন্যত্র গাওয়া নিষেধ ছিল। রাত্রে যে গোবিন্দ কুণ্ডের তীরে বসে গাই, সেও তাঁর অনুমতি পেয়েছি ব'লে গাই। তুমি এখানে আসার পূর্বে, এ নিয়ম আমি কিছুতেই লঙ্ঘন করি নি। তোমার পাল্লায় প'ড়ে দু'দিন সে নিয়ম ভঙ্গ করেছি। সেই জন্যই আমার দারুণ ভয় হয়েছিল।

গান গাওয়া যদি তোমার নিষেধ থাকে, তবে গাইলে কেন?

দু'দিনই আমি পণ্ডিতবাবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

ভুল হবার কারণ?

অবতার পরিক্রমার দিন তুমি তাদের সাথে যে রকম ঝগড়া বাধালে, তাতে আমার ভয় হয়েছিল। তোমাদের ঝগড়া থামানোর জন্যই সে দিন গেয়েছিলাম। গত কাল তোমাকে বড় অসুস্থ ব'লে মনে হচ্ছিল। তাই তোমাকে একটু খুশী করার জন্য গেয়েছিলাম।

(১৩)

একাদশীর দিন মহারাজার সেক্রেটারী এলেন। পণ্ডিতমহারাজ জানালেন, ত্রয়োদশীর দিন সাড়েদশটার পর আমরা তিনজন যাব। মীরাবাঈএর কুঞ্জে গান হবে। বাজিয়ে ও শ্রোতা মহারাজাই নির্বাচন করবেন।

ত্রয়োদশীর দিন দশটার সময় মটরগাড়ী এল। বাবাজীমহারাজ সাড়েদশটায় ভোগ-আরতি শেষ করে ছাত্র গোসাঁইকে আশ্রমে রেখে, আমাদের দু'জনকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী বারোটার মধ্যেই সহর বৃন্দাবনে পৌঁছে গেল।

'মীরাবাঈএর কুঞ্জ' নাম শুনে মনে ভেবেছিলাম স্থানটি বোধহয় লতা পাতায় ঢাকা কুঞ্জকুটির হবে। সেই কুঞ্জে গাছের তলায় গানের আসর বসবে। ওঃ বাবাঃ, কলকাতার লাল দিঘি যেমন লাল নয়, তেমনি সহর বৃন্দাবনের কুঞ্জও কুঞ্জ নয়! এক একটা বিরাট বাড়ী। লতা পাতা, গাছগাছালি খুঁজলে টবে দু'চারটে দেখা পাওয়া যেতে পারে। পরে দেখেছি শ্রীরাধারাণীর 'সেবাকুঞ্জ ও নিধুবনে' কুঞ্জের মত কতকটা আছে।

মীরাবাঈএর কুঞ্জে সে দিন সমস্ত সেবার ব্যবস্থা করেছেন জয়পুরের মহারাজা। মহারাজা নিজে পণ্ডিতবাবাজীকে অভ্যর্থনা করে গাড়ীথেকে নামিয়ে সুসজ্জিত নাটমন্দিরে বসালেন। ঘোমটা দেওয়া এক মহিলা এসে, রতিয়ার হাত ধরে নামিয়ে অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন। পণ্ডিতমহারাজ আমাকে তাঁর বেদান্তের ছাত্র বলে সকলের সাথে পরিচয় করে দিলেন।

ভোগ হয়ে গিয়েছে। বহুলোক প্রসাদ পাচ্ছেন। নানা ধরণের বৈষ্ণবও দেখলাম। কয়েকজন বৈষ্ণব ভোজনে বসে সম্মুখের পরাত থেকে কিছু কিছু প্রসাদ শালপাতায় তুলে নিয়ে খেয়ে পাতা খানা বাইরে ফেলে দিলেন। এঁদের খাওয়া স্বাভাবিক, মিষ্টান্নাদি খেতে দেখলাম না সাদা-অন্ন শাক ডা'ল দইএর মধ্যেই খাদ্য তালিকা সীমাবদ্ধ।

কতকগুলি বৈষ্ণব দাঁড়িয়ে দু'হাত পেতে মাখানো প্রসাদ একদলা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই খেয়ে চলে গেলেন। শুনলাম এঁরা কোথাও বসে পাতা পেতে খান না, এবং এক বাড়ীতে এক দলার বেশী খাদ্য গ্রহণ করেন না। মিষ্টান্ন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য—এমন কি প্রসাদ মিষ্টান্নও গ্রহণ করেন না।

আর কতকগুলি বহির্বাস ও মালাতিলকধারী বৈষ্ণব নাটমন্দিরের একদিকে বসে প্রসাদ পাচ্ছেন। এঁদের অনেকেরই সুন্দর তেল কুচকুচে ভুঁড়ি আছে। তাঁদের সেবানন্দ দেখে বুঝলাম এঁরাই 'খোঁটের বাবাজী'। খোঁটের বাবাজী মানে, নিমন্ত্রণে প্রসাদ পেতে বসে যখন পরণের বহির্বাসে টান ধরে, তখন বহির্বাসের খোঁট খুলে একটু ঢিলে ক'রে নেন; যে বাবাজী যতবার খোঁট খুলে বহির্বাস ঢিল করেন, তিনি তত খোঁটের বাবাজী।

অনেকগুলি গোস্বামী প্রভুর প্রসাদ পাওয়াও দেখলাম। কলকাতার এ্যারিস্টক্র্যাট বাবুদের নিমন্ত্রণ-রক্ষার মত গোস্বামী প্রভুরাও না-খাওয়ার কসরৎ দেখিয়ে যা খেলেন, তার বহুগুণ ছেনে চটকিয়ে নষ্ট করে গেলেন। ভাবটা যেন—তাঁদের বাড়ীতে রোজই এ সমস্ত তাঁরা খান। অবশ্য কোনো অবস্থাতেই গোস্বামী প্রভুদের পাতের ছেনা-চটকা প্রসাদ নষ্ট হয় না। তাঁদের ভক্তবর্গ—বিশেষ করে ভক্তিমতীরা প্রভুর প্রসাদ পেয়ে ধন্য হন।

আমি ও পণ্ডিতমহারাজ কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে একটা ঘরে প্রসাদ পেতে গেলাম। এক এক জনের সম্মুখে দু-দু'খানা বড় পরাত ভরা প্রায় শতাধিক রকমারি প্রসাদ। দই রায়তা রাবড়ি জাতীয় প্রসাদ

পাতার দোনায় দেওয়া হয়েছে। মহারাজা নিজে এসে সম্মুখে বসলেন। পণ্ডিতমহারাজ একখানা শালপাতায় সাদা-অন্ন শাক তরকারি ডাল আর দই নিলেন। পাঁচ দফার বেশী প্রসাদ তিনি কোথাও গ্রহণ করেন না। মিষ্টান্নাদিও খান না। আশ্রমে যেমন প্রসাদ পান, এখানেও ঠিক সেই প্রকারই গ্রহণ করলেন। এর জন্য মহারাজাও কোনো অনুরোধ করলেন না। পরে জেনেছি—যে বৈষ্ণব যে প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করেন, অপর কেউ সে নিয়মের ওপরে অনুরোধের হস্তক্ষেপ করেন না।

আমি আরম্ভ করলাম কচুরি দিয়ে, শেষ করলাম চাটনি চেটে। অগ্র পশ্চাৎ কোনো নিয়ম কানুন মানলাম না। ডাল তরকারি ভাত লুচির কাছেও গেলাম না। রকমারির অর্ধেকও চিনি নে। যে গুলো চিনি, তার মধ্যে সবচাইতে পসন্দসই গুলোই চালালাম। তাতেও অর্ধেক অতিক্রম করতে পারলাম না। মনে বড় আফসোস হল, আহাঃ আমি যদি আজ একটা দিনের জন্যও খোঁটের বাবাজী হতে পারতাম!

প্রসাদ পেয়ে একটা ঘরে যেয়ে বসলাম। দু'একজন ক'রে বহু ব্যক্তি পণ্ডিত মহারাজকে দণ্ডবৎ করে গেলেন। পণ্ডিত মহারাজও প্রত্যেককে দণ্ডবৎ করলেন। আমিও তাঁর দেখাদেখি সকলকে দণ্ডবৎ করলাম।

প্রায় তিনটের সময় এলেন এক সাধু মহাত্মা। ও প্রকার সাধু পূর্বে কোথাও দেখি নি। মাথায় পাঞ্জাবী-পাগড়ি, গায়ে রেশমের ওপরে সোনার জরির কল্কাদার আলখাল্লা, পরণে সুতীর উৎকৃষ্ট ধুতি, কানে হীরের ফুল, হাতে মূল্যবান হীরে বসান পাঁচ-সাতটা আংটি। সবচাইতে অপূর্ব তাঁর গায়ের উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, আর অদ্ভুত তাঁর চোখের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন সব বাধা অতিক্রম ক'রে সবকিছু তাঁকে জানিয়ে দেয়।

বাবাজীমহারাজ পরিচয় করলেন—ইনিই শ্রীমৎ হরানন্দ পরিব্রাজক। এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ বাদক, এবং একজন বড় কালোয়াত।

উঠে প্রণাম করলাম। পরিব্রাজকমহারাজ মাথায় হাতদিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন—বাবা, কোনো চিন্তা কোরো না। আমি তোমার জন্য চেষ্টায় আছি। সমস্ত ঠিক হ'য়ে যাবে।

বেলা তিনটেয় শ্রীমন্দির খোলা হল, সাড়ে তিনটেয় গান আরম্ভ হবে। আমরা দশমিনিট পূর্বে আসরে গেলাম। প্রায় পাঁচশ-ত্রিশ জন বৈষ্ণব ও গোস্বামী শ্রোতা উপস্থিত হয়েছেন। অনিমন্ত্রিত কাউকেও প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

নাটমন্দিরের একপাশে চিক পড়েছে। সেখানে মহিলাদের স্থান। মন্দিরেব সম্মুখে দরজা বাদদিযে দু'পাশে চিকের আড়ালে রাজপরিবারের মহিলাদের বসার ব্যবস্থা।

ঠিক সাড়েতিনটের পাঁচমিনিট পূর্বে রতিয়া একটি মহিলার হাতধ'রে আসরে এসে প্রণাম ক'রে নির্দিষ্ট আসনে বসল। তাকে দেখে চমৎকত হলাম। পরণে সোনার জরি-চুম্‌কির কাজকরা সবুজরঙের ঘাগরা আর গোলাপী ওড়না। গায়ে সোনার গহনার সাথে ফুলের গহনা প্রতিযোগিতা করছে। সাজলে রতিয়া যে এত সুন্দর হতে পারে, তা ধারণায়ই ছিল না। শুনলাম, রাণীমায়েরা এই পোষাক ও গহনা রতিয়াকে উপহার দিযে, নিজ হাতে সাজিযে দিয়েছেন।

সমস্ত ব্যাপাবটা ভালকরে দেখব বলে আমি নাটমন্দিবের একপাশে সকলের পিছনে বসেছিলাম। কিন্তু তা সম্ভব হল না, রতিয়া তার আসনে ব'সে পণ্ডিতমহারাজকে বোধহয় আমার কথা বলল। আমাকে যেয়ে রতিয়ার পিছনে বসতে হল।

বাবাজীমহারাজের সম্মুখে দু'খানা তানপুরা। হরানন্দ পরিব্রাজক মহারাজ নিয়েছেন পাখোয়াজ, এক জটাধারী সন্ন্যাসী বৈষ্ণব মহারাজের হাতে সারেঙ, এক বৃদ্ধ গোস্বামীপ্রভু ধরেছেন বীণা।

সাড়েতিনটে বাজার সাথে সাথে মহারাজা এসে দণ্ডবৎ ভুমিষ্ঠ হয়ে সমাগত বৈষ্ণব-সভাকে প্রণাম করে তাঁর আসনে বসলেন। মন্দিরের পূজারী মালা চন্দন ও চরণতুলসী এনে গোস্বামীপ্রভু হরানন্দ পরিব্রাজক ও রতিয়ার গলায় দিলেন মালা, আর সকলের কপালে চন্দন ও হাতে একপাত চরণতুলসী দিলেন। চরণতুলসী সকলেই খেলেন।

পণ্ডিত মহারাজ তুলে দিলেন সুরবাঁধা তানপুরা রতিয়ার হাতে। লক্ষ্য করলাম রতিয়ার হাত কাঁপছে, গা ঘেমে জামা ভিজে উঠেছে। তানপুরা হাতে নিয়ে পাঁচ মিনিট চলে গেল, রতিয়া গান ধরে না। বুঝলাম, বনের পাখি রাজসভায় এসে কণ্ঠ হারিয়ে ফেলেছে। গোবর্ধন পুছরিতে সে যাই বলুক না কেন, রতিয়া গ্রাম্য মেয়েই। তার ভাব দেখে আমারও গা ঘেমে উঠল।

পণ্ডিত মহারাজ কিন্তু অবিচলিত ভাবে দ্বিতীয় তানপুরাটা হরানন্দ মহারাজের দিকে এগিয়ে দিলেন। হরানন্দ মহারাজ তাঁর পখোয়াজটা পাশের এক সন্ন্যাসী মহারাজকে দিয়ে তানপুরা নিয়ে পণ্ডিত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ধরব বলুন?

পণ্ডিত মহারাজ উত্তর দিলেন—রাগ বসন্তবাহার আলাপ করুন।

হরানন্দ মহারাজ আরম্ভ করলেন সুরালাপ। অপূর্ব সে আলাপ। প্রায় কুড়ি মিনিট সুরালাপ করে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই দেখলাম রতিয়া বসন্তবাহারে গান ধরেছে, জয়দেবের বিখ্যাত পদ—'ললিত লবঙ্গলতা—।'

হরানন্দ মহারাজ আবার ধরেছেন পাখোয়াজ। বীণা সারেঙ বেজে চলেছে। চারজন গায়ক বাদক যেন একাত্মা হয়ে গেলেন। সমস্ত সভাঘরখানা আনন্দে পরিপূর্ণ।

আমি মনটাকে খুব শক্ত ক'রে নিয়েছিলাম, যাতে রতিয়ার গানে তন্ময় না হয়ে অপর সকলের কি ভাব হয়, ত দেখতে পাই। প্রথম গানখানায় বিশেষ অভিভূত হই নি। দ্বিতীয় গানের প্রথম দিকেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখবার মত অবস্থা ছিল। শেষের দিকে নিজের অজ্ঞাতেই সুরসাগরে ডুবে গিয়েছিলাম, পরের গান খানার বেলায় আর তটস্থ হতে পারিনি।

যতক্ষণ চারপাশের অবস্থা দেখার সুযোগ ছিল, ততক্ষণ দেখলাম বাবাজী মহারাজেরা চোখ বুজে স্থির হ'য়ে ব'সে গিয়েছেন। অনেকেরই চোখে আনন্দাশ্রু দেখা যাচ্ছে। কারও দেহ ঈষৎ কাঁপছে। একটি

বাবাজী মহারাজের গায়ে মাঝে মাঝে চিনির বাতসার মত বহু পুলক প্রকাশ পাচ্ছে। এক জটাধারী বাবাজী নানাপ্রকার আনন্দব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী ক'রছেন। জয়পুরের মহারাজা স্থির দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। সকলেরই একটা আনন্দ-জড় অবস্থা।

সাড়ে পাঁচটায় গান শেষ হল। প্রথমেই হরানন্দ মহারাজ পণ্ডিত মহারাজকে বললেন—পণ্ডিত বাবা, আজ আমার পাখোয়াজ শেখা সার্থক হল। এমন সঙ্গৎ আমি আর কোথাও পাই নি।

অপরাপর সকলেই রতিয়াকে আশীর্বাদ ক'রে জয়পুরের মহারাজাকে এই আনন্দের আয়োজন করার জন্য প্রশংসা ও আশীর্বাদ করলেন।

জয়পুরের মহারাজা পণ্ডিত মহারাজকে প্রণাম ক'রে বললেন,—পণ্ডিত মহারাজ, এ রত্ন যদি টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব হ'ত তবে আমি লাখ লাখ টাকা দিয়ে কিনে জয়পুরে নিয়ে যেতাম। আপনি শ্রীরাধাগিরিধারীলালের সেবার জন্য এ অপূর্বরত্ন তৈরী ক'রেছেন। শ্রীরাধারাণীর ব্রজভূমিতেই এ অমূল্য বস্তু শোভা পায়, আমাদের মত বিষয়ীর মধ্যে শোভা পায় না।

মহারাজার কথায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলেন। একটি মহিলা এসে রতিয়ার হাত ধরে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। আমরা দশ বারো জন নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় যে বাবাজী মহারাজের গায়ে বাতসার মত পুলক দেখেছিলাম, তিনি একটি গেরুয়া শাড়ীপরা মেয়ের সাথে, আমাদের সম্মুখে এলেন।

মেয়েটিকে চিনলাম। সেই অবতার-পরিক্রমার দিন ইনিই আমাকে অবতারের সাথে আলাপ করার অনুরোধ ক'রে, শেষ পর্যন্ত আমাদের অবতারের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। পণ্ডিত মহারাজের কথায় পরিচয় পেলাম, এই বাবাজী মহারাজই কালীয়দহের শ্রীল প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ।

মহিলাটি এসেছেন আমার ও রতিয়ার সাথে দেখা করে ক্ষমা চাইতে। তাঁর মুখে সংক্ষেপে যা ঘটনা শুনলাম তা হচ্ছে, তিনি দর্শন শাস্ত্রে

এম, এ, পাস ক'রে আসামে কোনো কলেজে অধ্যাপিকা ছিলেন। তারপর অবতার-বাবার পাল্লায় প'ড়ে গেরুয়া প'রে, তথাকথিত সন্ন্যাসিনী হন। সে দিনের সেই তর্কবিতর্ক ও রতিয়ার গান শুনে, তাঁর মন পরিবর্তিত হ'তে থাকে। শেষপর্যন্ত অবতারবাবা আমাদের দু'জনকে তাড়িয়ে দিয়ে, তাঁর নিকটে জোর কৈফিয়ৎ তলব করেন, কেন আমাদের মত নাস্তিক পাষণ্ডদেব তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হ'য়েছে। তিনিও কৈফিয়ত দেন। ফলে গুরুতর কলহ বাধে। দলের কিছু সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা মেয়েটির পক্ষ সমর্থন করেন। শেষপর্যন্ত কোনো মীমাংসা হয় না। রাত্রি প্রভাতে দলের প্রায় অর্ধেক পুরুষ ও মহিলা, দলত্যাগ করেন। দলত্যাগীদের বেশীরভাগ দেশে চ'লে যান। একুশজন সহর বৃন্দাবনে এসে গোস্বামী প্রভুদের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে দেশে গিয়েছেন। এই মহিলাটির আর সংসারে ফেরার ইচ্ছা নেই। শ্রীল প্রাণকৃষ্ণদাস বাবাজীমহারাজের চরণে অনেক কাঁদাকাটি করে আশ্রয় পেয়েছেন। বাবাজীমহারাজের নির্দেশমত একাকী নির্জনে থেকে, প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম জপ ক'রছেন। এখানে এসেছেন রতিয়া ও আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। আর সেদিন যে অবতার প্রভু আমাদের অপমান ক'রেছিলেন, তারজন্য ক্ষমা ভিক্ষা ক'রতে।

মহিলাটি পণ্ডিত মহারাজকে প্রণাম ক'রে আমাকেও একটা প্রণাম ক'রলেন। তাঁর জীবনের এই অভাবনীয় পরিবর্তনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, তিনি অবতারবাবার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে কিছুদিন পর থেকেই দারুণ মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলেন। এখন মনের শান্তি ফিরিয়ে পেয়েছেন, আর পেয়েছেন পবিত্রতা বোধ।

শান্তি যে তিনি পেয়েছেন তা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝলাম অবতারবাবার সাথে থেকে লুচি পোলাও পাঁউরুটি মাখন খেয়েও যে কান্তি প্রকাশ পায় নি, এখানে বাবাজীমহারাজের আশ্রয়ে শুখনো রুটি চিবিয়ে তা ফুটেছে। যদিও দেহের ওজন খানিকটে কমেছে।

রতিয়ার সাথে মহিলাটি দুটো কথা বলার আকাঙ্ক্ষা জানালেন। একটু পরেই রতিয়া একগাদা ফুলের তোড়া ও মালা নিয়ে উপস্থিত হল। মহিলাটির সাথে পরিচয় ক'রে দিলাম। রতিয়ার দু'কাঁধের ওপরে দু'হাত রেখে বললেন—বহিন, তোমাদের জন্যই আজ আমি প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়েছি। ইত্যাদি।

গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। মহারাজা এসে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে প্রণাম ক'রে বিদায় দিলেন। হারানন্দ প্রভু গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে আমাকে বললেন—তোমার জন্য লালবাজারে চেষ্টা হ'চ্ছে। কাগজপত্রে এপর্যন্ত তোমার সম্বন্ধে যা পাওয়া গিয়েছে, তাতে মারাত্মক কিছু নেই। আরও কিছু ফাইল রেকর্ড দেখতে হবে। আশাকরি শীঘ্রই পুরো সংবাদ পাব। তুমি ভেব না।

ভাবনা আমার মোটেই নেই। এই দিনের মত একটি দিনের আশায় মানুষ চিরনির্বাসন ভোগ করতে পারে।

সন্ধ্যা ছয়টা বেজে দশ মিনিট। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। সাতটায় আশ্রমে পেঁছাতে হবে।

(১৪)

সহরবৃন্দাবন হ'তে ফেরার পরদিন প্রাতে টোলের পড়া শেষ হ'য়েছে। ছাত্র গোসাঁই রান্না করছেন। পণ্ডিত মহারাজ তাঁর নিয়ম মত বৈষ্ণবদর্শনে গিয়েছেন। আমি টোল ঘরে বসে গতকালের ঘটনা ভাবতে ভাবতে পড়া মুখস্থ করছি। রতিয়া এসে পাশেই বসল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেসে বলল—ভাইয়া, তুমি যদি এক শ' বছরও এই রকম মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা কর, তাতেও কিছু শিখতে পারবে না। তুমি ভারী অন্যমনস্ক

আমি বললাম—বল তো, আমি কি ভাবছি ?

তুমি ভাবছ, আবার কবে কোন রাজা মহারাজা বড়লোক

রতিয়ার গান শোনার নিমন্ত্রণ ক'রবে। তাহলে তুমি সাথে যেয়ে রাক্ষসের মত এলোপাতাড়ি রাজভোগ খাবে, আর কাছে ব'সে গান শুনবে।

তোমার কথা সবই স্বীকার করছি। কিন্তু আমি যে এলোপাতাড়ি খেয়েছি, তা তুমি জানলে কি করে?

রাণীমায়েরা তোমাব খাওয়া দেখে বলাবলি কবছিলেন।

তুমি শুনে কোনো উত্তর দিলে না?

না দিয়ে আর পারলাম কই।

কি উত্তর দিলে?

বললাম,—আমার ভাইয়া গৃহী হ'লেও পবম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবেরা প্রসাদের ভালমন্দ বিচার কবেন না। হাতেব কাছে যে প্রসাদ পান, তাই অমৃত মনে ক'রে গ্রহণ করেন। যাঁরা ভালক'রে বৈষ্ণবসেবা ক'বতে চান, তাঁরা নিজেরাই কোন প্রসাদের পর কোনটা খেতে হবে তার ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে দেন। আমার ভাইয়া হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই খেয়েছে।

তোমার কথা শুনে রাণীমায়েরা কি বললেন?

কি আবার ব'লবেন! লজ্জিতা হলেন, ক্ষমা চাইলেন। এখন ও সমস্ত কথা থাক, আমি যা বলতে এসেছি তাই শোনো। তোমার ও মনস্কামনা কিন্তু আর পূর্ণ হবে না। আমি আর কোনো দিন কোথাও এইপ্রকার গান গাইতে যাব না।

বাবাজীমহারাজ যদি আদেশ করেন?

সেই জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি। আমি পণ্ডিতবাবাকে এ কথা ব'লতে পারব না। তুমি তাঁকে কথাটা বল।

টোলঘরে বসে আমরা দু'জনে যখন এই নিয়ে আলোচনা করছি, তখন পণ্ডিত মহারাজ বৈষ্ণবদর্শন ক'রে ফিরলেন। আমরা দুই ভাই বোনে উঠে প্রণাম ক'রতেই ব'ললেন—রতিয়া, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। আমরা আর কোথাও কোনো দিন গান গাইতে যাব না।

তুমি একমাত্র এই শ্রীরাধা-গিরিধারীলালকে গান শোনাবে। কারও যদি ভাগ্যে থাকে এখানে এসে গান শুনবে। শ্রীরাধা-গিরিধারীলালকে ছেড়ে গান গাইতে আমরা আর কোথাও যাব না।

রতিয়া আনন্দে কেঁদে ফেলল, আমি বিস্মিত হলাম। বাবাজী মহারাজ কি সর্বজ্ঞ ?

রতিয়ার আশঙ্কা যে সত্য, তা কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমাণ হ'য়ে গেল। মথুরা আগ্‌রা প্রভৃতি বহু স্থান হতেই গানের অনুরোধ আসতে লাগল। পণ্ডিত মহারাজ অটল অচল। কোনো প্রকার অনুরোধ উপরোধই কার্যকর হল না।

মাসখানেক পরে আর এক উপদ্রব দেখা দিল। রতিয়ার স্বামী ও শ্বশুর ধোবাফেরা আরম্ভ ক'রলেন,—অনেকে তো দুটো তিনটে বউ নিয়েও সংসার করে ?

রতিয়ার মা তাঁদের কোনো কথারই আমল দিলেন না। শেষ পর্যন্ত বাপ-বেটা দুজনে এলেন পণ্ডিত মহারাজের নিকটে।

বাবাজী মহারাজ আমাকে পাঠালেন রতিয়াকে ডাকতে। পথে আমি সমস্তই বললাম। রতিয়া একটি কথাও বলল না। আশ্রমে এসে বাবাজী মহারাজকে প্রণাম করে, তিনি কথা বলার আগেই অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলল,—

পণ্ডিত বাবা, শ্রীরাধাগিরিধারীলাল আপনি আমার মা, আর ভাইয়া ছাড়া এ জগতে আমার আর কেউ নেই। আমি আর কাউকে, চিনি নে, চিনতে চাইও না। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। এ বিষয়ে যদি আমার রুচির বিরুদ্ধে কোনো আদেশ করেন, তবে গোবিন্দকুণ্ডের জলের তলে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় থাকবে না।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে রতিয়া নির্বিকার পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। পণ্ডিত মহারাজও যেন রতিয়ার কথা ও ভাবে বিস্মিত হ'লেন। কিছুক্ষণ রতিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে স্নেহকোমল

মৃদুকণ্ঠে বললেন,—যাও মা, বাড়ী যাও। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে কোনো আদেশ ক'রবে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি জন্মেছ শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের সেবা ক'রতে, সে সেবার বাধক কিছু ঘটবে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যাও।

রতিয়া চলে গেলে পণ্ডিতমহারাজ মোহন ও তার বাবা'কেও বিদায় দিলেন। তখনকারমত বাপ-বেটা দু'জনে চলে গেলেও বেটা কিন্তু আমাকে কিছুদিন ভুগিয়েছিল। দুপুরবেলা যখন আশ্রমে কেউ থাকে না, তখন মোহন এসে আমার ঘাড়ে চাপে। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি চেষ্টা করলেই রতিযার মন পরিবর্তিত ক'রে দিতে পারি।

মোহন আমার সমবযসী। চেহারায় রতিয়ার স্বামী হিসাবে ভালই মানায়। দুপুরবেলা এসে টোলঘরে আমার কাছে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মনের কথা শুনায। রতিয়াকে সে অত্যন্ত ভাল বাসে। তার জন্যে তা'র প্রাণপাখি ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। রতিয়াদের বহু সম্পত্তি আছে। রতিয়ার মার হাতেও বহু টাকা। এ সমস্তের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী রতিয়া। তারপর সে যদি রতিয়াকে পায়, তবে দিল্লী, আগরা, জয়পুর, ভতরপুর, প্রভৃতি বড় বড় জাযগায় গান শুনিয়ে বহু টাকা রোজগার ক'রে মস্ত বড়লোক হ'য়ে যেতে পারবে। এইরকম কত কি সে আমাকে শোনায়। কিন্তু মজা এই যে, যদি দেখে রতিয়া আসছে, অমনি ছুটে পালায়।

এই প্রকারে মোহনের অনুরোধে অতিষ্ঠ হ'য়ে একদিন রতিয়াকে বললাম—বহিন, মোহন প্রায়ই আমার কাছে এসে, তোমাকে বুঝিয়ে রাজি ক'রে দিতে বলে। তা তার প্রস্তাবে রাজি হলে ক্ষতি কি ? আমার তো মনে হয মোহন তোমাকে ভালও—'।

আর বলা হল না। রতিয়া গর্জে উঠল।—এ সব কথা তোমার মুখে আমি শুনতে চাইনে। তুমি থাম।

বলে রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল।

পরদিন মোহন এলে তাকে বললাম—ভাইয়া, তোমার কথা ব'লতে

যেয়ে মার খাওয়াব যোগাড় করেছিলাম। তোমার পিঠে হয়তো রতিয়ার হাতের কিল দু'চারটে সইবে, আমার পক্ষে ওর একটাই ভবপারে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখনই ওদিকে যাওয়ার ইচ্ছে যখন আমার নেই, তখন তুমি অন্য পথ দেখ। আমাকে দিয়ে ভাই, কিছু হবে না।

(১৫)

দীনবন্ধুদাস বাবাজীমহারাজ ব্রজমণ্ডলে দিনু মহারাজ নামে পরিচিত। ভজন করেন অপ্‌সরাকুণ্ডের নিকটে এক কুটিরে। অতিবৃদ্ধ হয়েছেন, মাধুকরি করার সামর্থ্য নেই। পণ্ডিতমহারাজ তাঁকে একটু দেখা শোনার ভার আমাকে দিয়েছিলেন। প্রাতে যেয়ে কুটিরখানা পরিষ্কার ক'রে জল দিয়ে আসতাম। শ্রীরাধাগিরিধারীলালের ভোগ হ'লে রতিয়া প্রসাদ দিয়ে আসত। সন্ধ্যায় আমি ও রতিয়া দু'জনে যেয়ে আধসের দুধ খাইয়ে, বিছানা ঝেড়ে পেতে দিয়ে আসতাম।

সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত আমার ছুটি। এই সময় দীনু বাবাজীমহারাজের একটু সেবা করে, আমি ও রতিয়া গোবর্ধন পাহাড়ের নানা জায়গা ঘুরে গল্প ক'রে কাটাতাম। রতিয়ার হাত ধরে নেওয়ার দরকার হত না। পথ চলতে আমি আগে যেতাম, রতিয়া আমার পায়ের শব্দ শুনেই, অন্ধকার রাত্রেও পথের উচুনীচু বুঝে চলতে পারত। এমনি ছিল তার অদ্ভুত শ্রবণ শক্তি।

দীনুবাবাজীর কুটিরে যখনই যাই তখনই শুনি, বাবাজীমহারাজ ধীরে ধীরে বলেছেন—'হে ব্রজবাসী ভক্ত বৈষ্ণবগণ তোমরা এ অধমকে কৃপা কর। তোমরা কৃপাকরে শ্রীরাধামদনগোপাল দর্শন করাও।' এ ছাড়া আর কোনো ভজন সাধন তাঁর দেখিনি।

একদিন আমি ও রতিয়া পণ্ডিত মহারাজকে প্রশ্ন করলাম,—অপ্‌সরা কুণ্ডের বাবাজীমহারাজ সব সময় ঐ কথা বলেন কেন? তাঁর তো অন্য কোনো ধ্যান, ধারণা জপ তপ কিছুই ক'রতে দেখি নে!

পণ্ডিতমহারাজ উত্তর দিলেন—এই ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব মহাত্মাদের 'ভজন' পদ্ধতি বিচিত্র। প্রথমদিকের 'সাধন' পদ্ধতি যদিও বা বাইরে কিছুটা বুঝা যায়, কিন্তু ভজন-রীতি বুঝা শক্ত। যাঁরা বেশ খানিকটে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদেব এক একজনের ভজন এক একটা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয। তবে সে বৈশিষ্ট্য কখনও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয না। শ্রদ্ধা-ভক্তিতে অশাস্ত্রীয কোনো কিছুব স্থান নেই। দীনুবাবাজীর ভজন পদ্ধতি যা তোমরা দেখছ, তা শাস্ত্রেই আছে। সাধন ও ভজন দুটো আপাত-দৃষ্টিতে পৃথক ব্যাপার। নিজেব যোগ্যতালাভের জন্য যা করতে হয় তাই সাধন। আব ভজন হ'চ্ছে—শ্রীভগবানকে আপন ক'রে পাবার জন্য তাঁর ওপবে বেশ আধিপত্য আছে—এমন কোনো প্রিয ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। যেমন মনে কর—আই, সি, এস, ম্যাজিষ্ট্রেট পদ পেতে হ'লে প্রথম শ্রেণীব এম্ এ, ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এইটি হল আই. সি, এস,-এর 'সাধন'। এই যোগ্যতা সাধন ক'বে তাবপর যদি দিল্লীর বড়কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তবে আই, সি, এস,-এ প্রবেশাধিকার পাওয়া যায। দিল্লীর বড়কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যা ক'রতে হয়, সেইটি হ'ল 'ভজন'। দীনুবাবাজী মহারাজের সাধন শেষ হ'য়েছে বলেই মনে হয। এখন তাঁর ভজন চলছে।

দীনুবাবাজী ক্রমেই দুর্বল হচ্ছেন। খাওয়াও কমে যাচ্ছে। চৈত্রের মাঝামাঝি একদিন পণ্ডিতমহারাজ বললেন,—দীনুবাবাজী বোধ হয় বৈশাখের প্রথমেই দেহত্যাগ ক'রবেন।

কথাটা ব্রজের সর্বত্র প্রচার হ'য়ে গেল। বহু বৈষ্ণব দীনুমহারাজকে শেষ দেখা দেখতে আসেন। আমাদের টোলে পড়া একপ্রকার বন্ধই থাকল। যাঁরা বহুদূর থেকে আসেন, তাঁদের এক বেলা প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের আশ্রমেই করা হ'য়েছে। আমি ও ছাত্রগোসাঁই রান্না করি। গোসাঁই রাত্রেও আশ্রমে থাকেন। রতিয়াও সারাদিন ও রাত্রি দশটা পর্যন্ত আশ্রমে থেকে বাসন মাজা, ইত্যাদি নানা কাজ করে।

কোনো কোনও বৈষ্ণবমহাত্মার পথপ্রদর্শক হ'য়ে আমি দীনুমহারাজের

কুটিরে যাই। সেখানে বাবাজীর একটা ব্যবহার দেখে একদিন পণ্ডিত মহারাজকে জিজ্ঞসা করলাম—আমি, যে বৈষ্ণবকে দীনুমহারাজের নিকটে নিয়ে যাই, তাঁরই হাতধরে তিনি কাঁদেন আর বলেন,—'আমি বড় অভাগা, আপনাদের মত মহতের সঙ্গ ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আপনাদের কৃপায় যেন জন্মান্তরে আবার মহৎ কৃপাসঙ্গ পাই।' —এ সমস্ত ব্যবহার ও কথার তাৎপর্য কি ?

পণ্ডিত মহারাজ উত্তর দিলেন,—দীনুমহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজীমহারাজের কৃপা পেয়ে এই গোবর্ধনে প্রায় সত্তর বছর যাবৎ সাধন ভজন করছেন। আক্ষরিক বিদ্যা তাঁর কিছু না থাকলেও, ভজন রহস্য তিনি যা জানেন, আমি তা জানি নে। অনেক সময় তাঁর এক একটা কথায় শাস্ত্রের এক একটা সমস্যা—যা আমি সমাধান করতে পরি নি, তা সরল হয়ে গিয়েছে। যে কথা তিনি এখন বলছেন তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আনন্দ-রস-ব্রহ্ম ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আপন করে পাওয়া শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। বহু জন্ম ধ'রে কঠোর সাধন, এবং অকৃত্রিম ভজন ক'রে তবে তাঁকে পাওয়া যায়, বুঝা যায়। এই সাধন ভজনে মহৎ কৃপা ও মহৎ সঙ্গই প্রধান সম্বল। সেই রহস্য ভাল ক'রে জানেন বলেই দীনুমহারাজ ওপ্রকার কাঁদাকাটি ক'রছেন।

বৈশাখ মাসের প্রথমেই দীনুমহারাজের বাহ্যজ্ঞান লোপ হল। দু'তিন মাসের শিশু যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় হাসে, কাঁদে, ঠোঁট নাড়ে, নানা প্রকার মুখভঙ্গী করে, তাঁরও দেখলাম ঠিক সেই অবস্থা। তিন চারদিন পরে ওভাব যেয়ে এল একটা গভীর নিস্তব্ধতা।

প্রতিদিন বহু বৈষ্ণব, গৃহী স্ত্রী-পুরুষ, দেখতে আসেন। আমাদের কাজ অনেক বেড়েছে। প্রত্যহ প্রায় পঞ্চাশটি বৈষ্ণব প্রসাদ পান। ভাগ্যবান তাড়াশের জমিদার রোজ প্রাতে চাল ডাল সমস্ত গাড়ী বোঝাই ক'রে পাঠান। নিকটবর্তী গ্রামবাসীরাও বৈষ্ণব সেবার জন্য অনেক কিছু দেয়। রতিয়া, ছাত্রগোসাঁই, আমি ও আর দুজন বৈষ্ণব ছাত্র, ভোর চারটে থেকে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটি।

আরও কয়েকদিন পরে একদিন বেলা দশটায় পণ্ডিত মহারাজ দীনু-মহারাজকে দেখে এসে জানালেন, 'আজ সন্ধ্যার মধ্যে দীনুবাবাজী আমাদের ত্যাগ ক'রে নিত্যধামে প্রবেশ ক'রবেন।'

বেলা একটার মধ্যে আমরা সমস্ত কাজ শেষ ক'রে রতিয়াকে আশ্রমে রেখে, সকলে গেলাম দীনুমহারাজের ভজন কুটিরে। কুটিরের বারান্দায় বাবাজীকে আনা হ'ল। পণ্ডিতমহারাজ নিজে তিলক-মালা দিয়ে সাজিয়ে কাছে বসে মৃদুকণ্ঠে গাইতে আরম্ভ করলেন,—'জয় রাধা গিরিধারীলাল শ্রীরাধাগিরিধারীলাল।' আমরাও তাঁর সাথে গাইলাম।

বহুলোক মহাপুরুষের দেহত্যাগ দেখতে এসেছেন। কিন্তু কোথাও কোনো কোলাহল নেই। সমাগত ত্যাগী বৈষ্ণবদের কথাবার্তায় ভাবভঙ্গীতে কোনো শোকের ভাব দেখলাম না। স্থানীয় গৃহী অধিবাসীরা কিন্তু শোকাকুল ব'লে মনে হল। কতকগুলি ব্রজমায়ী তো কাঁদতেই আরম্ভ ক'রলেন।

দীনুমহারাজের দেহ ক্রমে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, মুখে একটা গম্ভীর প্রশান্তি। বেলা শেষ হ'য়ে সূর্যদেব লাল ধ'রেছেন। হঠাৎ দীনুবাবাজী চোখ মেলে হেসে নড়েচড়ে উঠে স্থির হ'য়ে গেলেন। পণ্ডিতমহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে দু'ই বাহু ঊর্ধে তুলে উচ্চৈঃস্বরে বললেন,—

শ্রীল চৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজের প্রিয় শিষ্য শ্রীল দীনবন্ধু দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীলালের নিত্য সান্ধ্যলীলায় প্রবেশ ক'রলেন। জয় রাধা গিরিধারীলাল শ্রীরাধা গিরিধারীলাল।

সাথে সাথে উঠল তুমুল কীর্তন ধ্বনি আর ব্রজমায়ীদের ক্রন্দনরোল।

আমি বেলা দু'টো থেকে শেষ পর্যন্ত বাবাজীর শয্যা পার্শ্বেই ছিলাম। তার পূর্বে প্রায় আটমাস দুবেলা তাঁকে দেখেছি। কোনো ব্যাধি নেই, ক্লেশ নেই, মৃত্যুকালে নাভিশ্বাস নেই, একটা হিক্কাও হ'ল না। মৃত্যুর পর চোখ দুটো অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে। চোখে মুখে যেন আনন্দোচ্ছ্বাস ফুটে বেরুচ্ছে। সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা অপূর্ব রক্তিম আভা দেখা যাচ্ছে। এ কি অদ্ভুত দেহত্যাগ !!

দীনবন্ধুদাস বাবাজীমহারাজের পবিত্র দেহ গোবর্ধন পর্বতের সানুদেশে সমাধিস্থ করা হল। উপস্থিত সহস্রাধিক গ্রামবাসী ছোট ছোট নুড়ি কুড়িয়ে এনে সমাধির ওপরে সাজিয়ে দিলেন। পরদিন দূর দূরান্তর থেকে ব্রজমায়ীরা গান গাইতে গাইতে এসে সমাধির ওপরে দুধ, জল, ফুল দিয়ে গান গেয়ে সমাধি পরিক্রমা ক'রে গেলেন। তাঁদের সেই গান কিন্তু হরিনাম সংকীর্তন নয়! তার অর্থ,—

হে আমাদের প্রিয় মহাতমা, তুমি নন্দলালা ও লালীকে সাথে নিয়ে আবার আমাদের মধ্যে এস। লালা-লালী বোধ হয় আমাদের ভুলে গেছে। লালা গেছে দ্বারকায়, লালী লুকিয়ে আছে বৃন্দাবনের বনে। আমরা দ্বারকায় যেতে পারি নে, লালীকেও খুঁজে পাইনে। হে মহাতমা, তুমি দ্বারকা থেকে নন্দদুলালকে ধ'রে আনো। আমাদের পিয়ারীকেও খুঁজে আনো।

দেখলাম রতিয়াও এ গান গাইল। পণ্ডিতমহারাজের মুখে শুনলাম ব্রজমায়ীরা সকলেই এ গান জানেন। কোনো বৈষ্ণবমহাতমা দেহত্যাগ করলে তাঁর দেহের সমাধির ওপরে দুধ জল দিয়ে পরিক্রমা ক'রতে ক'রতে এই গানটা গাওয়া ব্রজমায়ীদের সুপ্রাচীন প্রথা। গানটা যে কতকাল পূর্বে কে রচনা করেছেন তা কেউ ব'লতে পারে না।

কয়েকদিন কীর্তন মহোৎসবাদিতে কেটে গেল। তারপর আবার পূর্বের মত শান্ত পরিবেশে নিয়মিত সব চলতে লাগল। টোল ঘরের টাইমপিস ঘড়ি দেখে ঠিক সময়মত কাজ হয়। অনিয়ম যা কিছু অতিথি নিয়ে। অতিথিসেবা রতিয়া ও আমাকেই করতে হয়।

আগে রতিয়া সকাল সাতটার মধ্যে একবার এসে কিছু কাজ করে দিয়ে যেত। কোনো কোনও দিন দুপুরে এসে আমার সাথে গল্প করত। আর আসত বিকালে পাঠের সময়। সহরবৃন্দাবন থেকে আসার পর প্রায় সারাদিন ও রাত্রি নয়টা পর্যন্ত আশ্রমেই থাকে। কেবল বেলা

দশটাথেকে ছুটো পর্যন্ত থাকে না ; সে সময় বাড়ী যেয়ে খেয়ে আসে। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, পণ্ডিতমহারাজ যখন মন্দিরে শ্রীরাধাগিরিধারীলালের সেবা করেন, তখন রতিয়াকে মন্দিরের সম্মুখে বসিয়ে কেমন ক'রে সেব ক'রতে হয় সমস্ত বলেন। কিছু কিছু মন্ত্রও মুখস্থ করান।

টোলে যখন পড়ানো হয়, তখন ঘরের এক কোণে বসে রতিয়া শোনে। মাঝে মাঝে ছুপুরে এসে আমাকে বলে—ভাইয়া, আজ পণ্ডিতবাবা তোমাকে যা পড়ালেন সেটা ভাল বুঝতে পারলাম না, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও তো ?

আমি সাধ্য মত বুঝাতে চেষ্টা করি। প্রায়ই বুঝাতে পারি নে, রতিয়া বেশ তর্ক তোলে, পরে পণ্ডিত মহারাজ বুঝিয়ে দেন।

সন্ধ্যার পূর্বে পাঠ কীর্তন শেষ হ'লে আমি ও রতিয়া বেড়াতে যাই। পথে আমাদের পড়ার বিষয় অথবা পণ্ডিত মহারাজের পাঠের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা চলে। আগে কিন্তু প্রায়ই আমাকে কেন্দ্র করে আলোচনা চলত।

একদিন ছু'জনে বেড়াতে গেলাম দীনুবাবাজী মহারাজের পরিত্যক্ত ভজন কুটিরে। স্থানটি পাহাড়ের কোলে বেশ নির্জন। শূন্য কুটিরখানা প'ড়ে আছে। ছু'টো ময়ূর ময়ূরী বারান্দায় মাটিতে বুক পেতে নীরবে ব'সে আছে। প্রাঙ্গণের তুলসী গাছটা যেন তখন পর্যন্ত আশায় বুক বেঁধে বেঁচে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রছে। বাবাজীকে হারিয়ে আশ্রম কুটিরখানা যেন গভীর শোকাচ্ছন্ন। আমার মনে হ'তে লাগল স্থানটার সবই সজীব।

আমরা ছুজনে কুটিরখানা পরিষ্কার ক'রে অপসরাকুণ্ডের জল এনে তুলসী গাছটার গোড়ায় দিলাম। তারপর প্রণাম ক'রে আমাদের আশ্রমে ফিরলাম।

এই ঘটনার ছুদিন পরে সংবাদ পেলাম, দাউজীর বাগানের বড়পণ্ডিত বাবাজী-মহারাজের নির্দ্দেশে তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত এক বৈষ্ণব দীনুবাবাজী

মহারাজের ভজন-কুটিরে থেকে, সাধন ভজন ক'রতে এসেছেন। এই বাবাজীটি একমাত্র নামকীর্তন ছাড়া আর সব বিষয়ে মৌনী। একদিন যেয়ে তাঁকে দর্শন ক'রেও এলাম।

ক্রমে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় যেয়ে শ্রাবণ মাস এসে গেল। সম্মুখে ঝুলন-পক্ষ। রতিয়ার বহু নিমন্ত্রণ হ'ল। কিন্তু সে একটা নিমন্ত্রণও স্বীকার করল না। সকলকে বলে দিল, আমি শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের মন্দির ছাড়া আর কোথাও গান গাইতে যাব না।

ঝুলন আরম্ভের পূর্বদিন রতিয়া আমাদের আশ্রমের সম্মুখে একটা গাছে ঝুলন বাঁধালো। সেখানেও প্রত্যহ বহুলোক আসে ঝুলন খেলতে। রতিয়া দুপুরে ঘণ্টা দুইয়ের বেশী ঝুলনে ওঠে না। সে সময় আমিই তার সঙ্গী হতাম।

ঝুলন শেষ হ'য়ে জন্মাষ্টমী চলে গেল। আশ্বিন যেয়ে কার্তিক মাস এল। দিনগুলো যেন দেখা দিয়েই চ'লে যায়! মনে হয়, এই তো সেদিন মাত্র এসেছি, এর মধ্যেই দেড় বছর হ'য়ে গেল!

বাড়ীর কথা সময়ে সময়ে মনে পড়ে। মনে পড়লেই তার সাথে মনে আসে, এ আশ্রম ছেড়ে একদিন আমাকে যেতেই হবে। কথাটা বড়ই ভাবিয়ে তোলে। অপরাপর যে সমস্ত ঘটনা আমার ক্ষুদ্র জীবনে ঘটেছে,—তা এখানকার কোনো ঘটনা মনে করিয়ে না দিলে আপনাথেকে মনে আসে না। যেমন জয়পুরের মহারাজার ব্যবহার দেখে সেদিন মনে পড়েছিল দিল্লীর সেই মহারাজার কথা! উভয়ই কিন্তু হিজহাইনেস!

কার্তিক মাস। গোবর্ধন সহরে অন্নকূটের মেলা ব'সেছে। পণ্ডিত মহারাজের অনুমতি নিয়ে আমি ও রতিয়া গেলাম অন্নকূট দেখতে। আশ্রম থেকে দু'টো বাজলে বেরিয়ে চারটের সময় গোবর্ধনে অন্নকূটে পৌঁছলাম। দেখলাম বিরাট ভোগ লেগেছে, বোধ হয় পাঁচ হাজার লোক প্রসাদ পেতে পারবে। নিকটে যেতে পারলাম না, দারুণ ভিড়। যা দেখলাম তা বর্ণনা ক'রে রতিয়াকে শুনালাম। তারপর গেলাম মেলা দেখতে।

মেলা এমন কিছু নয়। মথুরা হ'তে সামান্য কয়েকখানা দোকান এসেছে। আর এসেছে নানারকমের খেলা। এক জায়গায় নাগরদোলা হচ্ছিল। সেখানে এসে রতিয়া নাগরদোলায় চড়তে চাইল। সে নাকি কোনো দিন নাগরদোলায় চড়ে নি।

কলকাতা 'এলিসিয়াম রো-এর ধোলাই' হওয়ার পর, মাঝে মাঝে আমার একটু মাথাঘোরার ভাব হয়। সে জন্য আমি নাগরদোলায় তার সঙ্গী হ'তে চাইলাম না, তাকে একাই চ'ড়তে বললাম। সে কিছুতেই একা চ'ড়বে না। বাধ্য হ'যে আমাকেও চ'ড়তে হল।

দু'-তিন পাক খেয়েই বমি করে রতিয়ার কোলের ওপর শুয়ে প'ড়লাম। যখন জ্ঞান হ'ল তখন আমার সর্বাঙ্গ ভিজে। রতিয়া কাঁদছে। সন্ধ্যা হ য়েছে।

আরও ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম ক'বে দুজনে টাঙ্গায় উঠলাম। গাড়ী চলতে আরম্ভ ক'রলে আবার মাথা ঘুবতে লাগল। বসে থাকতে পারলাম না, শুয়ে পড়লাম।

গোবিন্দকুণ্ড পর্যন্ত টাঙ্গা চলল। সম্মুখের রাস্তা বর্ষায় ভেঙ্গেছে, টাঙ্গা চলে না। রতিয়া টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, চট্ করে আমাকে একটা ছোট ছেলের মত কোলে তুলে নিয়ে, আশ্রমের দিকে ছুটল। দশ মিনিটের মধ্যে এক মাইল রাস্তা এসে আশ্রমে আমার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, কান্নায় ভেঙ্গে প'ড়ল। পণ্ডিত মহারাজের প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারল না। আমি সমস্ত ঘটনা বললাম।

রতিয়ার উচ্ছ্বাস একটু কমলে পণ্ডিত মহারাজকে বলল—পণ্ডিত বাবা, ভাইয়া নাগরদোলায় উঠতে চায়নি। আমিই জিদ করে তাকে উঠিয়ে এই বিপদ ঘটিয়েছি। আপনি একটু হাতটা দেখুন। আজ রাতটা কাটলে কাল মথুরার বড় ডাক্তার আনাব।

পণ্ডিত মহারাজ হাত দেখে বললেন—কোনো ভয় নেই, ডাক্তার লাগবে না। দু' তিন দিনের মধ্যেই তোমার ভাইয়া ভাল হ'য়ে যাবে।

বিদায়।

নাগরদোলার ঘটনার পর থেকে রতিয়া যেন বড় গম্ভীর হ'য়ে গেল। প্রথম যখন তাকে দেখি তখনও খুব গম্ভীর ছিল। আমার সাথে মেলামেশায় মাস দুয়ের মধ্যে বেশ একটু হাসিখুশী হ'য়ে উঠেছিল। আবার গম্ভীর হয়ে গেল কেন, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে আমার খাওয়ানোর জন্য তার আগ্রহ ও সতর্কতা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

শীতকাল যেয়ে ফালগুণ মাস এল। আর কিছুদিন পরেই দোলের হোলি আরম্ভ হবে। ঝুলনে রতিয়া কোথাও যায় নি। দোলের হোলিতে যাবে কিনা বুঝতে পারছি নে। একদিন কথাটা জিজ্ঞাসাই করলাম। উত্তর পেলাম, সে হোলি খেলতে কোথাও যাবে না। আমাকেও যেতে দেবে না।

কেন যাবে না তা জানতে চাওয়ায় বলল, তার ইচ্ছা নেই। হোলির মাতামাতি তার ভাল লাগে না। শেষ পর্যন্ত আমার প্রশ্নের পীড়াপীড়িতে স্বীকার করল,—তোমার ওপরে মেয়েরা বড় অত্যাচার করে। সে অত্যাচার আমি ঠেকাতে পারব না ব'লে যাব না।

আমি বললাম—দেখ বহিন, তোমাকে সকলেই ভালবাসে, সকলেই পেতে চায়। এ অবস্থায় তুমি না গেলে সকলেই দুঃখিত হবে।

কে দুঃখিত হচ্ছে না হচ্ছে, তা দেখার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি কোথাও হোলি খেলতে যাব না—এই পর্যন্ত।

* * *

দোল পূর্ণিমার পাঁচদিন পূর্বে সেন মশাই রাত্রে অতিথি থাকলেন। আমাদের রাত্রে প্রসাদ পাওয়া হ'য়ে গেলে, সেনমশাই পণ্ডিত মহারাজকে জানালেন, হরানন্দ প্রভু কলকাতার পত্র পেয়েছেন। আমার বিরুদ্ধে

লালবাজার দপ্তরে মারাত্মক কিছু নেই, কোনো ওয়ারেণ্টও হয় নি। আমার সম্বন্ধে যা কিছু পুলিস রিপোর্ট আছে, তাও সংশোধন করা হ'য়েছে। এখন আমি অনায়াসে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যেতে পারি। নতুন ক'রে যদি কিছু না করি, তবে আর কোনো বিপদ না ঘটারই সম্ভাবনা।

কথাটা শুনে আমার মনে যে ভাব হ'য়েছিল, তা বোধ হয় মুখের ভাবেও প্রকাশ পেল। বিজ্ঞ পণ্ডিতমহারাজ ব্যাপারটা বুঝে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন—বাবা, তোমার সংসারে বৃদ্ধা মা, পিসীমা, ছেলে, বউ, সকলেই আছেন। তাঁরা সকলেই তোমার মুখাপেক্ষী। সে দিকে তোমার গুরুতর কর্ত্তব্য প'ড়ে আছে। বাড়ী যাও, কর্ত্তব্য কর। এখানে শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের কৃপায় যা পড়াশুনা করলে, তার চর্চ্চা ছেড় না। কারণ তোমার জীবনে এগুলি কাজে লাগবে।

পণ্ডিতমহারাজের কথা শুনে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। আমি মাথা নীচু করে বললাম, সম্মুখে কয়েকদিন পরেই দোল আসছে। দোলের কয়েকটা দিন থেকে যেতে চাই।

পণ্ডিতমহারাজ বললেন,—বেশ তাই হবে। তবে তুমি যে বাড়ী যাচ্ছ, একথা রতিয়া বা অপর কাকেও এখন ব'ল না। সময় মত আমি সকলকে জানাব।

সেনমশাই জানালেন, তিনি ও বাঁড়ুজ্যেমশাই আমার নবদ্বীপ যাওয়ার খরচ, কাপড়, জামা, ইত্যাদি যা লাগবে—সমস্ত দেবেন। সহর বৃন্দাবনে যেয়ে ছ'তিন দিন থাকতে হবে। হরানন্দ অবধূত মহাশয়ের সাথে কিছু পরামর্শ করা প্রয়োজন আছে।

সে রাত্রিটা অনিদ্রায় কেটে গেল। প্রভাতে মঙ্গল আরতি দেখে সেন মশাই চলে গেলেন। কিছু পরেই রতিয়ার মা এসে সমস্ত বাল্য-ভোগের দ্রব্যাদি ও আমার খাবার দিয়ে গেল। রতিয়া আসে ঘণ্টাখানেক বেলা হ'লে। এসে ঘর দোর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে তারপর মন্দিরের বারান্দায় ব'সে পণ্ডিত মহারাজের মুখে শোনে পূজা অর্চনার উপদেশ।

সে দিন রতিয়ার আসতে অনেক দেরী হল। তার কাজ আমিই কতকটা সেরে নিলাম। রতিয়া যখন এল তখন আমরা প'ড়তে বসেছি। সে এসে টোলঘরে তার জন্য নির্দিষ্ট কোনটিতে বসলে লক্ষ্য করলাম যেন বড় অসুস্থ।

আমাদের নিয়মিত পড়া নয়টায় শেষ হলে, রতিয়ার কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—বহিন, তোমার কি কোনো অসুখ করেছে?

না ভাইযা, আমার অসুখ করে নি। গত রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে, রাত্রে আর ঘুম হয় নি।

কি দুঃস্বপ্ন দেখলে?

স্বপ্নে দেখলাম, তোমার আবার সেই মাথা ঘোরা হ'য়েছে। এখানে কোনো ডাক্তারে সারাতে না পারায়, তুমি সেনমশাইর সাথে কলকাতা যাচ্ছ। আমি সাথে যেতে চাচ্ছি, তা তোমরা নিচ্ছ না। কিন্তু ভাইযা, তোমার কথা শুনে তো মনে হ'চ্ছে তুমিই অসুস্থ হযেছ?

না বহিন, আমার কোনো অসুখ করে নি।

তা হ'তেই পারে না। তোমার গলার আওয়াজ খারাপ ও দুর্বল হ'য়েছে। তুমি আজ আর কোনো কাজ ক'রতে পাবে না, শুয়ে বিশ্রাম কর। জল যা আনতে হয় আমি একাই আনব! পণ্ডিতবাবাকে ব'লে আজ তোমার সব বিষয়ে ছুটি ক'রে দেব।

পণ্ডিতমহারাজ নিকটেই ছিলেন। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, ব্যস্ত হ'ও না রতিয়া। তোমার ভাইযার কোনো অসুখ হয় নি। স্নান ক'রে প্রসাদ পেলেই ভাল হ'য়ে যাবে।

রতিয়া বলল—তবে চল ভাইয়া, আমি জল তুলে দিই। তুমি ভাল ক'রে স্নান কর।

রতিয়ার কথামতই সেদিন আমাকে চলতে হল। বিকালে পাঠ কীর্ত্তনের পর বেড়াতে বেরিয়ে বলল,—ভাইয়া তোমার জীবনের একটা গল্প বল?

আমি বললাম,—কি গল্প বলব? আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই তো পাঁচ-সাতবার ক'রে শুনেছ। নতুন কিছু বলার মত ঝুলিতে আর তো কিছু নেই।

না ভাইয়া, তোমার পুরীর গল্পটা আবার বল। পরে অনীতার কি হল, জানতে বড় ইচ্ছে হয়।

আমিও তো কিছু জানি নে বহিন। সেই যে তিন বছর পূর্বে চলে এসেছি, তারপর এ পর্যন্ত যে অবস্থায় আছি, তাতে কোনো সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। আমার দিক থেকে তাদের সংবাদ জানতে চেষ্টা করাও সঙ্গত নয়।

তোমরা পুরুষ জাতটা বড় নিষ্ঠুর।

আমরা একটু নিষ্ঠুর বলেই টিকে আছি, বহিন। নচেৎ তোমাদের ভালবাসা আদর যত্নে ভেড়া বনে যেতাম। তোমরা কিন্তু সে প্রকার 'ভেড়াকান্তকেও ভালবাস না। বরং মনে মনে ঘৃণা কর।

না ভাইয়া, তুমি কিছু ভুল বুঝেছ। প্রকৃত ভালবাসা যে পায়, সে মানুষ হ'য়ে যায়, আর যে ভালবাসে সে দেবত্ব লাভ করে।

* * *

দোল আরম্ভ হ'য়েছে। রতিয়া কোথাও যায় না। রাধাকুণ্ডে মামাবাড়ী থেকেও হোলির নিমন্ত্রণ এসেছে। আমি ধরে বসলাম, মামাবাড়ী যেতেই হবে। পঞ্চম দোলের দিন প্রাতে দু'ভাইবোনে রাধাকুণ্ডে গেলাম। খুব হোলিখেলা হল। পূর্ববৎসরের মত বেলা শেষে কুণ্ডে স্নান করে তীরে বসেছি। রতিয়া এসে বসল। বহু লোকে স্নান ক'রছে। বানরে সাঁতার কাটছে। আমি দেখছি আর ভাবছি এক বছর পূর্বের কথা। সে ভাবনার সাথে যোগ দিয়েছে এক বছর পরে এই দিনে কোথায় থাকব, কি ক'রব, সেই চিন্তা।

আমাকে নীরব দেখেই বোধ হয় রতিয়া বলল—ভাইয়া, আজ সকাল থেকেই কেন যেন আমার মনের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। তুমি যদি অত পীড়াপীড়ি না ক'রতে তবে আমি আজ আসতাম

না। চল, এখন বাড়ী যাই। মামাদের ওখানে আর যেয়ে কাজ নেই, আমাদের ভিজে কাপড় শুখিয়ে কাল মামা পাঠিয়ে দেবেন।

উঠলাম, চললাম রতিয়ার সাথে। আমার মনটাকে এ ক'দিনে একটু ধাতস্থ ক'রে নিয়েছি। তথাপিও রতিয়ার কথায় মনটা কেমন ক'রে উঠল। রতিয়া কি তবে আমার চলে যাওয়ার সংবাদ পেয়েছে?

আচ্ছা বহিন, আজ দশ বারো দিন ধবেই দেখছি তুমি বড় বিষণ্ন হয়ে পড়ছ। এর কারণটা আমাকে খুলে বলবে?

কারণ ভাইয়া, আমিও খুঁজে পাচ্ছি নে। অথচ মনের মধ্যে একটা দারুণ অশান্তি ভোগ করছি। কোনো কিছুই ভাল লাগছে না। সেদিন সেই স্বপ্নটা দেখার পর থেকে, এ ভাবটা হ'যেছে। আমার মনে হয়, তুমি আর বেশীদিন এখানে থাকবে না। তোমার সেই যাওয়াটা আমার স্বপ্নে দেখার মত না হয়ে যাতে শুভ হয়, তার জন্য আমি সব সময় শ্রীরাধা গিরিধারীলালের চরণে প্রার্থনা করছি।

কথাগুলি বলতে বলতে রতিয়ার গলা ভেঙ্গে গেল। দেখলাম চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

অবশিষ্ট পথটায় আর কোনো কথা হল না। গোবিন্দকুণ্ডে রতিয়াদের বাড়ীর পথটায় এসে তাকে বলতেই নীরবে পথ ধ'রে চ'লে গেল। আমি চিন্তাকুল চিত্তে আশ্রমে ফিরলাম।

পরদিন প্রাতে রতিয়ার মা শ্রীরাধা-গিরিধারীলালের সেবার যোগান দ্রব্যাদি এনেছেন। আমার খাবার সমস্তও নিয়মিত এসেছে। ঝুড়িথেকে সব নামিয়ে দিতেই পণ্ডিত মহারাজ বললেন—রতিয়ার মা, কাল থেকে রামদাসের খাবার আর এনো না। আজ শেষরাত্রে রামদাস বাড়ী রওনা হবে।

বুড়ী কেঁদে ফেললেন। আমাকে কোলে বসিয়ে কেঁদেকেটে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। বুঝলাম এবার আমার যাত্রার দিন স্থির হ'য়ে গেল।

বলার কিছুই নেই। কোনো আপত্তি করার হেতু নেই। নীরবে নিয়মিত কাজ ক'রে চলেছি। রতিয়া আসে প্রাতে সাতটার মধ্যে। সাতটা বেজে আটটা বাজল, রতিয়া এল না।

কোনোদিন কোনো কারণ বশত রতিয়া যদি প্রথম বেলায় না আসতে পারে, তবে দুপুরে নিশ্চয়ই আসে। বেলা বারোটা বেজে ক্রমে সাড়ে তিনটে বেজে পাঠের সময় হ'য়ে গেল, রতিয়া এলো না।

পাঠের সময় রতিয়া আসতে পারে। পথের দিকে তাকিয়ে আছি। পাঠ শেষ হ'য়ে কীর্তন আরম্ভ হ'ল। কীর্তন শেষ হ'যে শ্রোতা ভক্তেরা প্রসাদ পেয়ে চ'লে গেলেন, রতিয়া এলো না।

সন্ধ্যা আরতির সময় রতিয়া নিশ্চয়ই আসবে। আরতি আরম্ভ হ'ল। আরতি শেষ হ'যে ভজন কীর্তন আরম্ভ হ'ল। কীর্তন শেষ হ'য়ে হরিধ্বনি দিয়ে সকলে চ'লে গেলেন। রতিয়া তো এলো না !!

* * *

রাত্রে প্রসাদ পেয়ে আমার ছোট ঘরখানায় বিছানার ওপরে ব'সে আছি। পণ্ডিতমহারাজ এসে কাছেই ব'সলেন। ব'সে বললেন, বাবা তোমার বৃন্দাবন পৌঁছানোর গাড়ীভাড়া দু'টাকা সেনমশাই দিয়ে গিয়েছেন, এই নাও। ভোরে যাত্রা ক'রে গোবর্ধনে মথুরার টাঙ্গা ধ'রে যেও, তা হলে বেশী গরম না প'ড়তেই বৃন্দাবনে পৌঁছে যাবে।

আমি বললাম,—আমার তো মথুরা দিয়ে যাওয়া হবে না। রতিয়ার মত আমার আর এক বহিন যখীনগাঁও আছে। এখানে আসার সময় তাকে কথা দিয়ে এসেছি, দেশে ফেরার সময় ব'লে যাব। সে জন্য আমি হাঁটাপথে যখীনগাঁও হ'য়ে যাব।

বেশ, তা হ'লে রাত তিনটায় হাঁটা দিলে যখীনগাঁও হ'য়ে বেলা দশটার মধ্যে বহুলাবন পৌঁছবে। বহুলাবন থেকে সহর বৃন্দাবন দশ মাইল। সন্ধ্যার মধ্যেই সেনমশাইদের ভজন-কুটিরে পৌঁছে যেতে পারবে।—

বাবা, তোমাকে শেষ কথা কয়টা বলি। তোমার চলার পথ বড় বিচিত্র। সে পথে চ'লতে যদি কোনো সময় ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়, তবে শ্রীরাধা-গিরিধারীর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ ক'রে অবিচল থেক। তা হলেই সব বিপদ কেটে যাবে। সাধুভক্ত হ'তে চেষ্টা করবে। সাধুভক্ত সাজতে চেষ্টা কোরো না। সংসারী মানুষ, সংসার-পথে চলতে বহু সৎ-অসৎ কর্ম করে। তোমাকেও অনেক কিছু ক'রতে হবে। শ্রীভগবান মানুষেব এ দুরবস্থা বোঝেন। তাঁর কাছে দিনান্তে একবার ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো। ভগবানকে নিয়ে কখনও সাধন ভজনের ভণ্ডামী কোবো না, তাহলে আর ক্ষমাপ্রার্থনার উপায় থাকবে না। বাবা, তোমার জন্যে আমাব অন্তরের স্নেহ আশীর্বাদ সব সময়ই থাকবে।

চরণের উপবে লুটিযে পড়লাম। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে পণ্ডিতমহারাজ উঠে গেলেন। কেঁদে রাত তিনটে বাজল।

* * *

রাত্রি তিনটে বাজতে কিছু বাঁকী থাকতে পণ্ডিত মহারাজ আমাকে ডেকে তুলে দিলেন। হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখি পণ্ডিতমহারাজের কুটিরের দরজা বন্ধ। দরজার বাইরে দাঁড়ালাম।

পণ্ডিতমহারাজ দরজা না খুলে ভিতর থেকে ব'ললেন,—শ্রীরাধা গিরিধারীলালের মন্দিরে দণ্ডবৎ প্রণাম করে যাত্রা কর। শ্রীরাধা গিরিধারীলাল তোমার মঙ্গল করুন।

বুঝলাম পণ্ডিতমহারাজ আর দরজা খুলবেন না। সেই দরজার সম্মুখে প্রণাম করলাম। তারপর শ্রীমন্দিরে দণ্ডবৎ ক'রে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পথে বেরুলাম।

আশ্রম থেকে প্রায় দু'শ গজ যেয়ে সদর রাস্তা। রাস্তায় উঠে আর একবার আশ্রমটিকে শেষ দেখা দেখবার জন্য ফিরে তাকালাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম, পণ্ডিত মহারাজ আশ্রমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি রাস্তার উপরেই আর একবার দণ্ডবৎ ক'রে আবার চলতে আরম্ভ করলাম।

অদৃশ্য হয়ে গেল আমার জীবনের সব চাইতে সুখ-আনন্দ-স্মৃতিবিজড়িত একবছর এগারোমাসের আশ্রয় পরম বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের পরমপবিত্র স্নিগ্ধ শান্ত ভজন কুটির।

*　　*　　*

গোবিন্দকুণ্ডে রতিয়াদের বাড়ী যাওয়ার পথটার নিকটে আসতেই একটা গাছের তলায় কে একজন উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে আসতেই চাঁদের আলোয় দেখলাম রতিয়া। বুককাটা আর্তনাদের মত মুখ থেকে বেরিয়ে এল—বহিন রতিয়া —'।

রতিয়া কিছুই বলতে পারল না। ঠোঁট তু'খানা কাঁপছে। অন্ধ চোখের জলে বুকের ওড়না জামা ভিজে গিয়েছে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেই প্রথম দিনের প্রথম দেখার মত তার হাত তুখানা আমার কাঁধের ওপরে রেখে, কিছুক্ষণ নীরব থেকে ভাঙ্গাগলায় মৃত্বকম্পিত কণ্ঠে বলল,—যাও ভাইয়া, বাড়ী যাও। সুখে থেক।

তারপর হাত তুখানা ধীরে ধীরে নামিয়ে নিয়ে টলতে টলতে কুণ্ডের দিকে চলে গেল। আমি একটা কথাও আর বলতে পারলাম না।

তার পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন বোধ হয় আমার মনের উপর দিয়ে বহু কথা, বহু স্মৃতি অতি দ্রুত চলে যাচ্ছিল; তাই আর পরবর্তীকালের জন্য কোন ছাপ রেখে যায় নি। অথবা বোধ হয় কিছু ভাবতেই পারি নি।

*　　*　　*

সংজ্ঞা ফিরে পেলাম নিকটেই কয়েকটা ময়ূরের ডাকে। প্রভাত হয়েছে।

ময়ূরের ডাক, বানরের লাফালাফি ও গোবিন্দ কুণ্ডের প্রভাতী আরতি-কীর্তন-ধ্বনির সাথে সাথে আমার স্ত্রীর দেওয়া অবশিষ্ট সেই পয়সা-আধলা কটাও যেন দারুণ মুখর হয়ে উঠল। তার সাথে যোগ দিল, যখীনগাঁয়ের বহিনের অনুরোধ ও পণ্ডিতমহারাজের নির্দেশ।

সব কটা যখন নিষ্করুণ ভাবে আমার মনকে আক্রমণ ক'রেছে, তখন সম্মুখের পথও হাতছানি দিয়ে ডেকে বলতে লাগল,—

হে অনাদিকালের সুদূর পথযাত্রী পথিক, এখনও যে বহু পথ তোমাকে চলতে হবে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে পান্থশালায় কয়েকদিনের জন্য অতিথি হ'তে পার মাত্র। কিন্তু ঐ পান্থশালাই তো তোমার শেষ বিশ্রাম স্থান নয়। পান্থশালায় আর পাঁচজন পথিকের সাথে দেখা হয়, মেলামেশা হয়, ভাবও হ'তে পারে। তাই ব'লে কি তোমার লক্ষ্যপথে চলা বন্ধ ক'রতে পার? না, তা তুমি পার না। চেষ্টা করলেও পারবে না। তুমি পথিক, আমি পথ। আমার নিজের অস্তিত্বের জন্য আমিই তোমাকে পথের মাঝে কোথাও স্থায়ী বিশ্রাম নিতে দেব না। এস, এস, যাত্রা সুরু কর। সাথে নেবার মত যা কিছু পথে কুড়িয়ে পেয়েছ, তাই নিয়ে আবার এগিয়ে চল। আরও কত পাবে, আরও কত হারাবে, তার জন্য দুঃখ কেন? এ যে জগতের নিয়ম। চল, চল, ছুটে চল। হে আমার অনাদি-অনন্ত-পথ-যাত্রী পথচারী……' ॥

ফেরারী সমাপ্ত